হিন্দু মেলার ইতিবৃত্ত

শুভেন্দুশেখর মুখোপাধ্যায়

সংকলক অশোক উপাধ্যায়। ইন্দ্রজিৎ চৌধুরী

নভেম্বর ২০০০, অগ্রহায়ণ ১৪০৭

প্রকাশক :
গৌতম সেনগুপ্ত
২০১ শহিদ অনন্ত দত্ত সরণি
কলকাতা ৭০০ ০৮১

প্রচ্ছদ · দেবব্রত ঘোষ

অক্ষরবিন্যাস ও মুদ্রণ
অরিজিৎ কুমার
লেজার ইম্প্রেশন্স
২ গণেন্দ্র মিত্র লেন
কলকাতা ৭০০ ০০৪

সূচি

প্রসঙ্গ-কথা

"...নব্য-সম্প্রদায় প্রাচীন রীতি-পদ্ধতিতে বীতরাগ হইয়া সমাজ সংস্করণার্থ একান্ত উৎসুক হইতেছেন।... আমরা পূর্ব্বপুরুষদিগের নিকট হইতে যে সকল সুরীতি ও সুনীতি লাভ করিয়াছি তাহাও পাছে এই পরিবর্ত্তনের স্রোতে ভাসিয়া যায় আশঙ্কা হইতেছে।..." (রাজনারায়ণ বসু, অনুবাদ উমেশচন্দ্র দত্ত, *বিবিধ প্রবন্ধ*, ১৮৮২)

ডিরোজিও-শিষ্যদের অতিরেক দেখে আশঙ্কিত রাজনারায়ণ বসু 'এই ভয়ঙ্কর অমঙ্গল' নিবারণ করার জন্য মেদিনীপুরে থাকাকালীন 'জাতীয় গৌরব সম্পাদনী বা গৌরবেচ্ছা সঞ্চারিণী সভা' স্থাপন করেন। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের আর্থিক সাহায্যে ও নবগোপাল মিত্রের সম্পাদনায় The National Paper সাপ্তাহিকটি ১৮৬৫-তে প্রকাশিত হলে রাজনারায়ণ তাঁর ভাবনাকে বৃহত্তর ক্ষেত্রে প্রয়োগের জন্য ওই পত্রিকায় Prospectus of Society for the Promotion of National Feeling among the Educated Natives of Bengal নামে একটি প্রবন্ধ লেখেন। প্রবন্ধটি পৃথক পুস্তিকা আকারে প্রচারিত হয়, 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'-তেও পুনর্মুদ্রিত হয় (চৈত্র ১৭৭৭ শক)। এ থেকেই হিন্দু মেলার জন্ম। ১৮৬৭-র মার্চে নবগোপালের পত্রিকায় A National Gathering শীর্ষক আবেদনে আসন্ন চৈত্রসংক্রান্তির দিন একটি সম্মিলন আয়োজনের কথা লেখা হয় "to unite in one tie of brotherly love union [sic] the various races and tribes of the people, who though living in one common soil, having one common interest, feel themselves so many different nations." জাতীয় মেলার প্রথম অধিবেশন হয় ১৮৬৭-র ১২ এপ্রিল (প্রথম 'চৈত্র-মেলা', চতুর্থ অধিবেশন থেকে 'হিন্দু মেলা' নামে পরিচিত)। সম্ভবত ১৮৮০-র চতুর্দশ অধিবেশনই হিন্দু মেলার শেষ অনুষ্ঠান।

হিন্দু মেলা বাঙালির জাতীয় জীবনে কতখানি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিতে পেরেছিল? উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ বাঙালি জীবনে বড় জটিল সময়। ব্রাহ্মসমাজে বিভাজন ঘটে গিয়েছিল হিন্দু মেলা শুরুর আগেই, ১৮৬৬-র ১১ নভেম্বর কেশবচন্দ্র সেন আনুষ্ঠানিক ভাবে 'ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ' প্রতিষ্ঠার কথা ঘোষণা করেন। এর পর ব্রাহ্মবিবাহ আইন সংক্রান্ত যে বিতর্ক শুরু হয়, পরে নব্য-হিন্দুত্ববাদ ও হিন্দু-জাতীয়তাবাদের উত্থানের সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের কথা উল্লেখ করেছেন যোগানন্দ দাস ('The Brahmo Samaj', *Studies in the Bengal Renaissance,* Revised edition edited by Jagannath Chakravorty, Jadavpur University, 1977)। এই বিতর্ক এবং তার ফলে ১৮৭২-এর Native Marriage Act গৃহীত হওয়া হিন্দু মেলার সমকালীন ঘটনা। আদি ব্রাহ্মসমাজে এই বিতর্কের তীব্র প্রতিক্রিয়া হলেও হিন্দু মেলাকে বোধহয় সেই প্রতিক্রিয়ার সঙ্গে সরাসরি যুক্ত করা যায় না। তবে এটা ঠিকই যে এই আইনের বিরোধী আদি ব্রাহ্মসমাজের নেতারাই হিন্দু মেলার উদ্যোক্তা ছিলেন।

এক দিকে জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ির প্রত্যক্ষ পৃষ্ঠপোষণা ও নেতৃত্ব (দ্বিজেন্দ্রনাথ-সত্যেন্দ্রনাথ-গণেন্দ্রনাথ-জ্যোতিরিন্দ্রনাথ এমনকী শেষদিকে রবীন্দ্রনাথও যোগ দেন), অন্য দিকে রাজনারায়ণ বসু, মনোমোহন বসু ও নবগোপাল মিত্রের মতো আদি ব্রাহ্মসমাজের নেতারা মেলার পরিকল্পনায় প্রধান ভূমিকা নেন। তবে রাজনারায়ণের প্রস্তাবে যেমন বলা হয়েছিল, 'ধর্ম্ম এবং রাজনীতি সংক্রান্ত বিষয়ের আন্দোলনে জাতীয় গৌরবেচ্ছা সঞ্চারিণী সভার হস্তক্ষেপ করিবার প্রয়োজন নাই', এবং মেলার দ্বিতীয় অধিবেশনে (১৮৬৮) গণেন্দ্রনাথ যেমন বলেছিলেন, 'আমাদের এই মিলন সাধারণ ধর্ম্ম-কর্ম্মের জন্য নহে...', সেই অনুযায়ী প্রত্যক্ষত হিন্দু মেলায় ধর্মের কোনও ছায়াপাত ছিল না। তবে জাতীয় মেলার বিশিষ্ট অঙ্গ হিসেবে নবগোপাল 'জাতীয় সভা' প্রতিষ্ঠা করেন 'হিন্দু জাতির সর্ব্বশ্রেণীর মধ্যে জাতীয় ভাবের বর্দ্ধন এবং তাঁহাদিগের স্বাবলম্বিত যত্ন দ্বারা বিবিধ উন্নতি সাধন' করার উদ্দেশ্যে। হিন্দুরাই এই সভার সদস্য হতে পারতেন। ১২৭৯ বঙ্গাব্দের অগ্রহায়ণে *মধ্যস্থ* পত্রিকায় জাতীয় সভার অনুষ্ঠানপত্র প্রকাশিত হলে হিন্দু সমাজের মধ্যেই একে নিবদ্ধ রাখার জন্য সমালোচনাও হয়। উদ্যোক্তাদের অবশ্য বক্তব্য ছিল, হিন্দুরা একটি স্বতন্ত্র জাতি এবং হিন্দু জাতির অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মিলনক্ষেত্রকে 'জাতীয়' নামে আখ্যাত করায় আপত্তির কারণ থাকতে পারে না। জাতীয় সভাতেই রাজনারায়ণ বসু 'হিন্দু ধর্ম্মের শ্রেষ্ঠতা' শীর্ষক বক্তৃতা দেন (১৫ সেপ্টেম্বর, ১৮৭২), তা-ও বিতর্কের ঝড় তুলেছিল। 'জাতীয়' আখ্যায় হিন্দু ব্যতীত অন্যান্য সম্প্রদায়কে অন্তর্ভুক্ত না করতে পারার 'সংকীর্ণতা' জাতীয় সভা তথা জাতীয় মেলার গৌরবকে সীমাবদ্ধ করেছে সন্দেহ নেই। হিন্দু মেলা বন্ধ হয়ে যাওয়ার অনেক পরে, ১৯২০-তে বালগঙ্গাধর তিলকের সঙ্গে পুনেতে সাক্ষাৎ করতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ এ প্রসঙ্গে একটি মন্তব্য করেন। ক্ষিতিমোহন সেন-এর বর্ণনায়, "তাঁহাদের কথাবার্তার মধ্যে ভারতীয় কংগ্রেসের বিষয়েও আলোচনা ছিল। তিলক সেই প্রসঙ্গে কবিকে বলেন, 'আপনারা যে হিন্দুমেলার আকারে ইহার গোড়াপত্তন করিয়াছিলেন তাহা খুবই সমীচীন হইয়াছিল। ইঁহাদের এখনকার সভা ঠিক আমাদের পদ্ধতির সঙ্গে মেলে না আর রাখী প্রভৃতি দেশীয় প্রথাতে যে আমাদের মিলনকে রূপ দিতে চাহিয়াছিলেন তাহাও ঠিক এই দেশেরই উপযুক্ত।' তাহাতে কবি বলিলেন, 'তাহা এই দেশীয় হইলেও এই কথা ভুলিলে চলিবে না, আমাদের দেশে বহু মুসলমান আছেন। তাঁহাদের তো পাওয়া চাই। তাই দেশীয় অথচ সর্ব সম্প্রদায়ের গ্রহণযোগ্য পথ হওয়া চাই। নহিলে শিক্ষা, শিল্পকলা, সভাসমিতি প্রভৃতি সব বিষয়েই আমি দেশী ভাবেরই উপাসক।" ('তিলক-রবীন্দ্রনাথ ও কংগ্রেস', *দেশ,* ১৭ পৌষ ১৩৫৫ বঙ্গাব্দ)। বিংশ শতাব্দীর সূচনায় স্বদেশি আন্দোলনেও যে '*দেশীয় অথচ সর্ব সম্প্রদায়ের গ্রহণযোগ্য পথ*' চিহ্নিত করা যায়নি তা সর্বজনবিদিত।

বর্তমান গ্রন্থের প্রথম সংস্করণের ভূমিকায় যোগেশচন্দ্র এই প্রসঙ্গে লিখেছিলেন,

> "হিন্দু মেলা প্রথমে হিন্দুদের বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে একতা সম্পাদন করিতে অগ্রসর হন যাহাতে সকলেই কায়মনে জাতীয় উন্নতি বিষয়ে সহায়তা করিতে পারে। এই ধারণা ক্রমে অন্যান্য সম্প্রদায়ের মধ্যেও অনুক্রামিত হইতে থাকে এবং সপ্তম দশকের মধ্য ভাগেই হিন্দু মুসলমান খ্রীষ্টান সকল সম্প্রদায়েরই উন্নতিকল্পে একযোগে চেষ্টা

চলিতে আরম্ভ হয়। হিন্দুদের সম্মেলন-স্পৃহা যখন কার্য্যে পরিণত হইল তখন ইহা শুধু তাহাদের মধ্যেই নিবদ্ধ রহিল না, এক ভারতীয় মহাজাতি গঠনের জন্য অন্যান্য সম্প্রদায়কেও ইহার মধ্যে টানিয়া আনা হইল। ইণ্ডিয়ান লীগ, ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন, ইণ্ডিয়ান নেশন্যাল কংগ্রেস একই উদ্দেশ্যে ভারতীয় মহাজাতির ঐক্য সংসাধনের এক একটি ধাপ।"

যোগেশচন্দ্র স্বাভাবিকভাবেই জাতীয়তাবাদী ইতিহাস-রচনার ধারাবাহিকতায় সদর্থক প্রেক্ষিতেই হিন্দু মেলাকে প্রতিষ্ঠা করতে প্রয়াসী ছিলেন। নিঃসন্দেহে দেশীয় ভাষা-শিল্প সাহিত্য-সংস্কৃতির চর্চায় সামগ্রিক গুরুত্ব দিয়ে 'নিরবচ্ছিন্ন স্বজাতীয় অনুষ্ঠান' হয়ে উঠেছিল হিন্দু মেলা। এর কুড়ি বছর পরে প্রতিষ্ঠিত ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস-এর মতো 'আবেদন ও নিবেদনের থালা' নিয়ে হিন্দু মেলার পরিচালকরা মাঠে নামেননি। কিন্তু সূচনাপর্বে 'জাতীয়তা' বা 'স্বদেশি'-র ভাবনা রীতিমতো দ্বিধাগ্রস্ত ছিল। মেলার পৃষ্ঠপোষকদের অন্যতম, দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের বক্তব্য এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য ('দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্মৃতিকথা', *পুরাতন প্রসঙ্গ*, বিপিনবিহারী গুপ্ত। অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত অখণ্ড সংস্করণ, ১৯৮৯) :

"দেখ একরকম স্বদেশী আমাদের দেশের ফ্যাশান হইয়াছিল ; কিন্তু তাহার মধ্যে একটা বিলাতি গন্ধ ছিল। রঙ্গলালই বল, আর রাজনারায়ণবাবুই বল, তাঁহাদের patriotism-এর বার আনা বিলাতি, চার আনা দেশী। ইংরাজ যেমন patriot, আমিও সেই রকম patriot হব—এই ভাবটা তাঁদের মনে খুব ছিল। বল দেখি, আমি তোমার মত patriot হইব কেন? আমি আমার মত patriot হইতে না পারিলে কি হইল। নবগোপাল একটা ন্যাশনাল ধুয়া তুলিল ; আমি আগাগোড়া তা'র মধ্যে ছিলাম। সে খুব কাজ করিতে পারিত ; কুস্তি, জিম্‌ন্যাষ্টিক, প্রভৃতির প্রচলন করার চেষ্টা তার খুব ছিল ; কিন্তু কি রকম কি হওয়া উচিত, সে সব পরামর্শ আমার কাছ থেকে লইত। একটা মেলা বসাইবার কথা বলিল,—তাঁতি, কামার, কুমার ইত্যাদি লইয়া। আমি বলিলাম—'ও সব ত দেশের সকলের জানা আছে ; দেশী painting দেখাতে পার?' সে এক painter নিযুক্ত করিয়া ছবি আঁকাইল। মেলার ক্ষেত্রে গিয়া দেখি, প্রকাণ্ড ছবি। ব্রিটানীয়ার সম্মুখে ভারতবাসী হাতজোড় করিয়া বসিয়া আছে। আমি বলিলাম—'উল্টে রাখ, উল্টে রাখ ; এই তুমি দেশী painting করিয়াছ? আর আমাদের ন্যাশনাল মেলায় এই ছবি রাখিয়াছ?' ছবিখানা সরাইয়া উল্টাইয়া রাখা হইল। তা'র ঝোঁক ছিল, বড়-বড় ইংরাজকে নিমন্ত্রণ করা। আমি অনেক বলিয়া কহিয়া তাহাকে নিবৃত্ত করাইলাম। সে বড়-বড় ইংরাজ কর্ম্মচারীদিগের ও দেশী রাজাদের কাছে খুব যাতায়াত করিতে পারিত। একখানা ন্যাশনাল কাগজ বাহির করিল ; একেবারেই সুপাঠ্য নয়। কিন্তু নবগোপালের সময় থেকে এই 'ন্যাশনাল' শব্দটা দাঁড়াইয়া গেল। ন্যাশনাল সঙ্গীত রচিত হইতে আরম্ভ হইল।"

'মধ্যস্থ' পত্রিকায় (ফাল্গুন ১২৮০ বঙ্গাব্দ) মনোমোহন বসু নবগোপাল সম্পর্কে লেখেন, "অত্র বঙ্গদেশে বাবু নবগোপাল মিত্রই সেই জাতীয় ভাবের প্রথম ভাবুক ও প্রধান প্রচলন কর্ত্তা।...তিনি সুপ্তাবস্থায় স্বপ্ন দেখেন 'জাতীয়!' তিনি জাগ্রত 'জাতীয়'।" দ্বিজেন্দ্রনাথ-বিবৃত এই

দৃষ্টান্ত নবগোপালের সেই 'জাতীয়' চরিত্রের বিরোধী কিনা, তা নিয়ে বিতর্কের অবকাশ থেকেই যায়।

তবু এই সব সীমাবদ্ধতার জন্য হিন্দু মেলার বিভিন্ন সদর্থক ভূমিকা বিস্মৃত হওয়ারও কোনও কারণ নেই। জাতীয় চেতনার উন্মেষ ঘটানোর জন্য ব্যাপক আন্দোলন গড়ে তোলার শক্তি হিন্দু মেলা কোনও দিনই অর্জন করতে পারেনি ঠিকই, কিন্তু সেই উদ্দীপনার স্ফুলিঙ্গ থেকেই যে পরবর্তী জাতীয় আন্দোলনের হোমানল জ্বলে উঠেছিল তা অনস্বীকার্য। ঐতিহাসিক প্রতুলচন্দ্র গুপ্ত *হিন্দু মেলার ইতিবৃত্ত* গ্রন্থের ভূমিকায় যথার্থই দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন 'হিন্দুমেলার সঙ্গে দেশের মাটির যে মিল ছিল', সমসাময়িক অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের (ইন্ডিয়ান লিগ ১৮৭৫, ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন ১৮৭৬) তা ছিল না। লক্ষণীয়, নবগোপাল প্রথমে 'মেলা' প্রতিষ্ঠা করেন, পরে 'জাতীয় সভা'। যোগেশচন্দ্র অন্যত্র লিখেছেন, 'মেলা কথাটির সঙ্গে ভারতবাসীর যোগ প্রকৃতিগত ও ঘনিষ্ঠ।' (*মুক্তির সন্ধানে ভারত,* তৃতীয় সং, ১৩৬৭ বঙ্গাব্দ)।

'মাতৃভূমি' মাসিকপত্রে যোগেশচন্দ্র জাতীয় মেলার কথা প্রকাশ করেন। সেই বিবরণ 'অনেকাংশে সংশোধন ও পরিবর্দ্ধন' করে প্রকাশিত হয় তাঁর *জাতীয়তার নবমন্ত্র বা হিন্দু মেলার ইতিবৃত্ত* (১৩৫২ বঙ্গাব্দ)। এই গ্রন্থে জাতীয় মেলার নেতৃস্থানীয় দশ জনের ছবিও সংযোজিত হয়েছিল। এর আগে ১৩৪৭ বঙ্গাব্দে তাঁর *মুক্তির সন্ধানে ভারত* গ্রন্থের প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থে প্রেক্ষিতসহ প্রসঙ্গটি 'জাতীয়তা মন্ত্রে দীক্ষা—চৈত্র বা হিন্দুমেলা' অধ্যায়ে আলোচিত হয় (তৃতীয় সং, ১৩৬৭ বঙ্গাব্দ)। *জাতীয়তার নবমন্ত্র* গ্রন্থের নতুন সংস্করণ প্রকাশিত হল ১৩৭৫ বঙ্গাব্দে, *হিন্দু মেলার ইতিবৃত্ত* নামে। এই গ্রন্থে মেলার দ্বিতীয় ও তৃতীয় বর্ষের কার্যবিবরণের অংশবিশেষ উদ্ধৃত করেছিলেন যোগেশচন্দ্র। ইতিমধ্যে শুভেন্দুশেখর মুখোপাধ্যায় দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ বর্ষের পৃথকভাবে মুদ্রিত পূর্ণাঙ্গ কার্যবিবরণ 'সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা'য় সংকলন করে দিয়েছিলেন (৬৭ বর্ষ ২য় সংখ্যা, এবং ৩য়-৪র্থ সংখ্যা, ১৩৬৭ বঙ্গাব্দ)। *হিন্দু মেলার ইতিবৃত্ত* প্রকাশের আগেই শুভেন্দুশেখর 'হিন্দুমেলা ও ভারতচিন্তা' প্রবন্ধে এ বিষয়ে আলোচনা করেন ('দেশ' সাহিত্য সংখ্যা, ১৯৬৭/১৩৭৪ বঙ্গাব্দ)।

বর্তমান সংকলনে *হিন্দু মেলার ইতিবৃত্ত* (১৩৭৫ বঙ্গাব্দ) বইটির পুনর্মুদ্রণ করা হল। বইয়ের শেষে যোগেশচন্দ্রের যে গ্রন্থপঞ্জি-রচনাপঞ্জি-জীবনকথা সংযোজিত হয়েছিল, তা এই সংকলনের অন্তর্ভুক্ত হয়নি। যোগেশচন্দ্র বাগলের (১৯৩০-১৯৭২) প্রয়াণের পর 'যোগেশচন্দ্র বাগল স্মৃতি রক্ষা কমিটি' মোহনলাল মিত্র ও কানাইলাল দত্তের সম্পাদনায় একটি স্মারক গ্রন্থ প্রকাশ করে (*ঊনবিংশ শতকের বাংলার কথা ও যোগেশচন্দ্র বাগল,* ১৯৭৪)। এই গ্রন্থে সুনীল দাস যোগেশচন্দ্রের বিস্তারিত রচনাপঞ্জি সংকলন করে দেন। আগ্রহী পাঠক সেটি দেখে নিতে পারেন। যোগেশচন্দ্রের জীবনকথাও এই গ্রন্থে একাধিক লেখায় আলোচিত। এছাড়া *হিন্দু মেলার ইতিবৃত্ত* বইটির শেষে একটি সংশোধন ও একটি সংযোজন করেন যোগেশচন্দ্র, দুটিই শুভেন্দুশেখর মুখোপাধ্যায়ের সূত্রে। সংশোধনটি হিন্দু মেলার প্রথম অধিবেশনের স্থান প্রসঙ্গে, এবং সংযোজনটি নবগোপাল মিত্রের মৃত্যু সংক্রান্ত। এ দুটি বর্তমান সংকলনে যথাস্থানে সংযোজিত হল। শুভেন্দুশেখর মুখোপাধ্যায় হিন্দু মেলার দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ বর্ষের যে

কার্যবিবরণ উদ্ধার করে 'সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা'য় প্রকাশ করেন, সেগুলি পূর্ণাঙ্গ আকারে বর্তমান সংকলনে সংযোজিত হয়েছে। সব ক্ষেত্রেই মূল পাঠের বানান অপরিবর্তিত।

যোগেশচন্দ্রের গ্রন্থপ্রকাশের পর চার দশক কেটে গিয়েছে। ইতোমধ্যে হিন্দু মেলা বিষয়ে নতুন বিশ্লেষণ তেমন দেখা যায়নি। তবে প্রশান্তকুমার পাল *রবিজীবনী* গ্রন্থের প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ডে (প্রথম সংস্করণ, যথাক্রমে ১৩৮৯ ও ১৩৯১ বঙ্গাব্দ) হিন্দু মেলা প্রসঙ্গে অনেক নতুন তথ্য সংকলন করে দিয়েছেন। তার মধ্যে হিন্দুমেলায় রবীন্দ্রনাথ কোন কবিতাটি আবৃত্তি করেন তা নিয়ে সংশয়ের প্রসঙ্গটি উল্লেখযোগ্য। বহুদিন পর্যন্ত জানা ছিল, হিন্দুমেলার নবম অধিবেশনের উদ্বোধন দিবসে রবীন্দ্রনাথ 'হিন্দুমেলায় উপহার' শীর্ষক এক দীর্ঘ কবিতা আবৃত্তি করেন এবং কবিতাটি দ্বিভাষিক সাপ্তাহিক অমৃতবাজার পত্রিকা-য় ১৪ ফাল্গুন ১২৮১ বৃহস্পতিবার (২৫ ফেব্রুয়ারি ১৮৭৫) 'শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর' নাম স্বাক্ষরিত হয়ে প্রকাশিত হয়। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এটি উদ্ধার করে 'প্রবাসী' পত্রিকায় (মাঘ ১৩৩৮) পুনর্মুদ্রিত করেন। যোগেশচন্দ্র *হিন্দু মেলার ইতিবৃত্ত* গ্রন্থে এটির আলোকচিত্র মুদ্রিত করেছিলেন। সাময়িকপত্রে এটিই রবীন্দ্রনাথের নাম স্বাক্ষরিত প্রথম মুদ্রিত কবিতা, যেটির কথা রবীন্দ্রনাথ কোথাও উল্লেখ করেননি। কিন্তু 'দেশ' পত্রিকায় (২৯ মে ১৯৭৬) রথীন্দ্রকান্ত ঘটক চৌধুরী 'রবীন্দ্রনাথের একটি দুষ্প্রাপ্য কবিতা' শীর্ষক প্রবন্ধে 'হোক্ ভারতের জয়' নামের ৮০ পংক্তিতে রচিত একটি কবিতা পুনর্মুদ্রিত করে পূর্বোক্ত ধারণা বদলে দেন। কবিতাটি কালীপ্রসন্ন ঘোষ সম্পাদিত 'বান্ধব' পত্রিকার মাঘ ১২৮১ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছিল। কবিতাটির শেষে '(র)' অক্ষরটি লেখা আছে এবং পাদটীকায় বলা আছে: 'হিন্দু মেলা উপলক্ষে এই কবিতাটি রচিত হইয়াছিল।' শ্রীঘটক চৌধুরী মনে করেন, উদ্বোধন দিবসে এই কবিতাটিই রবীন্দ্রনাথের দ্বারা 'পঠিত' হয়েছিল। প্রশান্তকুমারের মতে, ইন্ডিয়ান ডেইলি নিউজ ও বেঙ্গলি-র সংশ্লিষ্ট প্রতিবেদনও শ্রীঘটকচৌধুরীর বক্তব্য সমর্থন করে। প্রশান্তকুমার এই সঙ্গে বলেছেন, 'হিন্দুমেলায় উপহার' মেলার কোনও অনুষ্ঠানে পঠিত বা আবৃত্তি করা হয়েছিল কিনা তার নিঃসন্দিগ্ধ উল্লেখ কোথাও দেখা যায় না। তবে যাঁরাই বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করেছেন, তাঁরাই কবিতাটি যে রবীন্দ্রনাথ শ্রোতাসাধারণকে শুনিয়েছিলেন এ-বিষয়ে একমত। এমনকি কবিতাটি যে মুদ্রিত করে 'উপহার' হিসেবে বিতরণ করা হয়েছিল, 'ক্যাশবহি' থেকে তারও প্রমাণ দিয়েছেন প্রশান্তকুমার। [রবিজীবনী/প্রথম খণ্ড (১২৬৮-৮৪)/প্রশান্তকুমার পাল/ভূর্জপত্র/১ম সং, ১৩৮৯ বঙ্গাব্দ (পৃ ২৩৪-২৩৬)।]

নবগোপালের The National Paper এবং সমসাময়িক অন্যান্য পত্রিকায় ছড়িয়ে থাকা বিবরণ এখনও পূর্ণাঙ্গ আকারে সংকলিত হয়নি। নানা স্মৃতিকথায় ছড়ানো তথ্যও কেবল আংশিকভাবে উৎকলিত হয়েছে। এগুলি একত্র হলে নতুন চিন্তার উপাদান মিলবে সন্দেহ নেই, সমর্থক ও সমালোচকদের বক্তব্য সামগ্রিকভাবে হাতে এলে দ্বন্দ্বের চরিত্র স্পষ্টতর হবে। অন্য দিকে, মেলার প্রাণপুরুষ নবগোপাল মিত্রের জীবনী-তথ্য আজও নিতান্ত অসম্পূর্ণ, যদিও যোগেশচন্দ্র তাঁর *ভারতের মুক্তি সন্ধানী* গ্রন্থে (নূতন সং ১৯৫৮) নবগোপালকে নিয়ে বর্তমান গ্রন্থের তুলনায় বিস্তৃততর আলোচনা করেছিলেন। উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে বাঙালির স্বদেশচিন্তার গতিপ্রকৃতি গভীরভাবে বোঝার জন্য তাই এই সব বিবরণের গুরুত্ব থেকেই যাবে।

ইন্দ্রজিৎ চৌধুরি

হিন্দু মেলার ইতিবৃত্ত

ভূমিকা

উনবিংশ শতাব্দীতে বাংলা দেশে যখন রাজনৈতিক চেতনার উন্মেষ হয়েছিল তখন যাঁরা চিন্তানায়ক ছিলেন তাঁরা অনেকে ডিরোজিওর শিষ্য। যাঁরা সে যুগে দেশাত্মবোধক কবিতা লিখেছিলেন তাঁদের মধ্যে ডিরোজিওর নাম প্রথমে মনে হওয়া স্বাভাবিক। দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর-কৃত একটি অনুবাদের কথা অনেকের মনে পড়বে—

স্বদেশ আমার, কিবা জ্যোতির মণ্ডলী।
ভূষিত ললাট তব; অস্তে গেছে চলি
সে দিন তোমায়; হায় সেই দিন যবে
দেবতা সমান পূজ্য ছিলে এই ভবে।
কোথায় সে বন্দ্যপদ। মহিমা কোথায়।
গগনবিহারী পক্ষী ভূমিতে লুটায়।

ডিরোজিওর উদ্দেশ্য ছিল দেশের অতীত গৌরবের প্রতি শ্রদ্ধা ফিরিয়ে আনা ও যুবক-সম্প্রদায়ের মনকে প্রচলিত অন্ধবিশ্বাস থেকে মুক্ত করা। তাঁর শিষ্যরা অনেকে দ্বিতীয় উদ্দেশ্যটি যেভাবে পালন করবার চেষ্টা করেছিলেন, প্রথম উদ্দেশ্যটি সেভাবে করেননি। নব্যবঙ্গের জীবনযাত্রা ও আচরণ সমালোচনার বিষয় হয়েছে। সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক জয়গোপাল তর্কালংকার ডিরোজিওর শিষ্যদের পরিহাস করে একটি শ্লোক রচনা করেছিলেন। তার শেষ দুটি চরণ এই রকম—

ফিরীঙ্গী পুঙ্গব শ্রীমদ্ ডিরোজিও কুশেশয়ে।
মধুপানরতাঃ সম্যগ্‌বিদিগ্ জ্ঞানবর্জিতাঃ॥

ডিরোজিওর এক শিষ্য রসিককৃষ্ণ মল্লিক আদালতে বলেছিলেন, "আমি গঙ্গাজলের পবিত্রতায় বিশ্বাস করি না।" এ উক্তিতে স্বাধীন মনের পরিচয় আছে সন্দেহ নেই, কিন্তু দেশের সংস্কৃতির প্রতি কিঞ্চিৎ অবজ্ঞাও প্রকাশ পেয়েছে। অনেকের মনে দেশীয় সংস্কারের প্রতি যে প্রতিকূল মনোভাব ছিল, বিদেশী সংস্কারের প্রতি হয়তো সে-রকম ছিল না। শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল পূর্বাভাসে এই কথাই বলেছেন। ইংরেজি শিক্ষার ফলে 'যুগযুগান্তের মোহনিদ্রা' দূর হয়েছিল, কিন্তু নতুন মোহাচ্ছন্ন অবস্থারও সৃষ্টি হয়েছিল। এই অবস্থা থেকে হিন্দুমেলা বাংলা দেশকে পরিত্রাণ করেছে। এ কথা মনে রাখলে হিন্দুমেলার সার্থকতা বোঝা যাবে।

মেলার প্রথম অধিবেশন হয়েছিল ১২৭৩ বঙ্গাব্দের (১৮৬৭) চৈত্র-সংক্রান্তিতে। প্রথম তিন বৎসর একে চৈত্রমেলা বলা হত। 'সংবাদ পূর্ণ-চন্দ্রোদয়' পত্রিকা লিখেছিলেন, চড়কের সময় যে-সব 'কষ্টদায়ক শারীরিক প্রথা' প্রচলিত ছিল, সরকারি হুকুমে তা বন্ধ করে দেওয়া হয়। এর ফলে যুবকদের উৎসাহে চৈত্রমেলার প্রবর্তন হয়। এই উক্তিতে ভুল ধারণার অবকাশ আছে। গাজনের উৎসব ও চৈত্রমেলা এক জাতীয় অনুষ্ঠান নয়।

রাজনারায়ণ বসু আত্মচরিতে লিখেছেন অন্য অনেকের মতো ইংরেজি শিক্ষার ফলে তাঁর মনের আমূল পরিবর্তন হয়নি। 'আমার ধাতু বরাবর গাঢ় বাঙ্গালীতর; আমার কলেজের শিক্ষা উহার উপর পাশ্চাত্ত্য সভ্যতা জোর করিয়া আরোপ করিয়াছিল মাত্র, কলমের ন্যায় উহা আমার প্রকৃতির উপর গাঢ়রূপে বসে নাই।' তাঁর আশঙ্কা হয়েছিল চিন্তাধারার বিপ্লব ও সমাজজীবনের দ্রুত পরিবর্তনের ফলে বাংলাদেশ প্রাচীন ঐতিহ্য থেকে বিচ্যুত হচ্ছে। এই পরিণাম থেকে মুক্তি পেতে হলে জাতীয় ভাবের প্রসার ছাড়া আর কোনো উপায় নেই। প্রথম বার্ষিক অনুষ্ঠানের পর মেলার কর্তৃপক্ষ মেলার উদ্দেশ্য আলোচনা প্রসঙ্গে এই কথার পুনরুক্তি করেছিলেন—

"স্বজাতীয়দিগের মধ্যে সদ্ভাব স্থাপন করা" ও "স্বদেশের উন্নতিসাধন করাই" মেলার উদ্দেশ্য। সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর 'বাল্যকথা'য় হিন্দুমেলার প্রতিষ্ঠার কথা উল্লেখ করেছেন—"আমি বোম্বাইয়ে কার্য্যারম্ভ করার কিছু পরে কলিকাতায় এক স্বদেশী মেলা প্রবর্তিত হয়। বড়দাদা নবগোপাল মিত্রের সাহায্যে মেলার সূত্রপাত করেন।...কলিকাতার প্রান্তবর্তী কোন একটি উদ্যানে বৎসরে বৎসরে তিন চারি দিন ধ'রে এই মেলা চলতো। সেখানে দেশী জিনিষের প্রদর্শনী, জাতীয় সঙ্গীত, বক্তৃতাদি বিবিধ উপায়ে লোকের দেশানুরাগ উদ্দীপ্ত করবার চেষ্টা হত।" প্রথম দিকে হিন্দুমেলার সম্পাদক ছিলেন সত্যেন্দ্রনাথের মেজদাদা গণেন্দ্রনাথ ঠাকুর। নবগোপাল মিত্র সহকারী সম্পাদক ছিলেন।

নবগোপাল মিত্রর 'ন্যাশনাল পেপারে' ১৭ এপ্রিল, ১৮৬৭ তারিখে মেলার প্রথম অধিবেশনের সংক্ষিপ্ত বিবরণ পাওয়া যায়। অধিবেশন হয়েছিল চৈত্র-সংক্রান্তির দিন চিৎপুরে রাজা নরসিংহ রায়ের বাগানবাড়িতে। দ্বিতীয় বৎসরের অধিবেশনে গণেন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেছিলেন, "আমাদের পরস্পরের মিলন এবং একত্র হওয়া যে কত আবশ্যক ও তাহাও যে আমাদের পক্ষে উপকারী তাহা বোধহয় কাহারও অগোচর নাই। আমাদের এই মিলন সাধারণ ধর্ম-কর্মের জন্য নহে, কোনও বিষয় সুখের জন্যও নহে, কোনও আমোদ প্রমোদের জন্য নহে, ইহা স্বদেশের জন্য—ইহা ভারতভূমির জন্য।" মেলার অনুষ্ঠাতাগণ একটি বিশেষত্বের কথা উল্লেখ করেছেন। দেশের "উত্তম বিষয়ের অনুষ্ঠানে" সর্বত্রই "রাজপুরুষগণ এবং অপরাপর ইংরাজ মহাত্মারাই" প্রবর্তক। কিন্তু চৈত্রমেলা নিরবচ্ছিন্ন স্বজাতীয় অনুষ্ঠান ও ইহাতে ইয়োরোপীয়দিগের নামগন্ধ নাই।" মনোমোহন বসুও একটি 'বিশেষ মেলার' প্রয়োজনের কথা বলেছিলেন, "যাহা নির্ব্বিবাদে ভারতবর্ষস্থ সমস্ত শ্রেণীর লোকের প্রীতিবন্ধন হইতে পারে।" তাঁর দৃষ্টি ভাবীকালেও প্রসারিত ছিল। তিনি আশা করেছিলেন, চৈত্রমেলায় সে বীজ রোপণ করা হয়েছে, তার ফলে ভবিষ্যতে "অতিশুভ্র সৌভাগ্যপুষ্প বিকশিত" হবে। "তার ফলের নাম করিতে এক্ষণে সাহস হয় না। অপর দেশের লোকেরা তাহাকে স্বাধীনতা নাম দিয়া তাহার অমৃতফল ভোগ করিয়া থাকে।" এর প্রায় কুড়ি বৎসর পরে জাতীয় কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা হয়েছিল, প্রথম যুগের কংগ্রেসের আবেদনের সুরের সঙ্গে হিন্দুমেলার পরিচালকদের দৃষ্টিভঙ্গীর প্রভেদ স্পষ্ট। সে যুগের কংগ্রেসের বিবিধ প্রস্তাবকে রবীন্দ্রনাথ "আবেদন ও নিবেদনের থালা" বলেছেন। হিন্দুমেলাকে এ কথা বলবার কোনো অবকাশ ছিল না। তার একটি কারণ সুস্পষ্ট। জীবনস্মৃতিতে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরপরিবারের 'স্বদেশাভিমানের' কথা উল্লেখ করেছেন—"স্বদেশের প্রতি পিতৃদেবের যে একটি আন্তরিক শ্রদ্ধা তাঁহার জীবনের

সকলপ্রকার বিপ্লবের মধ্যেও অক্ষুণ্ণ ছিল, তাহাই আমাদের পরিবারস্থ সকলের মধ্যে একটি প্রবল স্বদেশপ্রেম সঞ্চার করিয়া রাখিয়াছিল।" কেবল ঠাকুর পরিবারের অর্থানুকূল্য নয়, ঠাকুরপরিবারের দৃষ্টিভঙ্গী হিন্দুমেলাকে স্বাতন্ত্র্য দান করেছে।

১৮৮০ সালে অনুষ্ঠিত চতুর্দশ অধিবেশনই সম্ভবতঃ হিন্দুমেলার শেষ অধিবেশন। নবম অধিবেশন (১৮৭৫) উপলক্ষ্যে 'সোমপ্রকাশ' লিখেছিলেন "ইহা ক্রমেই শ্রীসম্পন্ন হইতেছে।" কিন্তু এই সময় থেকেই সংবাদপত্রে মেলার কিছু বিরূপ সমালোচনা প্রকাশিত হয়েছিল। অষ্টম অধিবেশনের সময় 'অমৃতবাজার পত্রিকা' আশঙ্কা প্রকাশ করেছিলেন হিন্দুমেলা ক্রমে "মেমসাহেবদের ফ্যান্সি ফেয়ারে" পরিণত না হয়। অমৃতবাজারের আশঙ্কার কারণ হয়তো অনুমান করা যায়। মেলার সংগীতচর্চা, আতশবাজী, মহিলাদের শিল্পকর্মের প্রদর্শনী অমৃতবাজার পত্রিকার প্রীতিকর হয়নি। পত্রিকা-সম্পাদক মনে করেছিলেন মেলায় মধুর রসের আধিক্য হচ্ছে। পত্রিকা কয়েক বৎসর পূর্বেই লিখেছিলেন, "হিন্দুমেলার উদ্দেশ্য যেরূপ মহৎ মেলাটি এখন পর্য্যন্ত তদনুরূপ বৃহত্তর হইল না ইহা অত্যন্ত দুঃখের বিষয়।... এখন আমাদের মধুর রস ছাড়িয়া তিক্ত রসস্বাদ গ্রহণ করার প্রয়োজন হইয়াছে।" ১৮৭৮ সাল থেকে মেলার অধিবেশনের সময় পরিবর্তিত হয়। প্রথম কয়েক বৎসর চৈত্র সংক্রান্তিতে, পরে মাঘ সংক্রান্তিতে মেলার অনুষ্ঠান হত। এখন থেকে তার পরিবর্তে সরস্বতী পূজার সময় অনুষ্ঠান করা ঠিক হয়। তখন হিন্দুমেলার উৎসাহ অনেক কমে এসেছে। ১৮৮০ সালে 'সুলভ সমাচার' হিন্দুমেলার অবনতি দেখে আক্ষেপ করেছিলেন—"বাঙ্গালীর উৎসাহ খড়ের আগুন।"

হিন্দুমেলার অবনতির একটি কারণ অবশ্য এই যে সেই সময় একাধিক রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের জন্ম হয়েছিল এবং শিক্ষিত যুবকসম্প্রদায় স্বভাবতই সেদিকে আকৃষ্ট হয়েছিলেন। ইণ্ডিয়া লীগের জন্ম হয়েছিল ১৮৭৫ সালে এবং ১৮৭৬ সালে ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশনের প্রতিষ্ঠা হয়। এই-সব প্রতিষ্ঠানের রাজনৈতিক উদ্দীপনার যে নতুন স্বাদ শিক্ষিতসম্প্রদায় পেয়েছিলেন হিন্দুমেলায় তার অভাব ছিল। কিন্তু এ কথা বললে অন্যায় হবে না হিন্দুমেলার সঙ্গে দেশের মাটির যে মিল ছিল এই-সব প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে তা ছিল না। তাদের কাঠামো অনেক পরিমাণে বিদেশী। সে যুগের যাঁরা নেতা ছিলেন তাঁদের অনেকের দৃষ্টি দূর সিন্ধুতীরে নিবদ্ধ ছিল এবং আচরণে ও মানসিকতায় তাঁরা দেশবাসীর প্রতীক ছিলেন না। এঁদের লক্ষ্য করেই রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন—"কোট পরা কায় সঁপেছেন হায়। শুধু স্বদেশের জন্য।"

শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র বাগল হিন্দুমেলার অনুষ্ঠান থেকে বাংলা দেশে জাতীয় সংগীতের উৎপত্তির কথা বলেছেন। "ছন্দ ও সুরে দেশমাতার বন্দনা প্রশস্তি জাতীয় মেলা হইতেই আরব্ধ হয়।" সব দেশেই রাজনৈতিক চেতনার পরিচয় সাহিত্যে পাওয়া যায়। উনবিংশ শতাব্দীর বাংলা সাহিত্যেও সে পরিচয় বহন করেছে। কিন্তু সে যুগের অনেক জাতীয় সংগীতের সঙ্গে হিন্দুমেলা উপলক্ষ্যে যে-সব গান রচিত কিংবা গীত হয়েছিল তার প্রভেদ চোখে পড়বে। তখনকার দেশাত্মবোধক সংগীত সাধারণতঃ ভারতভিক্ষা বা ভারতবিলাপে পরিণত হত। সে রচনাকে স্বাদেশিকতার পরাকাষ্ঠা মনে করা হত তাতেও ইংরেজের স্তুতির অন্ত ছিল না। একজন বিখ্যাত কবি ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের অধিবেশন উপলক্ষ্যে যে কবিতা রচনা করেছিলেন তার এক অংশ এই রকম :

ধন্য রে বৃটন ধন্য শিক্ষা তোর
যুগযুগান্তের অমানিশা ঘোর
তোরি গুণে আজ হল উন্মোচন,
তোরি গুণে আজ ভারত ভুবন
এ সখ্য বন্দনে বাঁধিল।

হিন্দুমেলার একটি গান 'লজ্জায় ভারতযশ গাইব কি করে' তখন বিখ্যাত হয়েছিল। এর শেষের দু-চরণ এই রকম—

আমরা সকলে হেথা, হেলা করি নিজ মাতা,
মায়ের কোলের ধন নিয়ে যায় পরে।

গানটিতে একটি নতুন সুর ধ্বনিত হয়েছে সন্দেহ নেই। কিন্তু যে গান প্রকৃতপক্ষে হিন্দুমেলার উদ্দেশ্যকে প্রকাশ করেছে, সে হচ্ছে—

গাও ভারতের জয়
কি ভয় কি ভয়।

বঙ্কিমচন্দ্র এই গানটিকে উচ্ছ্বসিত সংবর্ধনা জানিয়েছিলেন। তিনি অতিশয়োক্তি করেননি।

এখন থেকে প্রায় চল্লিশ বৎসর পূর্বে প্রধানত 'প্রবাসী' ও 'মডার্ণ রিভিউ' পত্রিকায় শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র বাগল লিখিত ঊনবিংশ শতাব্দীর সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবনের কাহিনী প্রকাশিত হতে শুরু হয়। এই দীর্ঘকাল ধরে তাঁর অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে দেশের রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান, সামাজিক জীবন ও চিন্তানায়কদের তথ্যভিত্তিক বিবরণ সহজলভ্য হয়েছে, গত শতাব্দীর ছবি এই শতাব্দীর পাঠকের কাছে স্পষ্ট হয়েছে।

প্রায় পঁচিশ বছর আগে এই গ্রন্থের প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হয়। তখন হিন্দুমেলার ইতিবৃত্ত এবং বাংলাদেশের রাজনৈতিক চেতনার উন্মেষের কাহিনীর সঙ্গে অনেকে ভালো পরিচয় ছিল না। এ কথা হয়তো সত্য যে বাঙালী ঐতিহাসিকেরা অন্য প্রদেশের ইতিহাস চর্চায় সে-রকম উৎসাহ দেখিয়েছেন বাংলা দেশের অপেক্ষাকৃত আধুনিক কালের ইতিহাস রচনায় যে-রকম উৎসাহ দেখাননি। শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র বাগল এবং অল্প কয়েকজন গবেষকের চেষ্টায় সে ত্রুটি অনেকাংশে ঢাকা পড়ে গিয়েছে। বঙ্কিমচন্দ্রের জীবিতকালে যখন বাংলা দেশের একটি ক্ষীণাঙ্গ ইতিহাস প্রকাশিত হয়েছিল তখন তাঁর উৎসাহের অবধি ছিল না। তাকে তিনি 'সুবর্ণের মুষ্টি' বলেছেন। হিন্দুমেলার ইতিহাস যখন প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল তখন এ কথা বলবার মতো কেউ ছিলেন না। কিন্তু যোগেশচন্দ্রের অসংখ্য কৃতজ্ঞ দেশবাসী তাঁর দীর্ঘ সাধনা ও নিষ্ঠার কথা শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করবেন।

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়
কলিকাতা

প্রতুলচন্দ্র গুপ্ত

গ্রন্থকারের নিবেদন

প্রায় পঁচিশ বৎসর পূর্বে হেমেন্দ্রনাথ দত্ত-সম্পাদিত 'মাতৃভূমি' পত্রিকায় হিন্দুমেলা প্রসঙ্গে আমি কয়েকটি প্রবন্ধ লিখি। প্রবন্ধগুলি প্রকাশের অল্পকাল পরে 'জাতীয়তার নবমন্ত্র বা হিন্দুমেলার ইতিবৃত্ত' নামক পুস্তকে সেগুলি গ্রথিত করি। ইহা তখন সুধীসমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে সমর্থ হয়। ঊনবিংশ শতাব্দীর তৃতীয় পাদে যে-জাতীয় ভাবাদর্শ আমাদের হৃদয়ে অনুপ্রবিষ্ট হয় তাহা হিন্দুমেলা বা জাতীয় মেলার মতো প্রতিষ্ঠানের ফলশ্রুতি বলিলে এতটুকু অত্যুক্তি হয় না। প্রকাশের কিছু সময়ের মধ্যে পুস্তকখানি নিঃশেষিত হইয়া যায়। দীর্ঘকাল পরে বন্ধুবর শ্রীপুলিনবিহারী সেনের আগ্রহাতিশয়ে ও চেষ্টাযত্নে এই পুনঃপ্রকাশ সম্ভব হইল।

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসের প্রধান অধ্যাপক ডক্টর প্রতুলচন্দ্র গুপ্ত এই সংস্করণের নিমিত্ত একটি ভূমিকা বা গ্রন্থপরিচিতি লিখিয়া দিয়াছেন। তাঁহাকে আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি।

বর্তমান সংস্করণে এই গ্রন্থের অনেক স্থলে পুনর্বিন্যাস করা হইয়াছে এবং কোনো কোনো অংশ পরিবর্ধিত হইয়াছে। এই কার্যে অধ্যাপক শ্রীমান শুভেন্দুশেখর মুখোপাধ্যায় আমাকে বিশেষভাবে সাহায্য করিয়াছেন। আমার দৃষ্টিশক্তি ক্রমশ ক্ষীণ হইতে হইতে অধুনা একেবারে লুপ্ত হইয়াছে। কাজেই এ ধরনের কার্যে যে অপরের উপর আমাকে নির্ভর করিতে হইয়াছে তাহা বলাই বাহুল্য। প্রথমেই আমার সাহায্যকারিগণকে সাধুবাদ না করিলে প্রত্যবায় হইবে।

শ্রীমান বিমলকৃষ্ণ দেব পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত ব্যাপারে প্রথম পর্যায়ে আমাকে বিশেষ সহায়তা করিয়াছেন। গ্রন্থের পুনর্বিন্যাসে শ্রীমান শুভেন্দুশেখর বিশেষ সহায়তা করিয়াছেন, পুস্তকের নির্ঘণ্টও তিনি প্রস্তুত করিয়া দিয়াছেন। পুস্তক প্রকাশ ত্বরান্বিত করিবার জন্য শ্রীমান সুবিমল লাহিড়ী বিশেষ শ্রম-স্বীকার করিয়াছেন।

পুলিনবাবুর নির্বন্ধাতিশয়ে পুস্তকখানির শেষে আমার গবেষণামূলক বাংলা-ইংরেজী বই ও প্রবন্ধাবলীর একটি তালিকা সন্নিবেশিত হইয়াছে; ইহার গ্রন্থসূচী অংশ শ্রীমান শুভেন্দুরই কৃত।

যখন বুঝিলাম দৃষ্টিশক্তি অতি দ্রুত হ্রাস পাইতেছে, তখন বিভিন্ন পত্রিকায় ও সংকলনগ্রন্থে প্রকাশিত প্রবন্ধাদির একটি তালিকা করার কথা আমার মনে উদিত হয় এবং আমার স্নেহভাজন কয়েকজনকে দিয়া এইরূপ একটি তালিকা করাইতে প্রবৃত্ত হই। ডক্টর শ্রীগোপিকামোহন ভট্টাচার্য, শ্রীবিমলকৃষ্ণ দেব, শ্রীসমর বসু এই কার্যে আমাকে স্বতঃপ্রণোদিত হইয়া সাহায্য করিয়াছেন। বিমলকৃষ্ণ পত্রিকানুযায়ী প্রবন্ধগুলির তালিকা করিয়া সাজাইয়া গুছাইয়া দিয়াছেন— শ্রীমান কানাইলাল দত্ত এই বিষয়ে বিশেষ আগ্রহী হইয়া তালিকাটির পরিণত রূপ দিয়াছেন।

এই পুস্তকে প্রদত্ত আমার রচনার তালিকায় * কেবল গবেষণামূলক পুস্তক ও প্রবন্ধই সন্নিবেশিত হইয়াছে।

সবশেষে আর একটি কথা না বলিয়া পারি না, শ্রীপুলিনবিহারী সেন উদ্যোগী না হইলে আমার অন্যান্য বহু বইয়ের মতো এই বইখানিরও হয়তো নূতন সংস্করণ প্রকাশ সম্ভব হইত না। তিনি এই পরিবর্ধিত সংস্করণের প্রকাশে যে যত্ন লইয়াছেন তাহা কদাচিৎ দৃষ্ট হয়।

বিশ্বভারতী-কর্তৃপক্ষ অনুগ্রহপূর্বক রবীন্দ্রনাথের কবিতা দুইটি গ্রন্থান্তর্ভুক্ত করিতে অনুমতি দিয়াছেন। অমৃতবাজার পত্রিকা-কর্তৃপক্ষ রবীন্দ্রনাথের 'হিন্দুমেলায় উপহার' কবিতা-সংবলিত পত্রিকার প্রতিলিপি গ্রহণের সুযোগ দিয়াছেন; এজন্য তাঁহাদিগকে আমার কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি।

হিন্দুমেলার শতপূর্তিবর্ষে পুস্তকখানির পুনঃপ্রকাশের জন্য প্রকাশক পাঠকসাধারণেরও সাধুবাদ পাইবেন।

নব ব্যারাকপুর
চব্বিশ পরগনা

শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল

* বর্তমান সংকলনে এটি বর্জিত।

পূর্ব্বাভাস

উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগ হইতেই ভারতবর্ষের উন্নতি-প্রচেষ্টায় দুইটি ধারা চলিয়া আসিতেছিল। একটি শাসক জাতির সহযোগে ও তাহার অনুকরণে স্বদেশের উন্নতি সাধন, অপরটি অন্যের সাহায্যের অপেক্ষা না করিয়া বা অপরের অনুকরণ না করিয়া স্বচেষ্টায় স্বদেশের কল্যাণ করা। এই দ্বিতীয় ধারার উদ্গাতাদের মধ্যে তত্ত্ববোধিনী সভা ও তাহা মুখপত্র 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা' অন্যতম বলা চলে। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, অক্ষয়কুমার দত্ত, রাজনারায়ণ বসু প্রভৃতি তত্ত্ববোধিনী সভার নেতৃবর্গ স্বীয় চিন্তা পত্রিকার মধ্য দিয়া প্রচার করিয়া, নিজেদের এবং অপরাপর ব্যক্তিদের কর্ম্মে উদ্বুদ্ধ করিতেন। স্বাতন্ত্র্যবোধ ও স্বাবলম্বন—এই দুইটির উপরেই যে আমাদের জাতীয় উন্নতি বিশেষ ভাবে নির্ভর করে, এই বাণী তাঁহাদের প্রমুখাৎ আমরা সুস্পষ্ট শুনিতে পাই। কবিবর ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের 'সংবাদ প্রভাকর', কাশীপ্রসাদ ঘোষের 'হিন্দু ইন্টেলিজেন্সার', গিরিশচন্দ্র ঘোষ ও হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের 'হিন্দু পেট্রিয়ট', দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের 'সোমপ্রকাশ', গিরিশচন্দ্র ঘোষের 'বেঙ্গলী' প্রভৃতি পত্রিকাও বাঙালীর মনে এই বৃত্তিদ্বয়ের উন্মেষে সহায়তা করে। গুপ্তকবির স্বদেশপ্রীতিমূলক কবিতাবলী, রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পদ্মিনী উপাখ্যান', হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'বৃত্রসংহার' প্রভৃতিও এই নূতন ভাবের খোরাক কম জোগায় নাই।

কিন্তু ইংরেজী শিক্ষার প্রাবল্যে এবং স্বদেশীয় শিক্ষার অনাদর হেতু তাঁহাদের কথা শিক্ষিত সম্প্রদায়ের উপর সাধারণ ভাবে কার্য্যকর হওয়া সম্ভবপর ছিল না। যুগ-যুগান্তের মোহনিদ্রা হইতে জাগাইলেও ইংরেজী শিক্ষা তাহাদিগকে নূতন করিয়া মোহাবিষ্ট করিয়া তুলিতেছিল। মনস্বী রাজনারায়ণ বসু স্বয়ং ইংরেজী সাহিত্যে সুপণ্ডিত এবং বঙ্গসন্তানদের ইংরেজী শিক্ষা-দানে রত—তিনি নব্যবঙ্গের অন্তর্ভুক্ত এক প্রধান ব্যক্তি। তাঁহার নিকট ইংরেজী শিক্ষার কুফলগুলি যেমন প্রতিভাত হইয়াছিল এমনটি বোধ হয় আর কাহারও নিকট হয় নাই। তিনি মেদিনীপুর সরকারী বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ছিলেন। এই কার্য্যে নিযুক্ত থাকা কালে তিনি তথায় বহু জনহিতকর সভা-সমিতি প্রতিষ্ঠা করেন। ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দে সুরাপান-নিবারণী সভা প্রতিষ্ঠা করিয়া মদ্যপায়ীদের বিষম কোপে পড়িয়াছিলেন। কিন্তু বিদেশী শিক্ষার একটি কুফল নিরাকরণের চেষ্টা করিলেই তো মূল সংশোধন হয় না, তাই তিনি এই সময় জাতীয় গৌরব সম্পাদনী বা গৌরবেচ্ছা সঞ্চারিণী সভা স্থাপন করিলেন। স্বদেশীয় শিক্ষা-সংস্কৃতি, ভাষা-সাহিত্য, রীতিনীতি, আচার-ব্যবহার পোষাক-পরিচ্ছদ এক কথায় আমাদিগের যাহা কিছু নিজস্ব তৎসমুদয় রক্ষণ ও পোষণ করাই ছিল এই সভার উদ্দেশ্য। এই সভার কার্য্যক্রম লইয়া একটি ব্যাপকতর প্রচেষ্টার উদ্দেশ্যে রাজনারায়ণ ১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দে ইংরেজীতে একখানি অনুষ্ঠান-পত্র রচনা করেন। এই অনুষ্ঠান-পত্রখানির মধ্যে 'হিন্দু ব্যায়াম, হিন্দু সঙ্গীত, হিন্দু চিকিৎসা বিদ্যা এবং সংস্কৃত ও বাঙ্গালা

ভাষায় অনুশীলন, যত পারা যায় বাঙ্গালা শব্দ ব্যবহার করিয়া আমাদিগের কথোপকথনের ভাষার বিশুদ্ধতা সম্পাদন, বাঙ্গালা ভাষায় পরস্পর পত্র লেখা এবং বাঙ্গালীর সভাতে বাঙ্গালায় বক্তৃতা করা, সুরাপানাদি বিদেশীয় অনিষ্টকর প্রথা যাহাতে প্রচলিত না হয় তাহার উপায় অবলম্বন করা, হিন্দু শাস্ত্র অবলম্বন করিয়া সমাজ সংস্কার কার্য্য সম্পাদন করা, স্বদেশীয় সুপ্রথা সকল রক্ষা করা, নমস্কার প্রণামাদি স্বদেশীয় শিষ্টাচার পালন করা, বিদেশীয় রীতিতে পরিচ্ছদ পরিধান ও আহার কার্য্য সম্পাদন পরিত্যাগ করা, দেশীয় ভাষায় নাটকাদি অভিনয় করা ইত্যাদি বিবিধ বিষয় আলোচিত হয়।"[১]

১. তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, আশ্বিন ১৭৮৮ শক

জাতীয় মেলার জন্মকথা

বিদেশী শিক্ষার কুফল প্রতিরোধ করিয়া স্বদেশানুরাগের উন্মেষ ও বৃদ্ধিকল্পে রাজনারায়ণ মেদিনীপুরে যে সঙ্ঘবদ্ধ প্রচেষ্টার সূত্রপাত করেন তাহাই ব্যাপকতররূপ পরিগ্রহ করে জাতীয় মেলার মধ্যে। স্বদেশানুরাগের প্রবাহ ফল্গু নদীর মত সাধারণের অলক্ষিতেই বহিয়া চলিয়াছিল। কলিকাতায় দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর নিজ পরিবার ও সহকর্ম্মীদের মধ্যে ইহা অব্যাহত রাখিতে সচেষ্ট ছিলেন। তিনি ১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দের ৭ই আগস্ট 'নেশন্যাল পেপার' প্রতিষ্ঠা করেন এবং ইহার সম্পাদকীয় ভার অর্পণ করেন অনন্যকর্ম্মা যুবক নবগোপাল মিত্রের উপর। রাজনারায়ণের উক্ত অনুষ্ঠান-পত্রখানি 'নেশন্যাল পেপার'ই হুবহু মুদ্রিত করেন। এই অনুষ্ঠান-পত্রখানিতে বর্ণিত বিষয়বস্তু পাঠে সম্পাদক নবগোপাল মিত্রের মনে ইহার আদর্শে জাতীয় সভা প্রতিষ্ঠার কথা প্রথম উদিত হয়। রাজনারায়ণ বসু 'আত্ম-চরিতে' (পৃ ২০৮) লিখিয়াছেন—

"শ্রীযুক্ত নবগোপাল মিত্র মহোদয় আমার প্রণীত 'জাতীয় গৌরবেচ্ছা সঞ্চারিণী সভা'র অনুষ্ঠান-পত্র পাঠ করাতে হিন্দু মেলার ভাব তাঁহার মনে প্রথম উদিত হয়। ইহা তিনি আমার নিকট স্পষ্ট স্বীকার করিয়াছেন। এই হিন্দু মেলা সংস্থাপন করিবার পর উহার অধ্যক্ষতা করিবার জন্য মিত্র মহাশয় জাতীয় সভা সংস্থাপন করেন। উহা আমার প্রস্তাবিত 'জাতীয় গৌরবেচ্ছা সঞ্চারিণী সভা'র আদর্শে গঠিত হইয়াছিল।"

জাতীয় মেলা প্রতিষ্ঠায় উদ্যোগীদের মধ্যে প্রথম ও প্রধান ছিলেন নবগোপাল মিত্র মহাশয়। কিন্তু তাঁহার এই কার্য্যে প্রথম হইতেই সহায় হইয়াছিলেন মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের জ্যেষ্ঠপুত্র দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর। দ্বিজেন্দ্রনাথ তাঁহার স্মৃতিকথায় বলিয়াছেন—

"নবগোপাল একটা ন্যাশনাল ধুয়া তুলিল; আমি আগাগোড়া তার মধ্যে ছিলাম। সে খুব কাজ করিতে পারিত; কুস্তি জিমনাষ্টিক প্রভৃতির প্রচলন করার চেষ্টা তাঁর খুব ছিল; কিন্তু কি রকম কি হওয়া উচিত; সে সব পরামর্শ আমার কাছ থেকে লইত।"[১]

মহর্ষির ভ্রাতুষ্পুত্র গণেন্দ্রনাথ ঠাকুরও জাতীয় মেলার বিশিষ্ট কর্ম্মী ছিলেন। সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর লিখিয়াছেন—

"আমি বোম্বাইয়ে কার্য্যারম্ভ করবার কিছু পরে কলিকাতায় এক স্বদেশী মেলা প্রবর্ত্তিত হয়। বড়দাদা নবগোপাল মিত্রের সাহায্যে মেলার সূত্রপাত করেন, পরে মেজদাদা (গণেন্দ্রনাথ ঠাকুর) তাতে যোগদান করায় প্রকৃতপক্ষে তার শ্রীবৃদ্ধি সাধন হয়।"[২]

ভারতবাসীদের মনে স্বাজাত্যবোধ ও স্বাবলম্বন-বৃত্তির উন্মেষে এই মেলার কৃতিত্ব অসামান্য। রাজনারায়ণ বসু, দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, মনোমোহন বসু, শিবনাথ শাস্ত্রী, বিপিনচন্দ্র পাল প্রমুখ প্রখ্যাত মনীষীগণ বিভিন্ন পুস্তকে, প্রবন্ধে, বক্তৃতায় এবং নিজ নিজ স্মৃতি-কথায় জাতীয় মেলার বিষয় বলিয়া গিয়াছেন। জাতীয় ভাবের

উদ্বোধন কল্পে ইহা সে-যুগে কতখানি কার্য্যকর হইয়াছিল এইসব মনীষীর রচনা হইতে তাহা সম্যক্ বুঝা যায়। শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় লিখিয়াছেন—

"কেশবচন্দ্রের বক্তৃতা, দীনবন্ধুর নাটক, বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস, বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের সোমপ্রকাশ, মহেন্দ্রলাল সরকারের হোমিওপ্যাথি, এই সকলের মধ্যে শিক্ষিত দলের মনে যেমন নবভাব আনিয়া দিতেছিল, তেমনি আর এক কার্য্যের আয়োজন হইয়া নব আকাঙ্ক্ষার উদয় করিয়াছিল। তাহা... নবগোপাল মিত্র মহাশয়ের প্রতিষ্ঠিত 'জাতীয় মেলা' নামক মেলা ও প্রদর্শনীর প্রতিষ্ঠা এবং দেশের সকল বিভাগের ও সকল শ্রেণীর নেতৃবৃন্দের তাহার সহিত যোগ। বঙ্গসমাজের ইতিবৃত্তে ইহা একটি প্রধান ঘটনা; কারণ সেই যে বাঙ্গালির মনে জাতীয় উন্নতির স্পৃহা জাগিয়াছে তাহা আর নিদ্রিত হয় নাই।"[৩]

১. বিপিনবিহারী গুপ্ত, পুরাতন প্রসঙ্গ, দ্বিতীয় পর্য্যায়, পৃ ২০৬
২. সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, আমার বাল্যকথা ও আমার বোম্বাই প্রবাস, পৃ ৩৫
৩. রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গ-সমাজ, ২য় সংস্করণ, পৃ ২৫৭

প্রথম অধিবেশন, ১৮৬৭

জাতীয় মেলার প্রথম অধিবেশন হয় বেলগাছিয়াস্থ ডনকিন সাহেবের উদ্যানে সন ১২৭৩ সালের ৩১শে চৈত্র, অর্থাৎ চৈত্র-সংক্রান্তিতে ১৮৬৭, ১২ই এপ্রিল। প্রথম তিন বৎসর চৈত্র-সংক্রান্তিতে এই মেলা অনুষ্ঠিত হয়, এ কারণ তখন ইহা চৈত্র-মেলা নামে পরিচিত হইয়াছিল। পরবর্ত্তী কালে 'হিন্দু মেলা' নামেই ইহা সমধিক প্রসিদ্ধিলাভ করে। প্রথম বৎসরে কলিকাতার উপকণ্ঠে বেলগাছিয়া উদ্যানে চৈত্র-মেলা স্বল্পাকারে অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। জাতীয় মেলার অন্যতম উৎসাহী কর্ম্মী মনোমোহন বসু বলেন, "জন্মদিনে কেবল অনুষ্ঠাতা ও কতিপয় বান্ধব মাত্র উৎসাহী ছিলেন। সে যেন নিজ বাটী ও পাড়াটী বলিয়া শুভকর্ম্ম সম্পন্ন করা।"[১] এই বৎসর রাজনারায়ণ বসু মহাশয় ছুটিতে নিজ গ্রাম বোড়ালে বাস করিতেছিলেন। জাতীয় মেলায় পাঠের নিমিত্ত বোড়াল-বাসীদের রচিত একটি স্বদেশপ্রেমোদ্দীপক কবিতা সংশোধনান্তর তিনি কর্ত্তৃপক্ষকে পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। এই কবিতাটি তাঁহার আত্ম-চরিতে স্থান পাইয়াছে।

প্রথমবার অনুষ্ঠানের পর অনুষ্ঠাতৃগণ জাতীয় মেলার উদ্দেশ্য ও সাধনোপায় সাধারণের নিকট প্রকাশ করেন। দ্বিতীয় বারের মেলার কার্য্যবিবরণীতে এ সব স্থান পাইয়াছে। জাতীয় মেলার সম্পাদক গণেন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং সহকারী সম্পাদক নবগোপাল মিত্র একযোগে লিখিলেন—

"১৭৮৮ শকের চৈত্র সংক্রান্তিতে যে একটি জাতীয় মেলা হইয়াছিল, স্বজাতীয়দিগের মধ্যে সদ্ভাব স্থাপন করা ও স্বদেশীয় ব্যক্তিগণ দ্বারা স্বদেশের উন্নতি সাধন করাই তাহার উদ্দেশ্য।"

উদ্দেশ্যসাধনোপায় ছয় শ্রেণীতে বিভক্ত হয়। এ সম্বন্ধে তাঁহারা লেখেন—

"১। এই মেলাভুক্ত একটি সাধারণ মণ্ডলী সংস্থাপিত হইবে, তাঁহারা হিন্দুজাতিকে উপরোক্ত লক্ষ্য সকল সংসাধন জন্য একদলে অভিভুক্ত এবং স্বদেশীয় লোকগণ মধ্যে পরস্পরের বিদ্বেষভাব উন্মূলন্ করিয়া উপরোক্ত সাধারণ কার্য্যে নিয়োগ করতঃ এই জাতীয় মেলার গৌরব বৃদ্ধি করিবেন।

২। প্রত্যেক বৎসরে আমাদিগের হিন্দু সমাজের কত দূর উন্নতি হইল, এই বিষয়ের তত্ত্বাবধারণ জন্য চৈত্রসংক্রান্তিতে সাধারণের সমক্ষে একটি সংক্ষিপ্ত বৃত্তান্ত পাঠ করা হইবে।

৩। অস্মদ্দেশীয় যে সকল ব্যক্তি স্বজাতীয় বিদ্যানুশীলনের উন্নতি সাধনে ব্রতী হইয়াছেন, তাঁহাদিগের উৎসাহ বর্দ্ধন করা যাইবে।

৪। প্রতি মেলায় ভিন্ন ভিন্ন স্থানের ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর লোকের পরিশ্রম ও শিল্পজাত দ্রব্য সংগৃহীত হইয়া প্রদর্শিত হইবে।

৫। প্রতি মেলায় স্বদেশীয় সঙ্গীত-নিপুণ ব্যক্তিগণের উৎসাহ বর্দ্ধন করা যাইবে।

৬। যাঁহারা মল্ল-বিদ্যায় সুশিক্ষিত হইয়া খ্যতি লাভ করিয়াছেন, প্রতি মেলায় তাঁহাদিগকে একত্রিত করিয়া উপযুক্ত পারিতোষিক বা সম্মান প্রদান করা যাইবে এবং স্বদেশীয় লোক মধ্যে ব্যায়াম শিক্ষা প্রচলিত করিতে হইবে।"

১। মনোমোহন বসু, বক্তৃতামালা, পৃ ১৫

এই ছয়টি উদ্দেশ্য সাধনের জন্য দেশের গণ্যমান্য ব্যক্তিগণ ছয়টি মণ্ডলীতে বিভক্ত হইয়াছিলেন। তাঁহারা যথাক্রমে :

১। রাজা কমলকৃষ্ণ বাহাদুর, রমানাথ ঠাকুর, দিগম্বর মিত্র, তারিণীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, কাশীশ্বর মিত্র, দুর্গাচরণ লাহা, নীলকমল বন্দ্যোপাধ্যায়, ঈশ্বরচন্দ্র ঘোষাল, মহেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, প্যারীচরণ সরকার, গিরিশচন্দ্র ঘোষ, জয়গোপাল সেন, দেবেন্দ্রনাথ মল্লিক, কৃষ্ণদাস পাল এবং যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর।

২। নীলকমল বন্দ্যোপাধ্যায়, গিরিশচন্দ্র ঘোষ, ভোলানাথ পাল, রাধিকাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় এবং জগচ্চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

৩। মহেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, প্যারীচরণ সরকার, রাজনারায়ণ বসু, দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য, জয়নারায়ণ তর্কপঞ্চানন, ভরতচন্দ্র শিরোমণি, ভবশঙ্কর বিদ্যারত্ন, তারানাথ তর্কবাচস্পতি এবং হরিনারায়ণ তর্কসিদ্ধান্ত।

৪। সুরেন্দ্রকৃষ্ণ দেব, জয়গোপাল সেন, প্রসাদদাস মল্লিক, প্রিয়নাথ ঘোষ, ব্রজনাথ দেব, জয়গোপাল মিত্র, যাদবচন্দ্র মুখোপাধ্যায় এবং সালিকরাম।

৫। কুমার সুরেন্দ্রকৃষ্ণ দেব, অক্ষয়কুমার মজুমদার এবং ব্রজনাথ দেব।

৬। ঈশ্বরচন্দ্র ঘোষাল, দুর্গাদাস কর, গোপাললাল মিত্র, অম্বিকাচরণ গুহ, কালীপ্রসন্ন ঘোষ, ভবানীচরণ গুহ, নীলকমল মুখোপাধ্যায় এবং যজ্ঞেশপ্রকাশ গঙ্গোপাধ্যায় আয়ব্যয় পরীক্ষার ভার গ্রহণ করেন।

হিন্দু মেলার প্রথম অধিবেশনও আশুতোস দেবের বেলগাছিয়া উদ্যানে অনুষ্ঠিত হইয়াছিল, দীর্ঘকাল এই ধারণাই প্রচলিত ছিল, এই গ্রন্থেও সেইরূপ লিখিত হইয়াছে। কিন্তু এই সংবাদ ঠিক নহে। ঐ অংশ মুদ্রিত হইয়া যাইবার পর শ্রীশুভেন্দুশেখর মুখোপাধ্যায় দেশ পত্রিকার ১৩৭৪ সাহিত্য সংখ্যায় 'হিন্দুমেলা ও ভারতচিন্তা' প্রবন্ধে ন্যাশনাল পেপারে প্রকাশিত প্রথম অধিবেশনের বিবরণ দৃষ্টে জানাইয়াছেন যে উক্ত প্রথম অধিবেশন নরসিংহচন্দ্র রায়ের উদ্যানবাটীতে অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। শ্রীপ্রতুলচন্দ্র গুপ্ত অনুগ্রহপূর্বক ন্যাশনাল পেপার হইতে সেই বিবরণটি আমাকে দিয়াছেন, নিম্নে তাহা মুদ্রিত হইল :

The Choitra Shankrantee Mela

...the first assembly of this kind was held on Friday last, the day of Choitra Shankrantee at the garden house of the late Rajah Nursing Chunder Roy, Chitpur...opened with an inaugural address by Baboo Srepatty Mookerjee, Deputy Inspector of Schools, Bengal... He further observed that if the business of the Mela were conducted properly it may be the means of stimulating National works of Industry and Arts, it may be the means of fusing distinct Hindoo Nationalities into one common Hindoo National. He moreover assured the assembly that it was purely a social and neither a religious or political one.

—*The National Paper*, 17 April 1867

দ্বিতীয় অধিবেশন, ১৮৬৮

জাতীয় মেলার কার্য্য প্রকৃতপক্ষে আরম্ভ হয় ইহার দ্বিতীয় অধিবেশন হইতে। আশুতোষ দেবের বেলগাছিয়া উদ্যানে পরবর্ত্তী চৈত্র-সংক্রান্তিতে মেলার দ্বিতীয় অধিবেশন অনুষ্ঠিত হইল। প্রসিদ্ধ পণ্ডিত ভবশঙ্কর বিদ্যারত্ন মেলার উদ্বোধন করিলেন। এই উপলক্ষে রচিত[১] ভারতের প্রথম সিবিলিয়ন সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'মিলে সবে ভারত সন্তান, একতান মনপ্রাণ, গাও ভারতের যশোগান' সঙ্গীতটি গীত হইল। মেলার উদ্দেশ্য সম্পাদক গণেন্দ্রনাথ ঠাকুর সকলকে নিম্নরূপ বুঝাইয়া দিলেন—

"এই মেলার প্রথম উদ্দেশ্য, বৎসরের শেষে হিন্দু জাতিকে একত্রিত করা। এইরূপ একত্র হওয়ার ফল যদ্যপি আপাততঃ কিছুই দৃষ্টিগোচর হইতেছে না, কিন্তু আমাদের পরস্পরের মিলন এবং একত্র হওয়া যে কত আবশ্যক ও তাহা যে আমাদের পক্ষে কত উপকারী তাহা বোধ হয় কাহারও অগোচর নাই। একদিনে কোনো এক সাধারণ স্থানে একত্রে দেখাশুনা হওয়াতে অনেক মহৎকর্ম্ম সাধন, অনেক উৎসাহ বৃদ্ধি ও স্বদেশের অনুরাগ প্রস্ফুটিত হইতে পারে। যত লোকের জনতা হয় ততই ইহা হিন্দু মেলা ও ইহা হিন্দুদিগেরই জনতা এই মনে হইয়া হৃদয় আনন্দিত ও স্বদেশানুরাগ বর্দ্ধিত হইতে থাকে। আমাদের এই মিলন সাধারণ ধর্ম্মকর্ম্মের জন্য নহে, কোন বিষয় সুখের জন্য নহে, কেবল আমোদ-প্রমোদের জন্য নহে, ইহা স্বদেশের জন্য—ইহা ভারত-ভূমির জন্য।

"ইহার আরও একটি মহৎ উদ্দেশ্য আছে, সেই উদ্দেশ্য আত্মনির্ভর। এই আত্মনির্ভর ইংরাজ জাতির একটি প্রধান গুণ। আমরা সেই গুণের অনুকরণে প্রবৃত্ত হইয়াছি। আপনার চেষ্টায় মহৎ কর্ম্মে প্রবৃত্ত হওয়া এবং তাহা সফল করাকেই আত্মনির্ভর কহে। ভারতবর্ষের এই একটি প্রধান অভাব, আমাদের সকল কর্ম্মেই আমরা রাজপুরুষগণের সাহায্য যাচঞা করি, ইহা কি সাধারণ লজ্জার বিষয়? কেন আমরা কি মনুষ্য নহি? মানবজন্ম গ্রহণ করিয়া চিরকাল পরের সাহায্যের উপর নির্ভর করা অপেক্ষা লজ্জার বিষয় আর কি আছে? অতএব যাহাতে এই আত্মনির্ভর ভারতবর্ষে স্থাপিত হয়—ভারতবর্ষে বদ্ধমূল হয়, তাহা এই মেলার দ্বিতীয় উদ্দেশ্য।"

সম্পাদকের উদ্দেশ্য বিবৃতির পরে সহকারী সম্পাদক নবগোপাল মিত্র মহাশয় গত সম্বৎসরের রাজ্য, বাণিজ্য, স্বাস্থ্য, বিদ্যা, সমাজ প্রভৃতি বিভাগে ভারতবাসীদের কতদূর উন্নতি ও অবনতি হইয়াছে তাহা বিবৃত করেন। স্বদেশপ্রেমোদ্দীপক বাংলা ও সংস্কৃতি কবিতা এবং প্রবন্ধ

১. সত্যেন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন—"এই মেলা উপলক্ষে মেজদাদা কতকগুলি জাতীয় সঙ্গীত রচনা করেন আর সেই মেলাই আমার ভারত-সঙ্গীতের জন্মদাতা"—আমার বাল্যকথা ও আমার বোম্বাই প্রবাস, পৃ ৩৬।

মেলাস্থলে পঠিত হইয়াছিল। এ বৎসর যাঁহারা কবিতা পাঠ করেন তাঁহাদের মধ্যে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর, শিবনাথ ভট্টাচার্য্য (পরে, শাস্ত্রী), অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরী, পরবর্ত্তীকালে কবি ও সাহিত্যিক রূপে যশস্বী হন। জাতীয় মেলার দুইটি বিশিষ্ট অঙ্গ স্বদেশীর চারু ও কারু শিল্প ও কৃষিজাত দ্রব্যের প্রদর্শনী এবং স্বদেশীয় ব্যায়াম ও কুস্তি প্রদর্শন। স্বদেশীয়দের দ্বারা স্বদেশজাত দ্রব্যাদির প্রদর্শনী এই মেলাতেই সর্ব্বপ্রথম অনুষ্ঠিত হইতে আরম্ভ হয়। এজন্য ইহার গুরুত্ব সমধিক। দ্বিতীয় অধিবেশনকালে

"মেলা স্থলে একটি দীর্ঘ হোগলার চালা প্রস্তুত হইয়াছিল। এই চালার মধ্যে এতদ্দেশীয় স্ত্রীলোকগণের সূচীনির্ম্মিত শিল্পজ পদার্থসকল প্রদর্শিত হয়। ঐ স্থলে নানা প্রকার আসন, জুতা, থলিয়া, সরপোস প্রভৃতি রমণীয় পদার্থসকল সজ্জিত ছিল। ঐ সমুদায়ের মধ্যে স্ত্রীলোকের কৃত কতকগুলি কাজ অতি চমৎকার ছিল। এই চালার পূর্ব্বদিকের চালায় কতকগুলি অলঙ্কার ও হস্তিদন্তের পুত্তলিকা প্রদর্শিত হয়। উক্ত চালার সম্মুখেই আর এক চালা ছিল। ইহার মধ্যে আলিপুরের জেলের কয়েদিদিগের কৃত কতকগুলি উৎকৃষ্ট তোয়ালে, ঝাড়ন প্রভৃতি প্রদর্শিত হয়। এগুলি দেখিতে যেমন সুন্দর তেমনি শক্ত। এই চালার পূর্ব্বদিকে আর এক চালায় কতকগুলি ফল ও শাক প্রদর্শিত হয়।"

চিত্র বিভাগে পটুয়াদের অঙ্কিত পট ও অন্যান্য শিল্পীদের চিত্র প্রদর্শিত হইয়াছিল—

"বৈঠকখানা বাটীটী পূর্ব্বোক্ত চালা সকলের মধ্যস্থলে অবস্থিত। গৃহপ্রবেশের দ্বারে এতদ্দেশীয় শিল্পিগণকর্ত্তৃক পারিস-কর্দ্দমে নির্ম্মিত অভিষেক বেশধারিণী ইংলেগুশ্বরীর প্রতিমূর্ত্তি সন্নিহিত ছিল। এই প্রতিমূর্ত্তির পার্শ্বে নবদ্বীপের কুমারদিগের দ্বারা নির্ম্মিত কতকগুলি উত্তম পুত্তলিকা প্রদর্শিত হয়। প্রত্যেকের অঙ্গসৌষ্ঠব এবং যেখানকার যে শিরা ও যে উচ্চতা জীব শরীরে বিদ্যমান থাকে তাহা ঐ পুত্তলিকাগুলিতে লক্ষিত হইয়াছিল। প্রাচীন কালের গ্রীক প্রতিমূর্ত্তিগুলিকে আদর্শ করিয়া ঐ সমুদায় নির্ম্মিত হয়। আর এক গৃহে এদেশীয় শিল্পিগণের কৃত কতকগুলি চিত্র ছিল। জয়পুরের প্রতিকৃতি, আলেকজাণ্ডারের সহিত ডেরায়সের পরিবারগণের সাক্ষাৎকার ও আয়ান ঘোষকে দর্শন করিয়া কৃষ্ণের কালীমূর্ত্তি ধারণ; এই পটগুলি এবং কলিকাতার শিল্পবিদ্যালয়ের কতকগুলি ছাত্র প্রভৃতিকে আদর্শ করিয়া যে কতকগুলি চিত্র করিয়াছেন, এ স্থলে তাহাও সংগৃহীত হইয়াছিল। আর এক গৃহে পুরাণ সংক্রান্ত কথকতা হইয়াছিল। ঐ বৈঠকখানার সম্মুখের গৃহে অধ্যাপকদিগের শাস্ত্রীয় আলাপাদি হয়। পূর্ব্বদিগের গৃহে কতকগুলি সব অ্যাসিষ্টাণ্ট সর্জ্জন অনেক পরিশ্রম স্বীকার করিয়া রসায়ন বিদ্যা সংক্রান্ত বিষয় সকল প্রদর্শন করেন।

"বৈঠকখানার দক্ষিণ পূর্ব্ব, দক্ষিণ পশ্চিম ও উত্তর পশ্চিমে তিনটি বাটী আছে। এই তিনটি বাটীতে ঝামাপুকুর, জোড়াসাঁকো ও শ্যামপুকুরের শকের সমবেত বাদ্য বাদিত হইয়াছিল।"

ব্যায়াম-কৌশল প্রদর্শন সম্বন্ধে উল্লিখিত হইয়াছে—

"মেলায় এদেশীয় মল্লদিগের কৌশল প্রদর্শিত হয়। এই মল্লেরা যে সকল কৌশল প্রদর্শন করে, তাহা ভারতবর্ষীয়দিগেরই সৃষ্ট; এই নিমিত্ত আমরা অন্য কাহারও নিকটে ঋণী নহি। প্রথমতঃ লাঠি খেলা, পরে লাঠিতে ভর দিয়া লম্ফ দিয়া পতিত হওয়া; তৎপরে কুস্তি করা হয়। দর্শকগণ

বিশেষতঃ ইউরোপীয়গণ ঢেঁকি ঘুরান দেখিয়া আশ্চর্য্য বোধ করিয়াছিলেন। এক স্কন্ধ হইতে অন্য স্কন্ধে ঢেঁকি লইয়া তাহা ক্রমাগত ঘূর্ণিত করা হয়। কিন্তু পশ্চাল্লিখিত কয়েকটি কৌশল দর্শনে সকলে অধিকতর তৃপ্তিলাভ করেন। একজন মল্ল এক ঢেঁকিতে বস্ত্র বাঁধিয়া তাহা দন্ত দ্বারা ধারণ পূর্ব্বক মস্তক ঘুরাইয়া পশ্চাতে নিক্ষেপ করে। আর একজন শয়ন করিলে প্রথমতঃ তাহার বক্ষে এবং তাহার পৃষ্ঠের উপর চারিখানি ইট রাখা হয়। একজন মল্ল এক ঢেঁকির মোনা লইয়া এক আঘাতে ইটগুলি চূর্ণ করে। আর একজন শবের ন্যায় স্পন্দহীন হইয়া শয়ন করিলে তাহাকে মৃত্তিকার মধ্যে প্রায় দুই মিনিট পর্য্যন্ত সমাহিত রাখা হইয়াছিল।

"ইউরোপীয় প্রণালী অনুসারে কতকগুলি যুবক ব্যায়াম প্রদর্শন করিলেন। তন্মধ্যে একজন এই ব্যায়াম উদ্দেশে একটি কবিতা পাঠ করেন।" তাহার কিয়দংশ এই—

"বিদ্যা শিক্ষা সঙ্গে সঙ্গে শিখিলে ব্যায়াম।
সুস্থ চিত্তে সুস্থ দেহে পাইবে আরাম॥
কেন বঙ্গবাসীগণ এমন দুর্ব্বল।
নীচেদের কায় শ্রম, তাই এমন॥
অন্যসব জাতি শ্রমে, সদাই আদরে।
তাই তারা নানা মতে সুখ ভোগ করে॥

পরে একজন যুবক আশ্বারোহণ পূর্ব্বক বেড়া লঙ্ঘন করিয়া" বিশেষ প্রশংসা লাভ করিয়াছিলেন। "তৎপরে নৌকার বাচ খোলা হয়। পরিশেষে বেলা ৬টার সময় মেলা ভঙ্গ হয়।"

জাতীয় মেলার দ্বিতীয় অধিবেশন হইতে এক একজন প্রধান বক্তা ইহার উদ্দেশ্যের পরিপোষক বক্তৃতা করিতেন। সুপ্রসিদ্ধ কবি ও নাট্যকার মনোমোহন বসু ওজস্বিনী ভাষায় এই অধিবেশনে এক বক্তৃতা করেন। জাতীয়তার ইতিহাসে এই বক্তৃতাটি নানা কারণেই স্মরণীয়। বক্তৃতার প্রথম অনুচ্ছেদেই ভারতবাসীর চরম লক্ষ্য রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতাও যে আমাদের আয়ত্তের মধ্যে তাহাও তিনি আভাসে ব্যক্ত করেন। তিনি বলেন—

"স্থিরচিত্তে বিবেচনা করিলে এই বোধ হয়, আজ আমরা একটি অভিনব আনন্দবাজারে উপস্থিত হইয়াছি। সারল্য আর নির্ম্মৎসরতা আমাদের মূলধন, তদ্বিনিময়ে ঐক্যনামা মহাবীজ ক্রয় করিতে আসিয়াছি। সেই বীজ স্বদেশ ক্ষেত্রে রোপিত হইয়া সমুচিত যত্নবারি এবং উপযুক্ত উৎসাহ তাপ প্রাপ্ত হইলেই একটি মনোহর বৃক্ষ উৎপাদন করিবেক। এত মনোহর হইবে, যে, যখন জাতি-গৌরব রূপ তাহার নব পত্রাবলীর মধ্যে অতি শুভ্র সৌভাগ্য-পুষ্প বিকশিত হইবে, তখন তাহার শোভা ও সৌরভে ভারত ভূমি আমোদিত হইতে থাকিবে। তাহার ফলের নাম করিতে এক্ষণে সাহস হয় না, অপর দেশের লোকেরা তাহাকে "স্বাধীনতা!" নাম দিয়া তাহার অমৃতাস্বাদ ভোগ করিয়া থাকে। আমরা সে ফল কখনো দেখি নাই, কেবল জনশ্রুতিতে তাহার অনুপম গুণগ্রামের কথা মাত্র শ্রবণ করিয়াছি। কিন্তু আমাদিগের অবিচলিত অধ্যবসায় থাকিলে অন্ততঃ 'স্বাবলম্বন'নামা মধুর ফলের আস্বাদনেও বঞ্চিত হইব না! ফলতঃ একতাই সেই মিলন সাধনের একমাত্র উপায় এবং অদ্যকার এই সমাবেশরূপ অনুষ্ঠান যে সেই ঐক্য স্থাপনের অদ্বিতীয় সাধন, তাহাতে আর অণুমাত্র সন্দেহ নাই।"

ভারতবর্ষে মেলার অভাব নাই, তবে এরূপ মেলার আবশ্যকতা কি বিশেষত্বই বা কি? এ সম্বন্ধে বক্তা বলেন—

"বস্তুতঃ চতুর্দ্দিক্‌স্থ অসংখ্য প্রকার মেলার মধ্যে এমন একটি বিশেষ মেলার প্রয়োজন হইতেছে কিনা, যাহা নির্ব্বিবাদে ভারতবর্ষস্থ সমস্ত শ্রেণীস্থ লোকের প্রীতিস্থ হইতে পারে—যেখানে ধর্ম্ম সংক্রান্ত মতভেদ তিরোহিত হইয়া সকলেই সৌভ্রাত্র ও সৌহৃদ্য শৃঙ্খলে আবদ্ধ হইবেন—যেখানে বৈষ্ণব, শাক্ত, শৈব, গাণপত্য, বুদ্ধ, জৈন, নাস্তিক, আস্তিক সকলেই আপনাপন মেলা ভাবিয়া নিঃসন্দিগ্ধ চিত্তে উৎসবের সমভাগী হইতে পারেন—যেখানে অন্যান্য মেলার অনুষ্ঠিত অথবা নব নব প্রকারের ক্রীড়া-কৌতুক, আমোদ-আহ্লাদ, বিদ্যা, সাধ্য, শিল্প, সাহিত্য, কৃষি, ব্যায়াম ইত্যাদি অধিকতর সুশৃঙ্খলা ও সুনিয়মে প্রদর্শিত ও পুরস্কৃত হইতে পারে। যদি এমন মেলার অভাব থাকে—যদি এমন রুচিকর কোনো একটি মহামেলার আবশ্যকতা প্রতিপাদিত হইয়া থাকে, তবে এই 'চৈত্র-মেলা' সেই অভাব দূরীকরণার্থে—সেই প্রয়োজন সাধনার্থেই প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।"

ইতিপূর্বে নানা বিষয়ে শাসক-সম্প্রদায়ের সাহায্য গ্রহণ করা হইয়াছে

"কিন্তু এই চৈত্র মেলা নিরবচ্ছিন্ন স্বজাতীয় অনুষ্ঠান, ইহাতে ইউরোপীয়দিগের নামগন্ধ মাত্র নাই, এবং যে সকল দ্রব্যসামগ্রী প্রদর্শিত হইবে, তাহাও স্বদেশীয় ক্ষেত্র, স্বদেশীয় উদ্যান, স্বদেশীয় ভূগর্ভ, স্বদেশীয় শিল্প, এবং স্বদেশীয় জনগণের হস্ত-সম্ভূত! স্বজাতির উন্নতিসাধন, ঐক্যস্থাপন এবং স্বাবলম্বন অভ্যাসের চেষ্টা করাই এই সমাবেশের একমাত্র পবিত্র উদ্দেশ্য।"

জাতীয় মেলার প্রদর্শনী বিভাগ ভবিষ্যতে কতখানি ব্যাপক হইতে পারে তাহার উল্লেখ করিয়া মনোমোহন বলেন—

"যে শিল্পী, যে কৃষক, যে উদ্যান-পালক, যে যন্ত্রী, যে গায়ক, যে পাইক, যে পলওয়ানকে আজ অনুরোধ করিয়া ডাকিয়া আনিতে হইল, এবং যে সকল দ্রব্যসামগ্রী লোকের বাটী বাটী গিয়া সংগ্রহ করিয়া আনিতে হইল; যখন দেখিবেন সেই সকল লোক ও সেই সমূহ দ্রব্যসম্ভার আপনা হইতেই আসিতেছে—যখন দেখিবেন ঢাকা ও শান্তিপুরের তন্তুবায়গণ, কাশী ও কাশ্মীরের কারুগণ, জয়পুর ও লক্ষ্ণৌয়ের ভাস্করগণ, চণ্ডালগড় ও কুমারটুলির কুমারগণ, পাটনার কৃষকগণ, অথবা সংক্ষেপে বলিতে গেলে উত্তর ও দক্ষিণের—পূর্ব্ব ও পশ্চিমের সম-ব্যবসায়ী, সম-শিল্পী, এবং সমবিদ্য গুণীগণ এই চৈত্র-মেলার রঙ্গ-ভূমিতে আপনা হইতে আসিয়া পরস্পর প্রতিযোগিতা যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছে—যখন দেখিবেন তাহারা এই মেলার প্রদত্ত প্রতিষ্ঠা ও পুরস্কারকে অমূল্য ও অতুল্য গৌরবান্বিত জ্ঞান করিতেছে—যখন দেখিবেন এই মেলাকে স্বজাতীয় গৌরবভূমি বলিয়া সকলের প্রত্যয় জন্মিয়াছে, তখন জানিবেন এই নবরোপিত বৃক্ষের ফল লাভ হইল।"

তৃতীয় অধিবেশন, ১৮৬৯

জাতীয় মেলার তৃতীয় অধিবেশন হয় বেলগাছিয়াস্থ ডনকিন সাহেবের উদ্যানে পর বৎসর চৈত্র-সংক্রান্তিতে। পূর্ব্ববারের কর্ম্মপদ্ধতিই অনুসৃত হইল। এবারেও প্রধান বক্তা ছিলেন মনোমোহন বসু। সভাপতি হইয়াছিলেন সুপ্রসিদ্ধ ঈশ্বরচন্দ্র ঘোষাল মহাশয়। এবারকার প্রদর্শনীটিকে অধিকতর সুষ্ঠু করিবার চেষ্টা হয়। নিম্নলিখিত বিভিন্ন শ্রেণীর কারু ও চারু শিল্প প্রদর্শিত হয়—

শিল্প—(১) স্ত্রীলোকদিগের সূচি নির্ম্মিত পশমের ও পুঁতির কার্য্য, (২) ছাঁচ ও খয়েরের গঠন, (৩) জামা, চাপকান, রুমাল, পেশোয়াজ, উড়নী, সাটী ইত্যাদি, (৪) কুম্ভকারদিগের নির্ম্মিত নানাবিধ ফল, (৫) নদিয়ার বাজার, (৬) নানাপ্রকার পুতুল, (৭) চিত্র, (৮) বারাণসী কাপড়, (৯) চীনদেশীয় নানাপ্রকার রেশমী কাপড়, (১০) ঢাকাই স্বর্ণকারদিগের নানাপ্রকার রূপা ও সোনার গঠন, (১১) নানাবিধ বাদ্যযন্ত্র, (১২) নানাবিধ অস্ত্রশস্ত্র, (১৩) ফোয়ারা, (১৪) ভাস্করীয় প্রতিমূর্ত্তি।

উদ্ভিজ্জাদি—ফল, ফুল, মূল, চারা, শস্য, বীজ; কৃষি ও শিল্পকারক যন্ত্রাদি—লাঙ্গল, চড়কা ও তাঁত।

এতদ্ভিন্ন এই সকল ক্রিয়া প্রদর্শিত হয় :

রাসায়নিক ক্রিয়া, কুস্তী, অশ্বচালন, পাইকের খেলা ও বাঁশবাজী।

শিল্পকর্ম্মের জন্য নিম্নলিখিত মহিলাগণকে 'হিন্দু মেলা' নামাঙ্কিত এক একটি রৌপ্যপদক দেওয়া হয়—

"মৃত বাবু আশুতোষ দেবের পরিবার
শ্রীযুক্ত বাবু প্রিয়নাথ দত্তের পরিবার
শ্রীযুক্ত বাবু রাজেন্দ্র মিত্রের পরিবার
শ্রীযুক্ত বাবু সারদাপ্রসন্ন (প্রসাদ?) গঙ্গোপাধ্যায়ের পরিবার
শ্রীযুক্ত বাবু দীননাথ বসুর পরিবার
শ্রীযুক্ত বাবু নীলকমল মিত্রের পরিবার
শ্রীযুক্ত বাবু মণিমোহন মল্লিকের পরিবার
শ্রীযুক্ত বাবু ক্ষেত্রমোহন চট্টোপাধ্যায়ের পরিবার
শ্রীযুক্ত বাবু হরিবল্লভ বসুর পরিবার
শ্রীযুক্ত বাবু প্রসন্নকুমার মিত্রের পরিবার
শ্রীমতী সতী দেবী
কোন্নগর বালিকা বিদ্যালয়।"

এবারেও সাহিত্য-বিভাগে কবিতা ও প্রবন্ধ পঠিত হয়। রজনীকান্ত গুপ্ত এ বৎসর প্রবন্ধ পাঠ করেন। এই অধিবেশনে কলিকাতার শ্যামবাজার, শ্যামপুকুর ও বাহির সিমুলিয়া ব্যায়াম-

বিদ্যালয় হইতে ব্যায়ামকুশলীরা কৃতিত্বের পুরস্কারস্বরূপ হিন্দু মেলা নামাঙ্কিত পদক লাভ করিয়াছিলেন।

এ বৎসরও প্রধান বক্তা নানা বিষয়ে উপদেশ প্রদান করেন। প্রদর্শয়িতব্য দ্রব্যাদি সম্বন্ধে তিনি বলেন—

"মেলাস্থলে প্রদর্শয়িতব্য দ্রব্য সম্বন্ধে বক্তব্য এই—যখন জাতিসাধারণের উন্নতি প্রার্থনীয়, তখন স্বজাতীয় শিল্পীগণের হস্তসম্ভূত ও যন্ত্রসম্ভূত দ্রব্যাদি প্রদর্শন করাই সর্ব্বাগ্রে উচিত। আমাদের রমণীগণ বিলাতী আদর্শানুবর্ত্তিনী হইয়া যে সকল সূচিকর্ম্ম ও সামান্য সামান্য কারুকার্য্য প্রস্তুত করিতেছেন এবং যে সকল ইউরোপীয় প্রতিরূপ দেখিয়া চিত্র করিতে শিখিতেছেন, তাহার প্রদর্শন দ্বারা সম্যক্ ফল লাভের সম্ভাবনা নাই। ব্যবহার পক্ষে সেই সকল শিল্পকর্ম্মের উপযোগিতা অতি অল্প—না সংসারের কাজে লাগে, না সমাজের উপকারে আইসে...যাহাদিগের পূর্ব্ব-সমাজ ও পূর্ব্ব-সভ্যতার অনিবার্য্য পরাক্রম অদ্যাপি দেদীপ্যমান আছে, তাহাদের মধ্যে বিপরীত ভাবাপন্ন অপর দেশীয় সভ্যতার প্রচলন শুভও নয়, সুসাধ্যও নয়, সুসিদ্ধ হইবারও নয়। বরং পূর্ব্বকার সেই সকল শিল্পাদির সংশোধন ও উন্নতি করিবার চেষ্টা করা উচিত। এবং যদি বিদেশীয় এমন কোনো কারুকার্য্য থাকে, যাহা আমাদের সংসারের পক্ষে বিশেষ উপযোগী এবং সুষমা ও রুচিবর্দ্ধক, তবে তাবন্মাত্রকেই গ্রহণ করা যাইতে পারে। শুধু স্ত্রী-শিল্প কেন? সাধারণ শিল্প সম্বন্ধেও এই কথা খাটিতে পারে। ফলতঃ সকল বিষয়েই এই সিদ্ধান্তটি স্মরণ রাখিতে হইবে, যে, ইউরোপীয়দের স্বাবলম্বন ও উদ্যোগটি আমাদের অনুকরণীয় বটে, কিন্তু কার্য্যসাধন প্রণালী ও ঘর সংসারের রীতি নীতি সম্যক্ গৃহীতব্য নহে। এই মীমাংসাকে সম্মুখে রাখিয়া এই মেলার প্রদর্শন-গৃহ সজ্জিত করা উচিত। বিশেষতঃ যখন স্বদেশীয় লোক ও স্বদেশীয় উদ্যোগ দ্বারা স্বদেশের শ্রীবৃদ্ধি সাধনোদ্দেশ্যেই ইহা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, তখন অগ্রে স্বদেশীয় শিল্প-বিদ্যার সংস্কার, উত্থান ও নবযৌবন সম্পন্ন করিবার চেষ্টা করাই অত্যাবশ্যক হইতেছে।"

জাতীয় মেলার মূল উদ্দেশ্য সাধারণের মধ্যে স্বাজাত্যবোধ ও স্বজাতি ধর্ম্মের উন্মেষ সাধন। এ সম্বন্ধে মনোমোহন বলেন—

"সামাজিক উন্নতি বলাতে সমাজের নিয়মাদি পরিবর্ত্তন অথবা নূতন প্রথা প্রচলন দ্বারা সমাজের উন্নতি সাধন করা এ মেলার উদ্দেশ্য নহে; সাধ্যায়ত্তও নহে। সমাজবন্ধন দৃঢ় করা এবং সামাজিকতার নষ্টোদ্ধার করাই সার অভিপ্রায়।...সে সামাজিকতার অন্য নাম জাতিধর্ম্ম। সেই স্বজাতিধর্ম্ম আমাদিগের অনৈক্যতা কারাগারে পরবশ্যতা শৃঙ্খলে আবদ্ধ আছে, তাহাকে মুক্ত করা সর্ব্বপ্রযত্নে বিধেয়।...স্বজাতীয় সকল শ্রেণীস্থ লোকের একত্র অধিবেশন, পরস্পর সৎসম্ভাষণ, পরস্পরের মধ্যে পরস্পরের মনোগত ভাব বিনিময়, গত সম্বৎসর মধ্যে সমাজের কি বা উন্নতি আর কি বা অনুন্নতি হইয়াছে তদালোচনা পূর্ব্বক উন্নতিকে উৎসাহ দেওয়া আর অনুন্নতিকে নিরুৎসাহ করা এবং স্বজাতীয়ের প্রতি স্বজাতীয়ের অনুরাগ বর্দ্ধন ও স্বজাতীয় শিল্প সাহিত্যাদির প্রতি সমুচিত আস্থা জন্মাইয়া দেওয়া যখন মেলার কার্য্য হইল, তখন এই মেলা যে সামাজিকতা উদ্ধারের যোগ্য এবং স্বাবলম্বনরূপ অমূল্যনিধির আকরস্থল হইবে তাহাতে অণুমাত্র সন্দেহ নাই।"

বক্তৃতার উপসংহারে মনোমোহন গুণী, মানী, বিদ্বান্, বুদ্ধিমান্, কবি, সাহিত্যিক, বক্তা, সঙ্গীতজ্ঞ, উদ্ভিদবিদ্, উদ্যানতত্ত্ববিশারদ, বৈজ্ঞানিক, শিল্পী প্রভৃতি প্রত্যেককেই নিজ নিজ কার্য্যদ্বারা জাতীয় মেলার আয়োজন ও উদ্দেশ্য সার্থক করিবার জন্য যথাসাধ্য সাহায্য করিতে আহ্বান করিলেন।

এই অধিবেশনের বিবরণ ২রা বৈশাখ ১২৭৬ সালের 'সংবাদ প্রভাকরে' একটু বিশদভাবে প্রদত্ত হইয়াছে। মেলার উৎকর্ষ সাধনের নিমিত্ত পত্রিকাখানি বিবরণ প্রদানের সঙ্গে সঙ্গে কয়েকটি প্রস্তাবও পেশ করেন। এই সংখ্যাখানি খণ্ডিত, এজন্য সকল কথার পাঠোদ্ধার করা সম্ভব হয় নাই।

"গত রবিবার চৈত্র সংক্রান্তি উপলক্ষে মৃত বাবু আশুতোষ দেবের বেলগাছিয়ার উদ্যানে তৃতীয় বার্ষিক চৈত্র মেলা সমারোহ পূর্ব্বক নির্ব্বাহিত হইয়াছে। কলিকাতা ও উপনগরের প্রায় সমস্ত প্রধান লোক প্রদর্শনস্থলে উপস্থিত হইয়াছিলেন। আপামর সাধারণ প্রায় সাত সহস্র দর্শকের সমাগম হইয়াছিল। প্রথমে প্রদর্শন-সভার প্রশ্নমতে যাঁহারা যে কয়েকটি প্রবন্ধ ও কবিতা লিখিয়াছিলেন, তাঁহাদিগকে পুরস্কার প্রদত্ত হয়। তাহার পর গীত বাদ্য, রাসায়নিক ক্রীড়া, ব্যায়াম ক্রীড়া ও রায়বাঁশ প্রভৃতি নানাবিধ ক্রীড়া হইয়াছিল। সকল গুলিতেই দর্শক ও শ্রোতৃবৃন্দের তৃপ্তি সাধিত হইয়াছে। সংস্কৃত বেণীসংহার নাটকের অভিনয় হইবার কথা ছিল কিন্তু ঘটনাক্রমে তাহা...প্রাপ্ত হয় নাই। সূত্রধারের প্রবেশের অব্যবহিত পরেই দর্শকগণের মধ্যে অপরিহরণীয়...গ হওয়াতে অভিনয় বন্ধ হইয়া যায়, বস্তুতঃ সেরূপ ঘটনা না হইলে কোনক্রমে সুচারুরূপে হইতে পারিত। কারণ যে স্থানটিতে রঙ্গ...নীত করা হইয়াছিল, সেটি...তাদৃশ স্থলে একে ত সাধারণ অভিনয় হইতে পারে না, তাহাতে মেলাস্থল, ছয় সাত সহস্র লোকের সমাগম,—একটি নূতন কাণ্ড হইতেছে দেখিলে সকলেই সেদিকে ধাবিত হইতেন, (প্রারম্ভকালে তাহা হইয়াও ছিল) তাদৃশ জনতার মধ্যে নাটকের অভিনয় কখনই হইবার সম্ভাবনা নাই। প্রকাশ্য মেলায় তাহার কল্পনা করাই অপরামর্শ হইয়াছিল।

"মুখ্য কল্প শিল্প ও উদ্ভিজ্জ প্রদর্শন। তদ্বিষয়ে কমিটি অনেকাংশে কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন। এদেশীয়া কুলকন্যাগণের কারুকার্য্য দর্শন করিয়া আমরা সবিশেষ আহ্লাদিত হইয়াছি। কৌতূহলাক্রান্ত চিত্তে এক গৃহ হইতে গৃহান্তরে গমন করিয়াছিলাম প্রত্যেক গৃহেই নূতনত্ব ও চমৎকারিত্ব লক্ষিত হইয়াছে। বাবু কাশীশ্বর মিত্র, বাবু ব্রজেন্দ্রনাথ দেব, বাবু দেবেন্দ্র মল্লিক এবং বাবু রাজেন্দ্রলাল মিত্র বিবিধ চমৎকার বস্তু সংগ্রহ করিয়াছিলেন। কৃষ্ণপ্রস্তরের প্রতিমা, শ্বেত প্রস্তরের মন্দির, মস্জিদ, গৃহ, পশু, পক্ষী, সর্প ও পুত্তলিকা, এবং বৃষ কুকুর শিশু প্রভৃতিও অতি উত্তম হইয়াছিল। বাবু আশুতোষ দেবের বাটীর স্ত্রীগণ, সিন্দুরিয়া পটির মল্লিক পরিবার, বাবু প্রিয়নাথ দত্তের স্ত্রী, বাবু দ্বারকানাথ দেবের স্ত্রী এবং অন্যান্য গুণবতী নারীগণের শিল্পনৈপুণ্যের...সন্তোষকর প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। অনেকেই জরীর কাজ, কারপেটের কাজ, জড়াও কাজ, কারপেটের...ধান্যের অলঙ্কার, তণ্ডুলের হার...বস্ত্রের মাল্য, জুতা, আসন, বর্ণম...এবং অন্যান্য বস্তু বিশেষ গুণপনার সহিত সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম অণুতে সজ্জিত করিয়া আনিয়াছিলেন। মৃত্তিকা ও ক্ষীরের অ...নিচু, গোলাপজাম, মাদার এবং...দীয় ফল অতি সুন্দর হইয়াছিল। তখন সমস্ত দর্শন করিয়া কেহই কৃত্রিম বোধ করিতে পারে নাই। দিল্লীর একটি স্ত্রীলোকের প্রেরিত সাঁচ্চা কাজ এবং বস্ত্রাদি অতি মনোহর হইয়াছিল।

শোভাবাজারের রাজবাটী এবং অন্যান্য বনিয়াদী বড় মানুষের বাড়ী হইতে কতকগুলি প্রাচীন মূল্যবান বস্তু প্রেরিত হয়। সেগুলি যেমন সুদৃশ্য, তদনুরূপ চমৎকার। বাদ্যযন্ত্রের মধ্যে ঝিনুকের সেতার, হস্তীদন্তের সেতার, ময়ূরযুক্ত এসরাজ এবং উত্তমোত্তম তানপুরা, বেহালা প্রভৃতি সাধারণের চিত্ত আকর্ষণ করিয়াছে। হস্তিদন্তের নবরত্ন, চৌকী এবং বাক্স, চিরুণী প্রভৃতি পরম সুন্দর। উত্তমোত্তম পক্ষী এবং অস্ত্রশস্ত্রও অনেক আসিয়াছিল। উলু দিয়া ছাওয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দোকান ঘরগুলি অতি কৌতুকাবহ,—চালে কাক, কপোত ও বানর বসিয়া আছে। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দোকানীরা তুলাদণ্ডে তৌল করিতেছে, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ক্রেতাগণ সম্মুখে দাঁড়াইয়া দর করিতেছে, তাহা দেখিয়া আহ্লাদে হাস্য করিতে হয়। বিবিধ ফল, পুষ্প এবং উদ্ভিজ্জগুলিও নেত্রতৃপ্তিকর হইয়াছিল। শ্রীযুক্ত রায় রাজেন্দ্র মল্লিক বাহাদুর স্বহস্তে প্রদর্শকদিগকে পারিতোষিক দান করিয়াছেন। কতকগুলি সৌখীন বস্তু মেলাস্থলেই বিক্রীত হইয়াছে।

"দেশহিতৈষী মহোদয়েরা জাতিসাধারণ উন্নতি বর্দ্ধনার্থ যে শুভ অনুষ্ঠান করিয়াছেন, তদর্থ তাহাদিগকে ধন্যবাদ প্রদান করিয়া আমরা এতৎসম্বন্ধে কতিপয় প্রস্তাব করিতে বাধ্য হইতেছি...শুক্রবার আমরা বলিয়া... রণ গ্রীষ্মকালে মেলার অনুষ্ঠান না করিয়া মাঘ মাসে...গ্রীষ্মকালের প্রখর রৌদ্রে...যাতে কেবল দর্শকবর্গের অ...ষ্ট এবং সোডাওয়াটর, লিমোনেড, বরফ ও ডাব বিক্রেতাগণের ত্রিগুণ ভিন্ন আর কিছু বিশেষ উপকার দৃষ্ট হয় না। গত মেলায় ৫/৬ জনের সর্দ্দীগর্ম্মী হইয়াছিল। অতএব মাঘ মাসে হইলে...সেই সুবিধা হয়। দ্বিতীয়তঃ কেবল দর্শনগৃহগুলি স্বতন্ত্র রাখিয়া একটি দীর্ঘ প্রশস্ত তাঁবুর মধ্যে সাধারণ কার্য্যালয়...ষ্ট করা উচিত। সেই স্থানেই গীত প্রস্তাব পাঠ বক্তৃতা রাসায়নিক শিক্ষা ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় কার্য্য করিলে ভাল হয়। একটি স্থানে থ...সকলে যদি সকল কার্য্য দেখিতে শুনিতে পান, তাহা হইলে স্থানে স্থানে ছুটাছুটি করিতে হয় না। বিশেষতঃ উপযুক্ত বিরামস্থল না থাকায় পুনঃ পুনঃ এখান ওখান করিতে অতিশয় ক্লেশ হয়। অধিক লোকের সমাবেশোপযুক্ত একটি তাঁবুতে গ্যালারি করাই পরামর্শ সিদ্ধ। তৃতীয়তঃ উদ্যান মধ্যস্থ মেলাস্থল পর্য্যন্ত শকটের গমনাগমন বন্ধ করা উচিত। অধিক জনতা মধ্যে গাড়ীঘোড়ার প্রবেশ অতিশয় শঙ্কার বিষয়। তাহাতে হঠাৎ দুর্ঘটনা হইতে পারে। গত মেলায় এক ব্যক্তি একখানি শকটতলে পতিত হইয়া আহত হইয়াছে। রাজা কমলকৃষ্ণ বাহাদুর, বাবু রমানাথ ঠাকুর ও বাবু যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর প্রভৃতি বহুদর্শী বিজ্ঞ মহোদয়েরা যে কার্য্যের অধ্যক্ষ, সে কার্য্য যে অবশ্যই ক্রমে ক্রমে বিশৃঙ্খলা বিহীন হইয়া বিশুদ্ধতা প্রাপ্ত হইবে, তদ্বিষয়ে আমাদিগের সম্পূর্ণ ভরসা আছে।"

চতুর্থ অধিবেশন, ১৮৭০

চতুর্থ অধিবেশন হইতে জাতীয় মেলার অনুষ্ঠান সম্পর্কে কিছু পরিবর্ত্তন সাধিত হয়। চৈত্র-সংক্রান্তির পরিবর্ত্তে—এই বৎসর হইতে সাধারণতঃ মাঘ-সংক্রান্তি ও পরবর্ত্তী দিবসে মেলা হইতে থাকে।[১] এই বৎসর হইতে মেলার কোন মুদ্রিত কার্য্য বিবরণ পাই নাই। সমসাময়িক সংবাদপত্রে যতটুকু বিবরণ বাহির হয় তাহাই বর্ত্তমানে একমাত্র সম্বল। মেলার চতুর্থ অধিবেশনের একটি সংক্ষিপ্ত অথচ পূর্ণাঙ্গ বিবরণ 'সমাচার চন্দ্রিকা'য় ২১ শে ফেব্রুয়ারি ১৮৭০ তারিখে এইরূপ প্রকাশিত হয়—

"হিন্দু মেলা। বিগত শনিবার (১২ই ও ১৩ই ফেব্রুয়ারি) মৃত বাবু আশুতোষ দেবের বেলগেছিয়াস্থ প্রশস্ত উদ্যানে মহাসমারোহে হিন্দু মেলা নির্ব্বাহিত হইয়া গিয়াছে। মেলাস্থলে উক্ত দুই দিবসই অসংখ্য ইংরাজ, বাঙ্গালী হিন্দুস্থানী, ও মুসলমান প্রভৃতি নানা জাতীয় লোক একত্রিত হইয়াছিল। তথায় এতদ্দেশীয় নানাবিধ দ্রব্যজাত ও এতদ্দেশীয় স্ত্রীপুরুষগণের কৃত শিল্পাদি প্রদর্শিত হইয়াছিল। কৃষিপ্রদর্শন এবং নানাবিধ বৃক্ষলতাদির পরিপাট্য প্রদর্শন হয়, যে সকল দ্রব্যাদির প্রদর্শন হয় তাহা অতি চমৎকার, সকলে সেই সকল দেখিয়া একেবারে মোহিত হইয়াছেন। আমরাও এতদ্দেশীয়দিগের প্রাচীন কালের বাদ্যযন্ত্রাদি এবং পূর্ব্বকালে এতদ্দেশীয়দিগের সংগীত ও শিল্প শাস্ত্রাদির যেরূপ উন্নতি ছিল, তাহা দর্শন করিয়া বিস্মিত ও বর্ত্তমান সময়ের সহিত তাহার সাদৃশ্য সমালোচন করতঃ দুঃখিত হইয়াছি। মেলার কার্য্যবিবরণ পাঠ, এতদ্দেশীয়দিগের উত্তেজক সংগীতাবলি, ভীষ্মদেবের জীবনচরিত ঘটিত পুরস্কৃত প্রবন্ধ পাঠ, হিন্দুস্থানী বক্তৃতা প্রভৃতি যে সকল সভার কার্য্য দেখা গেল তাহাতে বোধ হয় এই সভা দ্বারা ভারতবর্ষের বিশেষ উপকার সাধন হইবে। মেলাস্থলে, ব্যায়াম, মল্লযুদ্ধ, সন্তরণ, নৌকার বাচ্, অশ্বচালন প্রভৃতি বিষয়ে অপূর্ব্ব কৌশল সকল প্রদর্শিত হইয়াছিল। এতদ্ভিন্ন আমোদজনক নানা প্রকার সঙ্গীত ও অঙ্গভঙ্গী, সাধারণের হাস্যরসোদ্দীপক হইয়াছিল। একদল ঐকতান বাদক স্বীয় নৈপুণ্যও প্রকাশ করিয়াছিলেন। যাহা হউক, আমরা যেরূপ দেখিলাম তাহাতে এই মেলার কোন অংশই নিন্দনীয় নহে। অতএব সর্ব্বসাধারণেরই এ বিষয়ে উৎসাহ প্রকাশ করা কর্ত্তব্য। অবশেষে আমাদের বক্তব্য এই—এই মেলার প্রারম্ভে ইহার

১। 'সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয়' (১৬ই ফেব্রুয়ারি ১৮৭০) পাঠে জানা যায় যে, ১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দে গবর্ণমেন্ট চড়কপূজায় পিঠ ফোঁড়া, বাণ ফোঁড়া প্রভৃতি শারীরিক কষ্টদায়ক প্রথা সকলি তুলিয়া দিলে, এই সময় হইতে তদ্বিনিময়ে চৈত্র-মেলার সূত্রপাত হয়। এই পত্রিকা লেখেন—

"কলিকাতার সুসভ্য যুবকবৃন্দ গাজনপর্ব্বের বিনিময়ে সেই বৎসর অর্থাৎ ১৮৬৭ খ্রীঃ হইতে চৈত্রমেলা বাহির করিয়াছিলেন,...

"যখন চড়কপর্ব্বের বিনিময়ে চৈত্রমেলার সৃষ্টি হইয়াছে, তখন এ বৎসর একেবারে তাহার নাম ও দিন পরিবর্ত্তন করিয়া ফেলা কোনক্রমেই যুক্তিসঙ্গত হয় নাই। লোকের কষ্ট হয় বলিয়া শাস্ত্রসঙ্গত পর্ব্বদিন পরিবর্ত্তন করিতে পারা যায় না।"

নাম চৈত্র মেলা রাখা হয়। কিন্তু সাধারণে চৈত্রমাসে গ্রীষ্মের প্রাদুর্ভাব নিবন্ধন সময় পরিবর্ত্তনের অনুরোধ করাতে ইহার নাম পরিবর্ত্তন করিয়া হিন্দু মেলা নাম দিয়াছেন। কিন্তু আমরা দেখিলাম এবারেও দুই জনের 'সর্দ্দীগর্ম্মী' হইয়াছিল। বিশেষ এ সময়েও রৌদ্রের প্রাদুর্ভাব বড় কম নহে। অতএব যখন চৈত্র মেলার নাম পরিবর্ত্তন করা হইয়াছে, তখন আরও একমাস পূর্ব্বে অর্থাৎ মাঘ মাসে হইলে আর কোন অসুবিধাই থাকে না।"

চতুর্থ অধিবেশন সম্পর্কে ২৪ ফেব্রুয়ারি ১৮৭০ দিবসীয় 'অমৃতবাজার পত্রিকা' এইরূপ লেখেন—

"জাতীয় মেলা। সমাজের বর্ত্তমান অবস্থা ইহার পরিণাম নহে। ইহা সহস্র ২ বার বিয়োজিত, গঠিত, পরিবর্ত্তিত হইলে, যদি কস্মিনকালে ইহা চরম অবস্থা প্রাপ্ত হয়। সুতরাং ইহা যত আলেচিত বিলোচিত হয়, তত মঙ্গল এবং এই নিমিত্ত যেখানে যখন যে কোন রাজ্যে বিপ্লব উপস্থিত হইয়াছে, সেখানেই প্রায় শুভকর ফল দেখা গিয়াছে।

"আমাদের সমাজ অনেক অস্বাভাবিক ও বিজাতীয় শাসন সহ্য করিয়াছে এবং তাহাতে ইহাকে একরূপ নির্জীব ও নিস্তেজ করিয়া তুলিয়াছে। একটু নাড়াচাড়া না করিলে আবার উহার চৈতন্য জীবন্ত হওয়ার সম্ভব নাই...।

"জাতীয় মেলাটি এইরূপে আমাদের সমাজকে কতক পরিমাণে উন্নতির অভিমুখ লইতেছে, কিন্তু ইহার উদ্দেশ্যও মহৎ, সুতরাং ইহাতে যত কৃতকার্য্য হওয়া যাইবে আমরা তত বিশেষ উপকৃত হইব।

"এ বৎসর চৈত্র মাসে না হইয়া ফাল্গুন মাসে হওয়ায় মেলায় উপস্থিত সকলে গ্রীষ্ম কর্ত্তৃক তত কষ্ট সহ্য করেন নাই। পূর্ব্ব বৎসর অপেক্ষাও এবার আয়োজনের কতক উন্নতি লক্ষিত হইয়াছে।...

"মেলাতে এই কয়েকটি বিষয়ের প্রদর্শনী হয়। কথকতা, রাসায়নিক প্রদর্শন, লিখিত বক্তৃতা পাঠ, গান, কৃত্রিম ফল, ফুল, কৃষি উৎপন্ন দ্রব্য ও কৃষি উপযোগী যন্ত্রের প্রদর্শন, বাংলা পুস্তক, তদ্ভিন্ন ফল, ফুল, চারুকার্য্য এবং শেষ দিন কুস্তি লাঠিখেলা, নৌকার বাজী প্রভৃতি হয়।"

দ্বিজেন্দ্রনাথ যেমন মেলায় স্বদেশীয় চিত্র প্রদর্শনের অধিকতর পক্ষপাতী ছিলেন, 'অমৃতবাজার পত্রিকা' তেমনি ইহাকে স্বদেশীয়দের বলবীর্য্যের প্রকাশক্ষেত্র করিতে চাহিয়াছিলেন। মেলায় প্রদর্শিত বিষয়াদির সমালোচনা প্রসঙ্গে পত্রিকা লেখেন—

"উপরের তালিকাটি দেখিলেই সহসা বোধ হয় এটি ক্রমে ইংরাজ মেমদিগের ফ্যান্সি ফিয়ারের ন্যায় একটি আমোদের স্থান হইয়া উঠিয়াছে।"

মেলা সম্পর্কে পত্রিকার পরামর্শ প্রণিধানযোগ্য—

"আমাদের দেশীয়গণের বুদ্ধির উৎকর্ষ অনেক হইতেছে। এ সঙ্গে শারীরিক বলবীর্য্যের, ব্যায়াম ও শস্ত্র শিক্ষা প্রভৃতির নিতান্ত অভাব এবং এই অভাবের নিমিত্ত আমাদের এত হীনতা। যদি কেহ দেশের মঙ্গল চান, তবে যাহাতে এরূপ হয় সেইরূপ একটি উদ্যোগ করুন। আমরা বোধ করি কৃষ্ণকামিনীর চারু কার্য্যের পারিপাট্যতার কথা শুনা অপেক্ষা অনেকে 'মেলায় ঘোড় দৌড়ে দুজন বিকলাঙ্গ হইয়াছে, লাঠি খেলায় একজনের মাথা ভাঙ্গিয়াছে, বন্দুক ছুড়াতে একজন মরিয়াছে' শুনিয়া অসংখ্য গুণে সন্তুষ্ট হইতেন।"

পঞ্চম অধিবেশন, ১৮৭১

ইহার পর মেলার পঞ্চম অধিবেশনের উদ্যোগ আয়োজন হয়। সম্পাদক দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও দেবেন্দ্রনাথ মল্লিক এবং সহকারী সম্পাদক নবগোপাল মিত্রের স্বাক্ষর বিজ্ঞপ্তি যথারীতি প্রচারিত হইল। নূতন গ্রন্থ, উত্তম শিল্প, কৃষিদ্রব্য, বাজার, দোকানদার, গীতবাদ্য, খেলা, নিলাম প্রভৃতি বিভিন্ন বিভাগের বিষয় নির্ব্বাচনের ভার বিভিন্ন ব্যক্তি বা মণ্ডলীর উপর অর্পিত হইল। বিজ্ঞাপনটির 'নূতন গ্রন্থ' অনুচ্ছেদে লিখিত হইয়াছিল—

"যাঁহারা সংস্কৃত বা বাঙ্গালা ভাষায় কোন প্রকার উত্তম গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন তাঁহারা সেই সকল গ্রন্থ মেলার অন্ততঃ ১৫ দিন পূর্ব্বে ন্যাশনেল প্রেসে নিম্ন স্বাক্ষরকারীদিগের নিকট পাঠাইয়া দিলে যদি তৎসমুদয় মেলার অধ্যক্ষ সভার বিবেচনায় নূতন ভাবাত্মক ও দেশের যথার্থ হিতজনক বলিয়া বোধ হয়, তাহা হইলে তাহাদিগকে মেলার সময় বিশেষ সম্মানসূচক চিহ্ন ও সাধ্যমতে অন্য প্রকার সাহায্য প্রদত্ত হইবে, যাঁহারা উক্ত প্রকারের কোন গ্রন্থ লিখিয়া প্রস্তুত করিয়াছেন কিন্তু অর্থাভাবে মুদ্রাঙ্কন করিয়া প্রকাশ করিতে পারিতেছেন না, তাঁহাদিগের পাণ্ডুলিপি যদি উক্ত সভার মনঃপূত হয় তবে তাঁহাদিগকে মুদ্রাঙ্কনের নিমিত্ত সাধ্যমতে অর্থসাহায্য প্রদত্ত হইবে।"

'অমৃতবাজার পত্রিকা' (২০ শে জানুয়ারি, ১৮৭১) বিজ্ঞাপনটি প্রকাশ করিয়া লিখিলেন—

"অন্য স্তম্ভে পাঠক চৈত্র মেলা, এখন মাঘ মেলা, সম্বন্ধে একটি বিজ্ঞাপন দেখিবেন। আমরা এই বিজ্ঞাপনটির নিমিত্ত তিন স্তম্ভ পূর্ণ করিয়াছি, ইহাতে পাঠক বুঝিবেন যে এ বিষয়টিকে আমরা কত গুরুতর মনে করি। এ মেলাটি শুধু কলিকাতাবাসীদিগের নিমিত্ত নহে, সমস্ত বাঙ্গালার জন্যেই। আমরা ভরসা করি দূর দেশ হইতে ভদ্রলোক মেলা দেখিতে যাইবেন, যথাসাধ্য সাহায্য করিবেন। মেলার কর্ত্তৃপক্ষীয়দিগকে আমরা আর বৎসর যাহা বলিয়াছিলাম এ বৎসর সে অনুরোধ করি। তাঁহারা যেন মানসিক উন্নতিকে আনুষঙ্গিক করিয়া শারীরিক উন্নতিকে প্রধান সংকল্প করেন।"

এ বৎসর জাতীয় মেলা অনুষ্ঠিত হয় ৩০ শে মাঘ, ১লা ও ২রা ফাল্গুন (১১, ১২, ১৩ই ফেব্রুয়ারি) কলিকাতা হইতে তিন ক্রোশ দূরে হীরালাল শীলের বাগানে। 'সুলভ সমাচার' (২১ ফেব্রুয়ারি, ১৮৭১) মেলার এই অধিবেশন সম্পর্কে লিখিয়াছেন—

"এ মেলা এ বৎসর নৈনানে হীরালাল শীলের বাগানে গত ৩০ শে মাঘ শনিবার, এবং রবিবার ও সোমবার এই তিন দিন হইয়াছিল। কলিকাতার অনেক বড় বড় ভদ্রলোক এবং ইংরেজ ও অনেক সামান্য লোকেরাও মেলাটি দেখিতে গিয়াছিলেন। আমরাও একদিন ইহা দেখিতে গিয়াছিলাম, আমাদের মনে তাহা কিরূপ লাগিয়াছে পাঠকগণকে তাহা জানাইতে ইচ্ছা করি।

"দেশের যাহা কিছু ভাল সেইগুলি সব একস্থানে একত্র করিয়া দেখাইবার জন্য হিন্দু মেলা হইয়াছে, ইহাতে দেশীয় লোকেরা, যাঁহারা দেখিবেন তাঁহাদের মনে আহ্লাদ হইবে যে লোক

তাঁহাদের জিনিষ ও ব্যাপার সকল দেখিয়া ভাল বলিতেছেন। এ সকল মেলার দস্তুর এই যে ভাল ভাল জিনিষগুলি আবার লোকে পয়সা দিয়া ক্রয় করিয়া লইয়া যায়, তাহাতে লাভের উপায়ও বিলক্ষণ হয়।...

"হিন্দু মেলাতে আমাদের দেশের স্ত্রীলোকদের তয়েরী কার্পেটের অনেকগুলি ভাল ভাল কাজ সংগ্রহ করা হইয়াছিল। তারা দেখিয়া আমরা বিশেষ সন্তুষ্ট হইয়াছি। অনেকগুলি একেলে ধরণের চিত্র করা ভাল ভাল ছবি জড় করা হইয়াছিল। মালতীমাধব সংক্রান্ত ছবিখানি মন্দ নহে। তানপুরা সেতার, এসরাজ, বীণ প্রভৃতি বড় বড় এদেশের তারের যন্ত্রগুলি এত মস্ত যে দেখিলে "বাপ" করিয়া উঠিতে হয়। কাপড়ের পাড় সকলে কেমন সব গান লিখা! রকম রকম চাল, রকম রকম ডাল প্রভৃতি অনেক প্রকার শস্য, এবং কলম করা নানা প্রকার ফল ফুলের গাছও মন্দ সংগ্রহ হয় নাই। কমলালেবুর কলমে দুই চারিটি করিয়া কমলালেবু দেখিতে কেমন সুন্দর। আমাদের বহুকালের বৃদ্ধ মাতামহী চরকা সমস্ত দিন ঘেনর ঘেনর করিয়া চালাইলেও তাহার নিকট হইতে চার আনার সূতা পাওয়া মুস্কিল, কিন্তু একটি ভদ্রলোক নূতন রকমের একটি সূতার কল প্রস্তুত করিয়া দেখাইয়াছেন, তাহাতে তিন জায়গায় চাকা ঘুরিয়া সূতা হইতেছে এবং তাহা আপনা আপনি জড়াইয়া যাইতেছে। বার বার হাত উঁচুনীচু করিয়া একবার সূতা কাটা একবার সূতা জড়ান সে ভোগ ইহাতে ভুগিতে হয় না। খানিকটা তুলা থেকে এক সময়েই সূতা কাটা ও জড়ান হইতেছে। একটি ত্রুটি দেখা গেল যে সূতা বরাবর এক আঁচের হইতেছে না। এক একবার মোটা এবং এক একবার সরু হইয়া পড়িতেছে। আশা করি এ দোষটির শীঘ্রই নিরাকরণ হইবে। সেই লোকটি আবার একটি নূতন রকমের তাঁতের কলও করিয়াছেন, কিন্তু এ বিষয়ে তিনি এখনও কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। মেলাতে বিদ্যুতের আলোর অনেক তামাসাও দেখান হইয়াছিল এবং একজন আগুন গিলিয়াছিল ও কাঁচ চিবাইয়া খাইয়াছিল। সর্দ্দারের খেলা এবং মল্লক্রীড়াও হইয়াছিল। পুষ্করিণীতে ভাউলের বাচ, এবং ঘোড়দৌড়ও সামান্য পরিমাণে হইয়াছিল। আমরা দেখিলাম একটি ভদ্রলোক একটি উচ্চ জায়গায় দাঁড়াইয়া সহজ বাঙ্গালা ভাষায় বক্তৃতা করিতেছেন।...বাবু নবগোপাল মিত্রের নিঃস্বার্থ যত্নেও বিশেষ চেষ্টায় আমরা এই সুন্দর মেলাটি দেখিলাম, তাঁহাকে আমরা ধন্যবাদ না দিয়া থাকিতে পারি না।"

অতঃপর 'সুলভ সমাচার' মেলার গুটিকতক ত্রুটির প্রতি কর্ত্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। তাঁহার মতে,

"মেলার ছবিগুলি সাজান হয় নাই, উচিত ছিল যত ভাল ভাল ছবি সব একজায়গায় সাজান। আর মেলাতে অতি অল্প সামগ্রীই সংগ্রহ হইয়াছিল, কুমারের জিনিষ, কিম্বা সেকরা, ছুতার, কামার, কাসারি প্রভৃতির কোন ভাল অলঙ্কার বা প্রয়োজনীয় দ্রব্যও আমরা কিছু দেখিলাম না; মেলাটি এমনই হওয়া চাই যে সকল লোকেই আপনাদের ভাল ভাল জিনিষ দেখাইয়া উৎসাহ পায়। এদেশের কোন ভাল পশু-পক্ষীও সংগ্রহ হয় নাই।"

'সুলভ সমাচার' এখানে যে নূতন ধরণের চরকা ও তাঁতের কথা বলিয়াছেন তাহা যশোহর-নিবাসী সীতানাথ ঘোষ কৃত। এই অধিবেশনে প্রদর্শিত দুইখানি চিত্রের বিশেষ পরিচয় পরবর্ত্তী ১৬ই ফেব্রুয়ারি তারিখের 'সমাচার চন্দ্রিকা'য় এইরূপ পাওয়া যাইতেছে—

"হিন্দু মেলা।...শ্রীযুক্ত বাবু তিনকড়ি মুখোপাধ্যায় নামক একজন অবৈতনিক চিত্রকর কুমারসম্ভবের অনুকরণ করিয়া যে দুইখানি চিত্র চিত্রিত করিয়াছিলেন, তাহা পরম প্রীতিকর হইয়াছিল। একখানির ছবির নিম্নভাগে এই শ্লোক লিখিত ছিল—

'ক্রোধং প্রভো সংহর সংহরেতি
যাবদ্ গিরঃ খে মরুতাং চরন্তি।
তাবৎ স বহ্নির্ভবনেত্র জন্মা
ভস্মাবশেষং মদনং চকার।'

অপর চিত্রখানির প্রতিকৃতি এই, কন্দর্প মহাদেবের ধ্যানভঙ্গ করিতে উদ্যত, পার্ব্বতীও পুষ্কর-বীজমালা শিবের হস্তে সমর্পণ করিতেছেন, বন-দেবতাদ্বয় পার্শ্বে দণ্ডায়মান। মহাকবি কালিদাস কন্দর্পের আকার অবলোকন করিয়া নিম্নলিখিত বর্ণনা করিয়াছেন—

'স দক্ষিণাপাঙ্গ নিবিষ্টমুষ্টিং
নতাংশ মাকুঞ্চিত সব্যাপাদম্।
দদর্শ চক্রীকৃত চারু চাপম্
প্রহর্ত্তুমভ্যুদতমত্মযোনিম্।'

এই দুইখানি চিত্র সামাজিক মাত্রেরই মনোহরণ করিয়াছে। তদ্ভিন্ন ডাকাতে বাজী, ভোজবাজী, ব্যায়াম প্রদর্শন, ঘোড়দৌড়, বোট্ কৌতুক, কথকতা, রাসায়নিক ক্রিয়া প্রভৃতি নানা বিষয়ে যে সকল প্রদর্শন হইয়াছিল, তাহা যে কতদূর প্রীতিপ্রদ, তাহা লেখনীদ্বারা প্রকাশ করা যাইতে পারে না।"

'অমৃতবাজার পত্রিকা' বাঙালী জাতির দৈহিক শক্তি ফিরাইয়া আনিতে উৎসুক। তাই তিনি বরাবর মেলার এই দিকটির উৎকর্ষের প্রতি জোর দিয়াছেন। পত্রিকা (২ মার্চ, ১৮৭১) জাতীয় মেলার কথা সাধারণ ভাবে কিছু বলিয়া এই বিষয়টি সম্বন্ধে বিশেষ আলোচনা করেন। তাঁহার কথা সংক্ষিপ্তাকারে এখানে প্রদত্ত হইল—

"জীব কাহাকে বলে, যাহারা অন্যকে জীবন দিতে পারে। মাঘ মেলা দেখিলে যে হিন্দুদের জীবন আছে, বোধ হয়। দশ জনে চাঁদা করিয়া একটি কাজে সাহসপূর্ব্বক প্রবর্ত্ত হওয়া যায়, মাঘ মেলার চাঁদা নাই। এরূপ কার্য্যের ভিত্তিভূমি সুদৃঢ় নহে। মাঘ মেলাটি হইয়া গেলেই চিন্তা হয়, আর বৎসর কি এইরূপ আবার হইবে?...কিন্তু তবু ত মেলা চলিতেছে...তবু ত মেলার ক্রমেই শ্রীবৃদ্ধি। ইহাতেই বোধ হয় হিন্দুরা অদ্যাপি সজীব আছে কারণ তাহারা জীবন দিতে পারে।

"আমাদের দেশীয়েরা যেন মেলার প্রধান উদ্দেশ্য ভুলেন না। শিল্পবিদ্যা উন্নতির নিমিত্ত মেলা নহে, শারীরিক বল, মাংসপেশী সুদৃঢ় করিবার নিমিত্ত। শিল্পবিদ্যা উন্নতি এই সঙ্গে হয়ত ভালই। শারীরিক বল বৃদ্ধির নিমিত্ত আমাদের বিশেষ চেষ্টা করিতে হইবে। ব্যায়াম চর্চ্চার প্রথম সোপান নবগোপালবাবু দেখাইয়াছেন।...ব্যায়াম চর্চ্চা করিবার এক উত্তেজক মাঘ মেলা তাহাও তাঁহারই যত্নে হইয়াছে, কিন্তু দেশ সমেত সকলে না মিশিলে একা নবগোপালবাবুর দ্বারা কিছু হইবে না।...(মেলায়) যাঁহারা এই ব্যায়াম চর্চ্চায় কৃতকার্য্যতা লাভ করিয়াছেন তাঁহাদের নাম প্রকাশ

হউক, ইহা লইয়া তর্ক বিতর্ক হউক, তাঁহাদিগের নামে কবিতা বান্দী হউক, তাহাদিগকে সাধুবাদ করা হউক, এইরূপ ঠিক কাজ করিতে থাকিলে শারীরিক বল যখন গৌরবের বিষয় হইয়া উঠিবে, তখন মেলার উদ্দেশ্য সাধিত হইবে।"

বলা বাহুল্য, পত্রিকার অভিপ্রায়ানুরূপ না হইলেও, মেলা কর্ত্তৃপক্ষ প্রতি বৎসরই ব্যায়ামবীর ও কুস্তিগীরদের যথোচিত পুরস্কার প্রদান করিতেছিলেন। মেলার আরম্ভ অবধি শ্যামাচরণ ঘোষ নামক এক ব্যক্তি কুস্তি-কসরৎ আদির জন্য প্রতি বারই পদক পুরস্কার পান। ১৮৭১ খ্রীষ্টাব্দে বঙ্গের তৎকালীন ছোটলাট সর উইলিয়ম গ্রে শরীর-চর্চ্চায় উৎকর্ষের জন্য মেলার পক্ষ হইতে তাঁহাকে একটি পদক প্রদান করিয়াছিলেন।[১]

মেলার কার্য্য এই বৎসর হইতে মফঃস্বলেও প্রসারলাভ করিল। নবগোপাল মিত্র মহাশয় চব্বিশ পরগনার অন্তর্গত বারুইপুরে স্থানীয় জমিদারগণের সহায়তায় একটি জাতীয় মেলা স্থাপন করেন। এ বৎসর ১লা হইতে ৭ই মে পর্য্যন্ত দিনাজপুরে রাজবাড়ীর সম্মুখস্থ ময়দানে কলিকাতার জাতীয় মেলার আদর্শে একটি মেলা অনুষ্ঠিত হয়। স্থানীয় বিবিধ কৃষিদ্রব্য ও শিল্পদ্রব্য এখানে প্রদর্শিত হয়। বিদেশী দ্রব্য সম্পূর্ণরূপে বর্জ্জিত হইয়াছিল। কৃষক ও শিল্পীদের মধ্যে যাহারা উৎকৃষ্ট দ্রব্য উৎপন্ন ও প্রস্তুত করিয়াছিল তাঁহাদিগকে পাঁচশত টাকা পরিমিত পারিতোষিক প্রদান করা হয়। উভয়ত্রই মেলা কয়েক বৎসর চলিয়াছিল।

এবারে সম্বৎসর ধরিয়া জাতীয় সভার কতগুলি অধিবেশন হইয়াছিল জানিতে পারি নাই। তবে সীতানাথ ঘোষ *Medical Magnetism* গ্রন্থে এ সনের গ্রীষ্মকালে জাতীয় সভার দুইটি অধিবেশনে প্রদত্ত বিদ্যুৎ সম্বন্ধে পর পর তাঁহার দুইটি বক্তৃতায় নিম্নরূপ উল্লেখ করিয়াছেন—

"In the summer of the year 1871, being requested by some of my friends, I delivered two successive addresses at the National Society's meeting in the Calcutta Training Academy's Hall on the ideas I conceived about the electrical and magnetic importance of the said practices."

১. *The National Paper*, July 24, 1872

ষষ্ঠ অধিবেশন, ১৮৭২

মেলার অধিবেশনের কিছুকাল পূর্ব্ব হইতে বিশেষ উদ্যোগ-আয়োজন চলিতেছিল। জাতীয় মেলার এই অধিবেশন হয় মৃত রাজা বৈদ্যনাথ রায়ের কাশীপুরস্থ বিখ্যাত বাগানবাটীতে যথারীতি মাঘ-সংক্রান্তি ও ১লা ও ২রা ফাল্গুন দিবসে (১১ই, ১২ই ও ১৩ই ফেব্রুয়ারি)। শেষ দিন বড়লাট লর্ড মেয়োর মৃত্যুসংবাদ ঘোষিত হইলে মেলার অধিবেশন এবারকার মত বন্ধ হইয়া যায়। একটি লক্ষ্য করিবার বিষয় যে, মেলার প্রথম হইতেই সাহিত্য, শিল্প ও ব্যায়াম এই তিনটি জিনিষের উৎকর্ষের দিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখা হইয়াছিল। কারণ জাতীয় উন্নতি বলিতে এই তিনটির উৎকর্ষ ব্যতীত আর কি হইতে পারে? এই অধিবেশনে চারুশিল্প বিভাগে সর্ব্বোৎকৃষ্ট তৈলচিত্রের জন্য একটি সুবর্ণ পদক এবং সর্ব্বোৎকৃষ্ট আলো-ছায়াময় চিত্রের জন্য আর একটি রৌপ্যপদক দানের ব্যবস্থা হয়। কৃষিজাত দ্রব্যাদির জন্য তিন শত টাকা পরিমাণ পুরস্কারের বরাদ্দ ছিল। মল্ল, কুস্তি-কসরৎ প্রদর্শক ও ব্যায়ামবীরদের জন্যও যথারীতি পারিতোষিকের বরাদ্দ হয়। জাতীয় মেলায় এবারে উৎকৃষ্ট পুস্তক-লেখক ও প্রবন্ধকারদের পুরস্কার দানের পরিবর্ত্তে ইহাতে যে পরিমাণ অর্থ ব্যয়িত হইয়া থাকে তাহা এবং এতদর্থে প্রাপ্ত অন্য টাকা-কড়ি 'হিন্দু-প্রদর্শক' পত্রিকার প্রচারানুকূল্যে ব্যয় করা জাতীয় সভার সাহিত্য-বিভাগ ধার্য্য করিয়াছিলেন। তবে মেলার অধিবেশনে সাহিত্য-শাখায় প্রবন্ধ ও কবিতা পাঠ যথারীতি হইয়াছিল। এই অধিবেশনের বিজ্ঞপ্তি হইতে জানা যায়, জাতীয় মেলার সাধারণ সভার অধিবেশন বৎসরে দুই বার হওয়া স্থির হয়। ইহার বিবেচনার জন্য কর্ম্মকর্ত্তৃসভার কার্য্যাবলী ঐ ঐ সময় উপস্থাপিত করার কথা থাকে। কার্য্য-পরিচালনার নিয়মাবলী ধার্য্য করার ক্ষমতাও সাধারণ সভার। সাধারণ সভার সভ্য ছিলেন—বর্দ্ধমানের মহারাজা, রাজা কমলকৃষ্ণ বাহাদুর, রমানাথ ঠাকুর, দিগম্বর মিত্র, রাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর, বিজয়কেশব রায়, ঈশ্বরচন্দ্র ঘোষাল, দুর্গাচরণ লাহা, হীরালাল শীল, কৃষ্ণদাস পাল, প্যারীচরণ সরকার, রাজেন্দ্রলাল মিত্র, রাজনারায়ণ বসু, পণ্ডিত আনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশ, পণ্ডিত মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন, প্রাণকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়; কোষাধ্যক্ষ ছিলেন—কুমার সুরেন্দ্রকৃষ্ণ এবং গুণেন্দ্রনাথ ঠাকুর।[১]

নির্দ্দিষ্ট দিনে নির্দ্দিষ্ট সময়ে মেলার প্রকাশ্য অধিবেশন যথারীতি আরম্ভ হইল। রাজা কমলকৃষ্ণ সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন। সভাপতির পার্শ্বে গণ্যমান্য পণ্ডিত ও বক্তাগণ এবং সম্পাদক দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, মনোমোহন বসু প্রমুখ নেতৃবৃন্দ উপবেশন করেন। প্রথমেই সাহিত্য বিভাগের কার্য্য অনুষ্ঠিত হইল। দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, মনোমোহন বসু, ঈশানচন্দ্র বসু, বাণীনাথ নন্দী প্রমুখ সাহিত্যিকগণ সারগর্ভ প্রবন্ধ পাঠ করেন। কবিতা আবৃত্তি হইল। কেহ কেহ স্বরচিত কবিতাও পাঠ করিলেন।

১. *The National Paper*, Feb. 7, 1872

মেলার দ্বিতীয় কার্য্য শিল্প-প্রদর্শন। এবারে কৃষিজাত দ্রব্য তেমন আসে নাই বটে, কিন্তু অনেক সুন্দর সুন্দর চিত্র, খাদ্যদ্রব্য, সঙ্গীত ও বাদ্যযন্ত্র, ব্যায়ামাদির জিনিষপত্র এবং বাংলা, সংস্কৃত ভাল ভাল পুস্তক এবারকার প্রদর্শনীর গৌরব বর্দ্ধন করে। শেষোক্ত শ্রেণীতে উপস্থাপিত রাজেন্দ্রলাল মিত্র-কৃত বঙ্গের কয়েকটি জেলার মানচিত্র বিশেষ উল্লেখযোগ্য। রাজেন্দ্র মল্লিক জ্বর-রোগ ও সর্প দংশনের প্রতিষেধক ঔষধ বিতরণ করেন।

তৃতীয় দিনে বড়লাট লর্ড মেয়োর মৃত্যু-সংবাদ ঘোষিত হইলে মেলার অধিবেশন অকস্মাৎ পরিসমাপ্ত হয়। সম্পাদক দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর মেলা-ক্ষেত্রে লর্ড মেয়োর অপঘাতমৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করিয়া বক্তৃতা করেন।[২]

মেলা-ক্ষেত্রে মনোমোহন বসু মহাশয়ের প্রবন্ধ পাঠের কথা বলিয়াছি। পূর্ব্ব পূর্ব্ব বারের মত এবারেও তিনি হিন্দু মেলার উদ্দেশ্য সিদ্ধিকল্পে সচেষ্ট হইতে স্বদেশবাসীকে আহ্বান করেন। ভারতবর্ষে কলের গাড়ী, কলের জাহাজ, কলের জল, কলের নলে গ্যাস জ্বালা, কলের তারে সংবাদ আদান-প্রদান কতই না হইতেছে। নগরে নগরে এত সওদাগরী কুঠী, অপর্য্যাপ্ত বাণিজ্যকার্য্য নীল, চা প্রভৃতির অসামান্য চাষ ও ব্যবসায়, এত বিচিত্র সুরম্য হর্ম্ম্যকার্য্য, সুচিত্রিত কারুকার্য্য ও চিত্রকার্য্য, কিন্তু এসবে আমাদের কি অধিকার? মনোমোহন বলেন—

"ওহে অহংবাদি সভ্যতাভিমানি নববঙ্গ! তোমরা কিসের বড়াই করিয়া বেড়াও? তোমরা বাক্যাড়ম্বর ভিন্ন আর কি কাজের যোগ্য? তোমাদের পূর্ব্বপুরুষ অপেক্ষা তোমরা উন্নত হইয়াছ, একথা কোন্ সাহসে ব্যক্ত কর। যে ইংরাজ জাতির দ্বারা এই সকল কার্য্য হইতেছে, ইহা তাহাদেরি উন্নতি, তোমাদের কি? শ্রীফল পক্ক হইলে বয়সের কি? তাহারা স্বদেশে উন্নতির সঙ্গে বাস করেন, এখানেও সেই উন্নতিকে সঙ্গে করিয়া আনিয়া স্বদেশে এবং অধীন দেশে, উভয় স্থানেই আপনারা আরো উন্নত হইতেছেন, তোমরা কেবল সাক্ষীগোপাল। তোমরা কেবল দর্শক আর স্তুতিবাদক বৈ আর কি? সুতরাং তোমাদের উচ্চে উত্থান হইল কৈ? তোমাদের প্রখর বুদ্ধিরূপ সুতীক্ষ্ণ বাণ আছে সত্য, কিন্তু প্রাকৃত বিজ্ঞান নামা রাধাচক্রের সূক্ষ্ম ছিদ্র দিয়া লক্ষ্যভেদ না করিতে পারিলে সে বুদ্ধি থাকাতে ফল কি?"

মনোমোহন নববঙ্গকে এইরূপ উত্তেজিত করিয়া সৌভ্রাত্রবন্ধনে আবদ্ধ হইবার জন্য দেশের ধনী ও বিত্তশালী ব্যক্তিদের উদ্দেশ করিয়া বলিতেছেন—

"আয়রে সৌভাগ্যশালী প্রিয় পুত্রগণ! আয়রে আমার ধনকুবের প্রধান সন্তানগণ! আয়রে রাজ্যাধিকারি—ভূম্যধিকারি কৃতজ্ঞ কৃতি পুত্রগণ! যদি ভাগ্যক্রমে ভ্রাতৃবর্গের মধ্যে সৌভ্রাত্রবন্ধনের আর একতারূপ অতুল্য একাবলিহার ধারণের সুযোগ পাইয়াছ, তবে বৎসগণ! বৃথা অভিমান, অনর্থগর্ব্ব, সর্ব্বনাশক ইন্দ্রিয়াসক্তির বশীভূত আর থেকো না! স্বদেশানুরাগকে তোমাদের পথ-প্রদর্শক কর, তিনি অচিরে নির্ম্মল আনন্দ মন্দিরে তোমাদিগকে লইয়া যাইবেন। হায় বৎস! তোমাদের প্রতিই তোমাদের অভাগ্যবতী জননীর অধিক আশা ভরসা—মধ্যাবস্থ তোমাদের কনীয়ান্ ভ্রাতারা যেরূপ মাতৃভক্তি-পরায়ণ, আর বাসনা ও বিদ্যাবুদ্ধিতে যেরূপ সুযোগ্য, তাহাদের যদি

২. *The National Paper*, Feb. 14 and 21, 1872

সেইরূপ সম্পত্তিবল, সম্ভ্রমবল, প্রভুত্ববল থাকিত, তবে বৎস! কোনো চিন্তার বিষয়ই হইত না! তোমরা সহায় না হইলে তাহারা কি করিতে পারে! তোমরা অনুবল হইলে তাহারা অসাধ্যও সাধন করিতে পারিবে—যত্নাস্ত্রে সকল বিঘ্নের মস্তকচ্ছেদন করিয়া ফেলিবে! অতএব প্রাণপ্রতিম প্রিয়তম সন্তানগণ! আর ঔদাস্য নিদ্রায় অচেতন রহিও না; জননীর দুঃখ বর্জ্জনে আর বিলম্ব করিও না; জাগরুক হও—উত্থান কর—চক্ষুরুন্মীলন কর—পবিত্র প্রতিজ্ঞাজলে অভিষিক্ত হও—স্বাবলম্বন রূপ বসন পরিধান কর—ঐক্যরূপ শিরস্ত্রাণ মস্তকে ধর—আশারূপ আশগাছটি করতলে লও—ভ্রান্তিগৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া বিস্তীর্ণ কর্ম্মভূমিতে অবতীর্ণ হও—চাহিয়া দেখ, প্রভাত হইয়াছে—শ্রবণ কর, স্বজাতি-কুঞ্জের গৌরব-শাখীতে ভর করিয়া কর্ত্তব্য কোকিল, উৎসাহ শুক, আর উত্তেজনা শারী জয়জয়ন্তী তানে গান·করিতেছে—নববঙ্গের নবোদ্যম কুসুমের যশঃসৌরভে চতুর্দ্দিক আমোদিত হইতেছে—নবোদ্ভিন্ন সুশিক্ষারূপ সুপক্ষধারী সুপবিত্র-চেতা ছাত্রপুঞ্জ মধুকর-শ্রেণী রূপে গুঞ্জরব করিয়া কুঞ্জবনে আসিতেছে—আবার বৃক্ষের অন্তরালে দৃষ্টি কর,

"সৌভাগ্য অরুণ"

তরুণ বেশে অল্পে অল্পে উদয় হইতেছে! তাহার শোভা দেখাইবার জন্য তোমরা তোমাদের সকল ভ্রাতাকে একত্র কর; সেই অরুণের আশ্চর্য্য আলোক দেখিয়া পুলক পাইয়া এই ভারত-লোকবাসী সকলেই শব্দ করুক "জয় জয় জয়!" হিমাচলের পবিত্র গিরিগুহা হইতে প্রতিধ্বনি হউক "জয় জয় জয়!" আকাশে শব্দ হউক "জয় জয় জয়!"

"হিন্দুমেলার জয়!"
"হিন্দুমেলার জয়!"
"হিন্দুমেলার জয়!"

সপ্তম অধিবেশন, ১৮৭৩

জাতীয় মেলার আয়োজন যথারীতি আরম্ভ হইল। ১৫ই, ১৬ই ও ১৭ই ফেব্রুয়ারি অধিবেশনের দিন ধার্য্য হইল। এবারে অধিবেশন হইল হীরালাল শীলের নৈনানস্থ বাগানে। 'অমৃতবাজার পত্রিকা' আসন্ন অধিবেশন সম্পর্কে লিখিলেন—

"জাতীয় মেলা। ফাল্গুন মাসের এই তারিখে জাতীয় মেলার সমাবেশ হইবে।...স্রোতের গতি ফিরিয়াছে, এখন হিন্দু সমাজ কিসে রক্ষা পায় তাহার প্রতি অনেকে কায়মনোবাক্যে যত্ন করিতেছেন। বাবু রাজনারায়ণ বসু হিন্দু ধর্ম্মের শ্রেষ্ঠতা বিষয়ক প্রস্তাব যখন পাঠ করেন, তখন শ্রোতৃবর্গের কত যে উৎসাহ হয়, তাহা বলা যায় না।...

"বাবু নবগোপাল মিত্র কলিকাতায় অনেকগুলি ব্যায়ামচর্চ্চার নিমিত্ত স্কুল খুলিয়াছেন এখন তাঁহার এই মাত্র যত্ন যে, ইহার কিসে শ্রীবৃদ্ধি হয়। ক্যাম্বেল সাহেব আর যত অনিষ্ট করুন, তিনি আমাদিগকে শারীরিক ব্যায়াম চর্চ্চা শিক্ষায় উৎসাহ দিয়া বিশেষ উপকার করিতেছেন।...

অধিবেশন আরম্ভ হইল। প্রথম দিন মেলার চাঁদাদাতৃবর্গ এবং গণ্যমান্য ব্যক্তিদের লইয়া মেলা-ক্ষেত্রে সভা হইল। ইহার পৌরোহিত্য করেন রাজা কমলকৃষ্ণ বাহাদুর। তাঁহার প্রারম্ভিক অভিভাষণের পর অন্যতর সম্পাদক দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় গত বৎসরের কার্য্যকলাপ সম্পৃক্ত একটি বিবরণ পাঠ করেন। তিনি ইহাতে জাতীয় মেলা এবং জাতীয় সভার উদ্দেশ্য ও কার্য্যকারিতা সম্বন্ধে বিশেষভাবে উল্লেখ করেন। হিন্দুজাতির পূর্ব্বগৌরব ও বর্ত্তমান হীন অবস্থার তুলনামূলক আলোচনা পূর্ব্বক তিনি জাতীয় উন্নতিবিধান কল্পে সকলকে অবহিত হইতে অনুরোধ করিয়া বিবরণ শেষ করিলেন। মেলা উপলক্ষে রচিত কয়েকটি স্বদেশপ্রেমোদ্দীপক সঙ্গীত বাদ্যাদি সহযোগে গীত হইবার পর এদিনকার মত সভা ভঙ্গ হয়।

রবিবারই মেলার প্রধান উৎসবের দিন। বেলা এগারটার সময় রাজা কালীকৃষ্ণ বাহাদুরের পৌরোহিত্যে সাধারণ অধিবেশন আরম্ভ হইল। সম্পাদক কার্য্যবিবরণ পাঠ করিলে পর সভাপতির আহ্বানে মনোমোহন বসু মহাশয় "হিন্দু আচার ব্যবহার—সামাজিক" শীর্ষক একটি প্রবন্ধ পাঠ করিলেন। ইহার প্রথম অংশ তিনি ইতিপূর্ব্বে জাতীয় সভায় পাঠ করিয়াছিলেন বলিয়াছি। বক্তৃতার পরে আবার সঙ্গীত হয়।

বক্তৃতাগৃহের পার্শ্বেই বিভিন্ন তাঁবুতে পূর্ব্ব পূর্ব্ব বারের মত এবারেও দেশজ শিল্প ও কৃষিজাত দ্রব্যের প্রদর্শনীর আয়োজন করা হইয়াছিল। প্রদর্শনী ক্ষেত্রে স্ত্রীলোকদের কৃত বিবিধ সূচীকর্ম্ম, আলোকচিত্র, শারীর চর্চ্চার ও লাঠিখেলার নানা সাজসরঞ্জাম, ভাস্কর্য্যে দ্রুপদের রাজসভা, অর্জ্জুন কর্ত্তৃক লক্ষ্যভেদ ও দ্রৌপদী লাভ, ডেঙ্গু জ্বরাক্রান্ত রোগী, দেশীয় চারুশিল্পীদের দ্বারা অঙ্কিত শকুন্তলার পতিগৃহে যাত্রা, মাতা যশোদার ক্রোড়ে শ্রীকৃষ্ণ, মূর্ত্তিতে শিব কর্ত্তৃক সতীর শব-বহন প্রভৃতি বিভিন্ন তাঁবুতে সাজাইয়া রাখায় দর্শকদের বিশেষ নয়নাভিরাম হইয়াছিল। বিবিধ ফুল,

ফল ও শাকসব্জীও প্রদর্শিত হয়। রমানাথ ঠাকুরের সভাপতিত্বে উৎকৃষ্ট মালীদের পুরস্কার প্রদান করা হয়। গুণেন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং নীলকমল মুখোপাধ্যায় বিচারক ছিলেন।

এবারকার পুস্তক-প্রদর্শনীটি বড়ই উত্তম হইয়াছিল। কবিতা, ইতিহাস, উপন্যাস, সাধারণ সাহিত্য, বিজ্ঞান, অভিধান প্রভৃতি বিষয়ক সংস্কৃত বাংলা বহু পুস্তক গ্রন্থকারগণ প্রদর্শনীতে প্রেরণ করিয়াছিলেন।

ব্যায়াম কুস্তি কসরতাদিরও বিশেষ ব্যবস্থা হয়। এবারে কুস্তি-দর্শনেচ্ছু ব্যক্তিদের জন্য দর্শনী গ্রহণ করা হইয়াছিল। দুঃখের বিষয়, বহুলোক দর্শনী দিয়া কুস্তিক্ষেত্রে গমন করে, কিন্তু জনতা অকস্মাৎ গণ্ডগোল সৃষ্টি করায় এদিন কুস্তি কসরৎ দেখান হয় নাই। তবে লাঠিয়ালগণ তাহাদের লাঠিখেলা দেখাইতে সমর্থ হয়। পরের দিন ব্যায়াম কুস্তি লাঠিখেলা প্রদর্শিত হয় এবং তাহাদের কৃতিত্বে সকলেই সাধুবাদ করেন। জনৈক যুবক আগুনের মধ্য দিয়া হাঁটিয়া গিয়াছিল!

মেলায় জাতীয় নাট্যশালার অভিনেতৃগণ 'ভারত-মাতার বিলাপ' নাটকের অভিনয় করেন। অভিনয় কিরূপ মর্ম্মস্পর্শী হইয়াছিল পশ্চাৎ-উদ্ধৃত 'অমৃতবাজার পত্রিকা'র বিবরণ পাঠে তাহা জানা যাইবে।

মেলার তৃতীয় দিনে সভাপতিত্ব করেন রাজানারায়ণ বসু মহাশয়। এখানে সীতানাথ ঘোষ "বঙ্গের সংক্রামক জ্বরের কারণ" শীর্ষক একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন। ব্যায়াম কসরৎ লাঠি খেলার পর জাতীয় সঙ্গীত গীত হইলে মেলার কার্য্য শেষ হয়।

১৯ ও ২৬ ফেব্রুয়ারি (১৮৭৩) সংখ্যা 'নেশন্যাল পেপার' হইতে মেলার বিবরণের মর্ম্ম সংক্ষিপ্তাকারে প্রদত্ত হইল। মেলার কৃতিত্ব ও ভাবী সাফল্য সম্পর্কে উক্ত পত্রিকার মন্তব্য এখানে উল্লেখযোগ্য—

The mela has completed its seventh year. If a greater measure of public sympathy be accorded to it [it] may grow to more useful purpose and in a certain sense, a Representative Institution. It may ultimately become a power in the nation, an innocent annual gathering of the people—the occasion of our rejoicing, a loving examination of the nation's advance in art and science, and an appreciation of treasures bequeathed to us by our ancestors. Let us hope that the Mela will be a binding power endearing the Hindu name to the Aryan people wherever scattered through India.

'অমৃতবাজার পত্রিকা' জাতীয় মেলার গুণগ্রাহী ও পৃষ্ঠপোষক। ইহার শ্রীবৃদ্ধিকল্পে পত্রিকার পরামর্শ উপদেশ সমালোচনা কোন মতেই অগ্রাহ্য করিবার নয়। পত্রিকার উপদেশ কোন কোন ক্ষেত্রে গ্রহণ করিয়া মেলা-কর্ত্তৃপক্ষ ইহার বিশেষ উন্নতি সাধন করেন। সপ্তম অধিবেশন সম্পর্কেও পত্রিকার মন্তব্য এবং পরামর্শ প্রণিধানযোগ্য। শহর হইতে মফস্বলে যাহাতে জাতীয় ভাব ছড়াইয়া পড়ে এজন্য তাঁহার বড়ই আগ্রহ। পত্রিকা লেখেন—

"মেলা আজ কয়েক বৎসর অপ্রতিহত ভাবে হইল। এখন আমাদের কতক কতক ভরসা হয় যে এটি বুঝি স্থায়ী হইয়াছে,...। প্রথম বৎসর মেলায় ঘোড়দৌড় প্রভৃতি অনেকগুলি পৌরুষিক কাজ হয়, সেবার এদেশীয় একজন ধনাঢ্য একটি ভারি বজ্জাত ঘোড়া চালাইতে বিপ্রদাপন্ন হন,

ও আমরা ইহা দেখিয়া বড়ই পুলকিত হই। ৬ বৎসর যখন উহা জীবিত আছে, উহার প্রণেতার উৎসাহ যখন সমানভাবে আছে, যখন শত শত লোক রৌদ্র ধূলা দূরত্ব কিছুই মনে না করিয়া মেলায় উপস্থিত হয়, তখন উহা দ্বারা যে কিছু উপকার হইয়াছে তাহার কোন সন্দেহ নাই।...মেলার কর্ত্তৃপক্ষীয়গণের উদ্দেশ্য মহৎ। তাহারা যেমন লোক সংগ্রহ করিতে চান, সেইরূপ সঙ্গে সঙ্গে দেশের মঙ্গল সম্পাদন করিতে চান। আমাদেরও এই মত,...ব্যায়াম চর্চ্চাটি অতি উত্তমের বিষয়...যদি কাজে লাগিবে এই উদ্দেশ্যে লাঠি, তলোয়ার, বন্দুক, তীর প্রভৃতি শিক্ষা করে তবে বড় ভাল হয়।...নবগোপালবাবু একা, তিনি ধন প্রাণ সমুদায় মেলার নিমিত্ত বিসর্জ্জন করিয়াছেন, সুতরাং তাহার নিকট আমরা কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ আছি। তিনি যদি মেলার নিমিত্ত বৎসরে দুই মাস মফস্বলে পর্য্যটন করেন তবে তিনি দেখিবেন যে তিনি মেলার অনুষ্ঠান করিয়া অকূলপাথারে ঝম্প প্রদান করেন নাই।...দেশের মধ্যে আপাতত রাজনৈতিক সম্বন্ধে লোকের স্বার্থ ক্রমেই উদ্দীপ্ত হইয়াছে এবং যদি কোথায় কোন অত্যাচার হইতেছে মেলা দ্বারা নবগোপালবাবু তাহার সংগ্রহ করেন তবে বিস্তর উপকার হইতে পারে। তিনি যদি বারওয়ারীর সং কি দেবদেবীর উপাসনার অনুষ্ঠান না চান, তবে এক কাজ করিতে পারেন। তিনি পুতুল দ্বারা দেশের সামাজিক ও রাজনৈতিক অনেক দুর্দ্দশা প্রাঞ্জলরূপে প্রকাশ করিতে পারেন।...এবার হিন্দু মেলাতে নেশন্যাল থিয়েটর যখন "ভারতমাতার বিলাপ" অভিনয় করিলেন, তখন শ্রোতৃবর্গমাত্র অশ্রুপতন করেন।...আমরা নবগোপালবাবুকে এক পরামর্শ দেই। তিনি এবার মফস্বল গমন করিয়া যাহাতে মফস্বলবাসীরা এ বিষয়ে উদ্যোগী হয়, তাহার যত্ন করুন।"

অষ্টম অধিবেশন, ১৮৭৪

এবারকার অধিবেশন হয় কলিকাতার অভ্যন্তরে পার্শীবাগানে ১১ হইতে ১৫ ফেব্রুয়ারী। জাতীয় মেলার অধিবেশন এই প্রথমবার কলিকাতা নগরীর অভ্যন্তর ভাগে হইল। এই কয় দিনের উৎসবের বিবরণ 'মধ্যস্থ' সংক্ষেপে দিয়াছেন। প্রথমেই 'মধ্যস্থ' লেখেন—

"এ বৎসর মাঘ-সংক্রান্তি বুধবার দিবসে মেলার কার্য্য আরব্ধ হইয়া ৪ঠা ফাল্গুন রবিবার পর্য্যন্ত ছিল। অন্যান্য বারে নগরের বাহিরে কোন দূরস্থ উদ্যানে মেলা হইত, এবারে শহরের মধ্যে মূর্জাপুরস্থ বিখ্যাত পার্শীবাগানে তাহা হওয়াতে সাধারণের পক্ষে বড় সুবিধা হইয়াছিল। কিন্তু আট আনা হারে প্রবেশ-টিকেটক্রয়ের নিয়ম হওয়াতে অন্যান্য বারের ন্যায় তত লোক হয় নাই। তথাপি সহস্র সহস্র মহাশয়েরা যে পদার্পণ করিয়াছিলেন, ইহাই পরম ভাগ্য...।"

প্রথম দিনের অপরাহ্নে মেলাক্ষেত্রেই জাতীয় সভার সাম্বৎসরিক অধিবেশন হইল। তাহাতে পরবর্ত্তী বর্ষের নিমিত্ত নিম্নলিখিতরূপে অবৈতনিক সম্ভ্রান্ত কর্ম্মচারীসমূহ মনোনীত হইলেন রাজা কমলকৃষ্ণ দেব বাহাদুর অধ্যক্ষ সভার সভাপতি এবং রাজা চন্দ্রনাথ রায়, বাবু দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও বাবু রাজনারায়ণ বসু সহকারী সভাপতি; বাবু নবগোপাল মিত্র ও বাবু প্রাণনাথ পণ্ডিত, এম.এ. সম্পাদক; বাবু ভুজেন্দ্রভূষণ চট্টোপাধ্যায় তথা বাবু জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর সংশ্লিষ্ট সম্পাদক পদে নিযুক্ত হইলেন।

"শুক্রবার জাতীয় বিদ্যালয়ের ছাত্রগণের পারিতোষিক বিতরণের কার্য্য মেলার উদ্যানেই অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। তৎকালে রাজনারায়ণ বাবু ও প্রাণনাথ বাবু উৎসাহসূচক কিঞ্চিত বক্তৃতা করিয়াছিলেন। রাজা কমলকৃষ্ণ বাহাদুর উক্ত পারিতাষিক দান বিষয়ে বিস্তর অর্থানুকূল্য করিয়াছিলেন।

"শনিবার দিবসীয় মেলায় নবগোপাল বাবু গত বৎসরের প্রধান প্রধান সামাজিক ঘটনা বিবৃত করেন। এবং অমৃতবাজার পত্রিকা সম্পাদক বাবু শিশিরকুমার ঘোষ মহাশয় কর্ত্তৃক "বর্ত্তমান দুর্ভিক্ষ ও তন্নিবারণের উপায়" সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ পঠিত হয়। তৎপরে রাজনারায়ণ বসু মেলার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস ঘটিত একটি বক্তৃতা করেন।

"রবিবার যে বৃহতী সভা হয়, তাহাতে রাজা চন্দ্রনাথ বাহাদুরের প্রধান আসন গ্রহণের কথা ছিল। কিন্তু তাঁহার হঠাৎ অসুখ হওয়াতে তাঁহার পরিবর্ত্তে বাবু দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর সভাপতির কার্য্য নির্ব্বাহ করিলেন। বাবু প্রাণনাথ পণ্ডিত কর্ত্তৃক সংক্ষেপে প্রাপ্ত সংস্কৃত ও বাঙ্গালা পুস্তকাদির বিবরণ লিপির পাঠ হইল।

"মন্তব্য লিপি পাঠ সমাপ্ত করা হইলে বাবু মনোমোহন বসু জাতীয় ভাব ও জাতীয় অনুষ্ঠান প্রসঙ্গে একটি সুদীর্ঘ বক্তৃতা করিলেন।...তৎপরে সভাপতি মহাশয় মেলার বর্ত্তমান অবস্থা বর্ণনা দ্বারা ভবিষ্যতের আশা ও উৎসাহের নিমিত্ত অনুরোধ করিলেন...।

"রবিবারে যাহা যাহা প্রদর্শিত হয় তাহার তালিকা এই,

১। ক্ষেত্রজ বহুবিধ ধান্য তণ্ডুলাদি শস্য এবং উদ্যানজাত নানারূপ ফলমূল শাকসব্‌জি লতা গুল্ম ইত্যাদি।

২। শিল্প।

৩। জন্তু প্রদর্শন।

৪। নাটক। জাতীয় নাট্যশালার নটগণ অভিনেতা; ইহার নিমিত্ত এক টাকা হারে স্বতন্ত্র টিকিট।

৫। ব্যায়াম। ইহারও আট আনা হারে স্বতন্ত্র টিকিট হইয়াছিল।

৬। কুস্তি।

৭। বেদের ভেল্‌কি, সাপ-খেলানো, ভালুক লড়াই প্রভৃতি তামাসা।

৮। কুমারের চাক, তাঁতির তাঁত প্রভৃতি দেশীয় যন্ত্রের পরিচালন।

৯। আতশবাজী। প্রদর্শকগণকে যথোচিত পারিতোষিক প্রদত্ত হইয়াছিল।"

'অমৃতবাজার পত্রিকা' (১৯ ফেব্রুয়ারি ১৮৭৪) এবারে মেলার একটি সংক্ষিপ্ত ইতিহাস প্রদান করিয়া এই অধিবেশন সম্পর্কে একখানি পত্রসহ নিজ মন্তব্য লিপিবদ্ধ করিলেন। ইহার কিয়দংশ এই—

"হিন্দু মেলা এই সপ্তম[১] বৎসরে পদার্পণ করিল। এই তুফান ঝটিকার মধ্যে একজন বীরপুরুষ ইহাকে এই সাত বৎসর জীবিত রাখিয়াছেন। অনেক দিন হইল একজন মহাপুরুষ দেশের দুর্গতি দেখিয়া ব্যাকুল হন। তিনি গ্রীক দেশীয় অলিম্পিক গেমের ন্যায় এখানে একটি মেলার উদ্যোগ করেন। তিনি ইহার নাম ধনুর্যজ্ঞ রাখেন। ইহার নিমিত্ত দেশের কয়েকজন প্রধান ২ লোকের নিকট উপস্থিত হন। সংবাদপত্রেও ইহা লইয়া আলোচনা হয়। কিন্তু বিধাতা তাঁহার মনোরথ পূর্ণ হইতে দেন না। ইহার কিছুদিন পরে মেদিনীপুরে এই বিষয়ে কতক উদ্যোগ করা হয়। তাহার পর বাবু নবগোপাল মিত্র এই বৃহৎ ব্যাপার কৃতসঙ্কল্প হন।...

"মেলা সম্বন্ধে আমরা একখানি পত্র প্রকাশ করিলাম। এবার মেলায় প্রবেশের নিমিত্ত টিকিট বিক্রয়ের রীতি করায় কেহ কেহ বিরক্ত হইয়াছেন। নবগোপালবাবু যদি সকলকে বিনা ব্যয়ে যাইতে দিতে পারিতেন তাহা হইলে ভাল হইত। এ বৎসর যেরূপ কলিকাতার নিকটে মেলার স্থান হইয়াছিল ইহাতে বোধ হয় বিস্তর লোকের সমাগম হইত। কিন্তু এ দোষ নবগোপাল বাবুর নহে, এ দোষ আমাদের। তিনি যথাসর্ব্বস্ব এই মেলার পাছে অর্পণ করিয়াছেন।...টিকিট বিক্রয় দ্বারা সপ্রমাণ হইয়াছে যে, মেলার প্রতি অনেকের আন্তরিক স্নেহ আছে।

"কিন্তু হিন্দু মেলার উদ্দেশ্য যেরূপ মহৎ মেলাটি এখন পর্য্যন্ত তদনুরূপ বৃহত্তর হইল না ইহা অত্যন্ত দুঃখের বিষয়।...এখন আমাদের মধুর ছাড়িয়া তিক্ত রসস্বাদ গ্রহণ করার প্রয়োজন হইয়াছে। আমরা যখন দেখিব হিন্দু মেলার সুবিস্তীর্ণ রঙ্গভূমি মল্ল বেশধারী হিন্দু সন্তানগণে পরিপূর্ণ

১। ইহা ঠিক নহে, অষ্টম হইবে।

হইয়াছে, বাঙ্গালীরা তেজস্বী অশ্বগণকে অবলীলাক্রমে ও অশেষ কৌশলে সঞ্চালন করিয়া দর্শকগণকে বিমোহিত করিতেছেন, যখন দেখিব হিন্দু-সন্তানগণ বন্দুক তলোয়ার প্রভৃতি বিবিধ অস্ত্র-শস্ত্রে সুসজ্জিত হইয়া উদ্যমের সহিত উৎসাহ পূর্ব্বক দ্বন্দ্বযুদ্ধে পরস্পর প্রবৃত্ত হইতেছে এবং পরস্পর পরস্পরের আঘাতে আঘাতিত হইয়া রক্তাক্ত কলেবরে কেহ আহত পদে, কেহবা আহত হস্তে, কেহবা আহত মস্তকে রঙ্গস্থান পরিত্যাগ করিতেছেন, ও তদুপলক্ষে পুলিশ আসিয়া নবগোপাল বাবুর হস্ত ধরিয়া টানাটানি করিতেছে, সেইবার জানিব হিন্দু মেলার মহৎ উদ্দেশ্য অনেকাংশে সুসিদ্ধ ও সফল হইয়াছে।”

নবম অধিবেশন, ১৮৭৫

জাতীয় মেলার বাৎসরিক অধিবেশনের সময় যতই নিকটবর্ত্তী হইতে লাগিল ততই নবগোপাল মিত্র মহাশয় আহারনিদ্রা পরিত্যাগ করিয়া ইহার আয়োজন সর্ব্বাঙ্গসুন্দর করিতে লাগিয়া গেলেন। 'অমৃতবাজার পত্রিকা' (৪ ফেব্রুয়ারী ১৮৭৫) ইংরেজী স্তম্ভে লিখিলেন, "Babu Nobogopal has left off eating, sleeping and is roaming from door to door." এ বৎসর পার্শীবাগানে মেলার অনুষ্ঠান হইল, এবং পাঁচ দিন পর্য্যন্ত ইহার অধিবেশন চলিল। এবারে সভাপতি হইলেন রাজনারায়ণ বসু মহাশয়। 'সোমপ্রকাশ' (১৫ই ফেব্রুয়ারী ১৮৭৫) প্রথমেই লেখেন—

"হিন্দু মেলা।...৩০ শে মাঘ (১১ই ফেব্রুয়ারী বৃহস্পতিবার) ইহার কার্য্য আরম্ভ হইয়া আজ (৪ঠা ফাল্গুন) শেষ হইবে। এ মেলাটি বাবু নবগোপাল মিত্রের দৃঢ়তর যত্নের ফল। ইহা আজিও যে নির্ব্বাণ হয় নাই, নবগোপাল বাবুর অস্খলিত অধ্যবসায়ই তাহার কারণ। ইহা ক্রমেই শ্রীসম্পন্ন হইতেছে। আমরা প্রথম প্রথম ইহার ধরণ দেখিয়া মনে করিয়াছিলাম, এ দেশের হরিদ্বার ও হরিহরছত্র ও বারুণী প্রভৃতি মেলার ন্যায় এটিও একটি উৎসব ক্ষেত্র হইল, কিন্তু এখন দেখিতেছি ইহা ক্রমে আমোদ-ক্ষেত্র না হইয়া কার্য্যক্ষেত্র হইয়া উঠিতেছে। আমাদিগের দেশের বিদ্বান্ ও বিজ্ঞ লোকেরা মেলাস্থলে বসিয়া দেশের মঙ্গল চিন্তা করিতেছেন। কি উপায়ে দেশের কৃষি-বাণিজ্যাদির শ্রীবৃদ্ধি হয়, বিজ্ঞান ও সাহিত্যের উন্নতি হয় এবং ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশবাসী হিন্দুরা একবাক্য হইয়া স্বদেশের কল্যাণ চিন্তা করেন, এই চেষ্টা হইতেছে। এগুলি অনল্প আহ্লাদের বিষয় সন্দেহ নাই।..."

মেলাস্থলে প্রতিদিনকার নির্দ্দিষ্ট কার্য্য সম্বন্ধে উক্ত পত্রিকায় যে তালিকা বাহির হয় তাহা হইতে জানা যায়—

প্রথম দিবস—বৃহস্পতিবার ৩০ মাঘ (১১ ফেব্রুয়ারী)। রাজা কমলকৃষ্ণ বাহাদুরের সভাপতিত্বে জাতীয় সভার সাম্বৎসরিক উৎসব। পূর্ব্ববৎসরের সাহিত্য, বিজ্ঞান, শিল্প, বাণিজ্য প্রভৃতি বিষয়ে রাজনারায়ণ বসুর বক্তৃতা।

দ্বিতীয় দিবস—শুক্রবার ১ ফাল্গুন। প্রথমতঃ জাতীয় বিদ্যালয়ের ছাত্রদিগকে পারিতোষিক বিতরণ। পরে কিরূপে বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্যের উন্নতি হইতে পারে এই বিষয়ের আলোচনার্থ একটি সভা অনুষ্ঠান।

তৃতীয় দিবস—শনিবার ২ ফাল্গুন। সকল স্থানের ব্যায়াম-পারদর্শিগণের একযোগে ব্যায়াম প্রদর্শন। গভর্ণমেন্ট বিদ্যালয় অথবা স্বাধীন বিদ্যালয়, সকল স্থানের ছাত্রেরা ঐ ক্ষেত্রে ব্যায়াম-নৈপুণ্য প্রদর্শন করিতে পারিবেন। উৎকৃষ্ট ছাত্রগণকে পারিতোষিক প্রদান এবং ব্যায়ামকুশল ছাত্রগণের উৎসাহ-উদ্দীপনার্থ প্রসিদ্ধ র‍্যাঙ্গলার আনন্দমোহন বসু কর্ত্তৃক বক্তৃতাদান।

চতুর্থ দিবস—রবিবার ৩ ফাল্গুন। এই দিবস মেলার প্রধান দিবস। এই দিবস পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসরের মত বক্তৃতাপাঠ, কৃষি ও শিল্পজাত দ্রব্যাদি প্রদর্শন, ব্যায়াম, বাজি প্রভৃতি অনুষ্ঠান। অধ্যাপক

মৌলাবক্সের সঙ্গীত। অধিকন্তু এ বৎসর কলিকাতার নেপালী, পঞ্জাবী, হিন্দুস্থানী, মহারাষ্ট্রী প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর হিন্দুদিগকে একত্রিত করা হইবে। সকলে মিলিয়া হিন্দুসাধারণের সর্ব্বপ্রকার উন্নতির বিষয় কথোপকথন ও আলোচনা করিবেন।

পঞ্চম দিবস—সোমবার ৪ ফাল্গুন। এই দিবস মালী ও শিল্পীদিগকে পারিতোষিক প্রদানপূর্ব্বক মেলার কার্য্য সমাপন।

বিজ্ঞাপিত কার্য্যক্রম অনুসারে সব কাজ নির্ব্বাহিত হইয়াছিল কিনা জানা যায় না। তবে এবারকার অধিবেশনও সাড়ম্বরে অনুষ্ঠিত এবং কয়েকটি বিষয়ে বৈশিষ্ট্যপূর্ণ হইয়াছিল। 'অমৃতবাজার পত্রিকা' (১৪ ফেব্রুয়ারী ১৮৭৫) এ বিষয়ে লেখেন—

"গত মেলায় একটি মহৎ কার্য্যের অনুষ্ঠান হয়। যশোরান্তর্গত নড়ালের অন্যতম জমিদার বাবু রাইচরণ রায় তাঁহার বীরত্ব ও সাহসের জন্য মেলাকর্ত্তৃক সম্মানিত হন। রাইচরণ বাবু বাল্যকালাবধি ব্যায়াম চর্চ্চা করিয়া স্বহস্তে অন্যূন দেড়শত মনুষ্য হন্তা ব্যাঘ্র বধ করিয়াছেন। তিনি পূর্ব্বে তরোয়ার দিয়া সম্মুখ যুদ্ধে ব্যাঘ্র বধ করিতেন,...রাইচরণ বাবুর এই বাঙ্গালীদুর্লভ বীরত্ব ও সাহসের জন্য হিন্দুমেলার কর্ত্তৃপক্ষগণ তাঁহাকে একটি স্বর্ণ মেডেল প্রদান করেন।

"হিন্দু মেলার সংসৃষ্ট জাতীয় সভা কর্ত্তৃক প্রথম এদেশে ছাত্রদিগের মধ্যে ব্যায়াম চর্চ্চার সূত্রপাত হয়। এইক্ষণ স্কুল কলেজ যেখানে যেখানে গবর্ণমেন্ট কর্ত্তৃক ব্যায়াম শিক্ষার শ্রেণী খোলা হইয়াছে, তথাকার প্রায় সকল ব্যায়াম শিক্ষকগণ জাতীয় সভার বিদ্যালয়ের ছাত্র। এমন কি জাতীয় সভা দ্বারা পূর্ব্বে ছাত্র সকল শিক্ষিত না হইলে গবর্ণমেণ্টের ব্যায়াম শ্রেণী সকল শিক্ষকাভাবে আদৌ প্রতিষ্ঠিত হইত না। হিন্দু মেলার দ্বারা দেশের এই একটি প্রত্যক্ষ মহদুপকার সাধন হইয়াছে। জাতীয় সভায় ব্যায়াম বিদ্যালয়ের ছাত্রগণের ব্যায়াম কৌশল আমরা সেদিন প্রত্যক্ষ করিলাম। প্রসিদ্ধ ডাক্তার পরলোকগত বাবু দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের একটি পুত্র (সুবিখ্যাত ক্যাপ্টেন জিতেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়) অসীম শক্তিধর পুরুষ হইয়া উঠিয়াছেন। আমরা দেখিলাম তিনি অর্দ্ধমণ ওজনের একটি প্রকাণ্ড লৌহপিণ্ড ঊর্দ্ধে নিক্ষিপ্ত করিয়া অবলীলাক্রমে বাহুদ্বয়ের মাংসপেশীর উপর বারম্বার ধারণ করিতে লাগিলেন। যে অনুষ্ঠান দ্বারা এইরূপ বিষয় সকল প্রত্যক্ষ করা যাইতে পারে তাহা হিন্দু মাত্রেরই আদরের ধন হওয়া উচিত।"

বিখ্যাত গায়ক অধ্যাপক মৌলাবক্সের উল্লেখ আমরা পাইয়াছি। তিনিও সঙ্গীতনৈপুণ্যের জন্য একটি সুবর্ণপদক প্রাপ্ত হন। রাজনারায়ণ বসু লিখিয়াছেন—

"১৮৭৫ সালে যে মেলা হয় তাহার সভাপতির কার্য্য আমি সম্পাদন করি।...এই মেলা উপলক্ষে বরদাবাসী সুবিখ্যাত মৌলাবক্সের[১] গান হয় এবং যশোহরের নড়ালনিবাসী জমিদার

১. মৌলাবক্স সম্বন্ধে 'সুলভ সমাচার' (৭ই মাঘ ১২৮১) লেখেন—

"মৌলাবক্স খাঁ নামে একজন সঙ্গীতের অধ্যাপক কিছুদিন হইল কলিকাতায় আসিয়াছেন। ইঁহার আদি নিবাস মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সিতে, এক্ষণে বরদার মহারাজার রাজ্যে অধিবাস করেন। সঙ্গীতে ইঁহার বিদ্যাবুদ্ধি দেখিয়া সকলেই সুখ্যাতি করিতেছে। বাস্তবিক ইনি গান বাদ্যের বিদ্যাকে গুলিয়া খাইয়াছেন। তিনি সঙ্গীত বিদ্যা সম্বন্ধে সে সকল কথা বলেন, আমরা তাহা সংক্ষেপে লিখিতেছি। তিনি বলেন—মূল

রাইচরণ রায় ব্যাঘ্র শিকারে নৈপুণ্য জন্য এক স্বর্ণ পদক প্রাপ্ত হয়েন। আমি সভাপতিরূপে ঐ পদক তাঁহার গলায় পরাইয়া দিই। মৌলাবক্স তাঁহার সঙ্গীত ক্ষমতা দেখাইয়া সকলকে মুগ্ধ করিয়াছিলেন।"

এবারকার অধিবেশনের আর একটি বিষয়ও বিশেষ স্মরণীয়। এবারেই সর্ব্বপ্রথম কিশোর রবীন্দ্রনাথ (রবীন্দ্রনাথ তখন চতুর্দ্দশবর্ষীয় বালক) সাধারণ সমক্ষে দাঁড়াইয়া "হিন্দুমেলায় উপহার" শীর্ষক স্বরচিত একটি কবিতা আবৃত্তি করেন। *The Indian Daily News* (১৫ ফেব্রুয়ারী ১৮৭৫) লেখেন—

Babu Robindra Nath Tagore, the youngest son of Baboo Debendra Nath Tagore, a handsome lad of some 15, had composed a Bengali poem on Bharat (India) which he delivered from memory; the suavity of his tone much pleased his audience.

রবীন্দ্রনাথের এই কবিতাটি পরবর্ত্তী ২৫ ফেব্রুয়ারী তারিখের 'অমৃতবাজার পত্রিকা'য় প্রকাশিত হয়।

সঙ্গীত বিদ্যা হিন্দুদিগের। হিন্দু রাজাদের সময়ে সঙ্গীতের বিশেষ আলোচনা হইয়াছিল, তখন সঙ্গীত মুখে মুখে শিখিতে হইত না, সঙ্গীতের শাস্ত্র ছিল তাহাতে গানের অক্ষর মাত্রা তান লয় লিখিত থাকিত। সঙ্গীত বিদ্যা যে হিন্দুদিগের তাহাতে সন্দেহ মাত্র নাই, গানের রাগিণী সকলের নামই তাহার প্রমাণ (যথা ভৈরব, ভৈরবী ইত্যাদি)। হিন্দুদিগের সঙ্গীত দেবতাদিগের স্তব স্তুতিপূর্ণ ছিল, তাহাতে ধর্ম্মসাধনের সুবিধা হইত।...

"মৌলাবক্স খাঁ বলেন তিনি ইংরাজদের ন্যায় পঞ্চাশ হাজার লোককে একসঙ্গে গান করাইতে পারেন। ইংরাজদের রীতি এবং আমাদের দেশের রীতি একত্র করিয়া সঙ্গীতশাস্ত্র প্রস্তুত করিলে ঐকতান গান অনায়াসে প্রচলিত হইতে পারে।"

দশম অধিবেশন, ১৮৭৬

জাতীয় মেলার নবম ও দশম অধিবেশনের মধ্যবর্ত্তী এক বৎসর বাঙালীর জাতীয় ইতিহাসে বিশেষ স্মরণীয়। আনন্দমোহন বসুর স্টুডেন্টস্ অ্যাসোসিয়েশন বা ছাত্রসভায় দেশপূজ্য সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় নব্য ইটালী, ম্যাটসিনি, শিখশক্তির অভ্যুদয় প্রভৃতি শীর্ষক যে-সব বক্তৃতা প্রদান করিয়াছিলেন তাহাতে বঙ্গের যুবক-সমাজ একেবারে যেন মাতিয়া উঠিয়াছিল। শিশিরকুমার ঘোষ, আনন্দমোহন বসু প্রমুখ দেশের চিন্তাশীল নেতৃবর্গ সাধারণ শিক্ষিতের অধিগম্য একটি রাষ্ট্রীয় সভা প্রতিষ্ঠায়ও তৎপর হইয়াছিলেন। তাঁহাদের ঐকান্তিক চেষ্টার ফলে ১৮৭৫ সালের ২৫শে সেপ্টেম্বর 'ইণ্ডিয়ান লীগ' নামে একটি সর্ব্বসাধারণের রাজনৈতিক সভা গঠিত হইল। জাতীয় মেলা যে-সব উদ্দেশ্য সাধনে এতদিন তৎপর ছিলেন তাহাও এই সভার কর্ত্তব্য মধ্যে গণ্য হইল। ইহার প্রধান অনুষ্ঠাতা নবগোপাল মিত্রও এই সভার কর্ম্মকর্ত্তৃসভায় স্থানলাভ করিলেন। জাতীয় মেলা একাকী যে-সব কার্য্য করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন, এতদিনে সাহিত্য, নাটক, কাব্য, পুস্তক, পত্রিকা, সংবাদপত্র, রঙ্গমঞ্চ এবং ইণ্ডিয়ান লীগের মত রাষ্ট্রীয় সভার মধ্য দিয়া তাহা বস্তুগত হইবার অবকাশ পাইল। যাহা হউক, ইহার পরও জাতীয় মেলার বার্ষিক অধিবেশন হইতে লাগিল। জাতীয় মেলার দশম অধিবেশন হইল ১৮৭৬ সালের ১৯ শে ও ২০ শে ফেব্রুয়ারী রাজা বদনচাঁদের টালা-উদ্যানে। এবারে দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর মূল সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। 'সোমপ্রকাশ' (২৮ ফেব্রুয়ারী ১৮৭৬) বলেন, "এ বৎসর হিন্দু মেলায় আন্দুল নিবাসী বাবু গিরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় একটি অক্ষর নির্ম্মাণের ও কাগজ প্রস্তুত করিবার কল প্রদর্শন করেন।" কবি ও সাহিত্যিক বিহারীলাল সরকার অধিবেশনে কবিতা পাঠ করিয়াছিলেন। ২৭ ফেব্রুয়ারী ১৮৭৬ দিবসীয় 'সাধারণী'তে এই অধিবেশনের একটি বিস্তৃত বিবরণ প্রকাশিত হয়। তাহা এখানে মুদ্রিত হইল—

"গত শনি ও রবিবার টালার জলের কলের সন্নিকটস্থ রাজা বদনচাঁদের বাগানে হিন্দুমেলা হইয়া গিয়াছে। প্রথম দিবস দেশীয় স্ত্রীলোকগণের শিক্ষা কৌশল পরিচায়ক কার্পেটের জুতা, টুপী, আসন, ছবি প্রভৃতি প্রদর্শিত হইয়াছিল। এই সকলের মধ্যে ক্ষীরোদমোহিনী নামাঙ্কিত কার্পেটের সূচিকার্য্য দেখিতে সুন্দর ও পরিপাটী হইয়াছিল। দুটি বালিকা বিদ্যালয় হইতে দুটি করিয়া চারিটি বালিকা আসিয়া সভাসমক্ষে স্ব স্ব রচিত প্রবন্ধ পাঠ করে।[১] সভাপতি বাবু দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর উক্ত বালিকা চতুষ্টয় ও সাধারণ বালিকা বিদ্যালয় সমূহের শিক্ষক ও অধ্যক্ষগণকে সভাসমক্ষে অনুরোধ

১. অবলা বসু মহোদয়া আমাকে এই মর্ম্মে বলেন যে, ছাত্রাবস্থায় তদীয় শিক্ষক দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায় একবার তাঁহাকে লইয়া হিন্দুমেলায় যান এবং তাঁহারই নির্দ্দেশে তিনি একটি কবিতা আবৃত্তি করেন। তিনি স্মৃতি হইতে এইরূপ বলিয়াছিলেন। এখানে প্রবন্ধ পাঠের বিষয় জানা যাইতেছে। অবলা বসু হয়ত প্রবন্ধও পাঠ করিয়া থাকিবেন।—লেখক।

করেন, যেন বিদ্যা শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে বালিকারা জাতীয় ভাব রক্ষা করিতে শিক্ষা করে। জাতীয় ভাব কাহাকে বলে, জাতীয় ভাব কি, বালিকাগণের দূরে থাকুক, উপস্থিত সভ্যগণেরও হৃদয়ঙ্গম করিতে দ্বিজেন্দ্র বাবু সক্ষম হইয়াছিলেন কিনা, সন্দেহ। জাতীয় ভাব যদি বাঙ্গালী অত শীঘ্র বুঝিতে পারিবে ত ভাবনা কি? মধ্যে মধ্যে সঙ্গীত ও বাদ্য হইয়াছিল। বিকালে ব্যায়াম পরীক্ষা হয়।

"শনিবার মেলার উদ্যোগপর্ব্ব, রবিবারেই মেলার দিন। প্রাতঃকালে বাছখেলা হইয়াছিল, দশ বারখানা নৌকা সমবেত হইয়াছিল, কোন্নগর ও দক্ষিণেশ্বরের নৌকাই বাছখেলায় এককালে গঙ্গার অপর পার হইতে চিৎপুরে কালী সিংহের ঘাটে উপস্থিত হয়। এই দুই নৌকাই পুরস্কার পাইবে স্থির হইল। উক্ত দিবসে নানাবিধ কৃষিজাত সংগৃহীত হইয়াছিল। অকালের কয়েকটি ফল ব্যতীত কৃষিজাতের মধ্যে মেলার উপযোগী কত পদার্থ দেখিলাম না। উদ্যানজাত গুটিকত ফুলগাছ দেখিতে বড়ই সুন্দর হইয়াছিল। এই দিবস প্রকৃত পক্ষে একটি সভা হইয়াছিল। বাবু দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর সভাপতির আসন পরিগ্রহ করেন। সভাস্থলে ন্যূনাধিক একশত ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। প্রথমতঃ কতকগুলি পদ্য পঠিত হয়। পদ্যগুলির সমুদয়ই স্বদেশহিতৈষিতার উচ্ছ্বাসে পরিপূর্ণ।

"একটি অল্প বয়স্ক বালক যেরূপ দুঃখ ও অভিমান ভরে একটি পদ্যের আবৃত্তি করেন, তাহাতে সকলেই স্তব্ধ ও সাশ্রুনয়ন হইয়াছিল। সকলেরই শিরার উপর শোণিতের সঞ্চরণ অনুভূত হইয়াছিল। এ সকল পদ্য শুনিয়া ভারতমাতার পূর্ব্ব সৌভাগ্য ও ইদানীন্তন হতশ্রী—উজ্জ্বল ভাবে সকলের মনে চিত্রিত হইয়াছিল। সকলেই বুঝিয়াছিলেন যে, তাঁহারা মহদ্বংশজাত, তাঁহাদের পূর্ব্বপুরুষগণ মহাপুরুষ ছিলেন এবং এক্ষণে তাঁহারা বীর্য্যশূন্য হইয়াছেন। সকলেরই কর্ত্তব্যজ্ঞান, স্বভাবতঃ সেই সময় জাগরূক হইয়াছিল। ইহার পর বাবু মনোমোহন বসু একটি সুদীর্ঘ বক্তৃতা করেন। দুই এক গ্রাম্য অলঙ্কার ব্যতীত বক্তৃতাটি মধুরতাময়, উপদেশপূর্ণ এবং হৃদয়গ্রাহী হইয়াছিল। ইনি হিন্দু মেলার প্রধান উদ্দেশ্য সুন্দররূপে প্রতিপন্ন করিয়াছিলেন। শিক্ষা এবং স্বাবলম্বনই মেলার প্রধান উদ্দেশ্য। সুন্দর সুন্দর কৃষিজাত প্রদর্শন করিবার নিমিত্ত কৃষকগণকে আহ্বান করিয়া উপযুক্ত মত পুরস্কার প্রদান করিলে, কৃষি বিদ্যায় দেশীয় লোকের বিশেষ যত্ন জন্মাইতে পারে। একটি সূতার কল মেলায় আনীত হইয়াছিল। উহাতে অল্পায়াসে অধিক পরিমাণ সূতা অল্প সময়ের মধ্যে প্রস্তুত হইতে পারে। গত বৎসর সীতানাথ বাবু একটি কাপড়ের কল প্রস্তুত করিয়াছেন। এটি গোরু, মহিষ, বাষ্প কিম্বা মনুষ্য দ্বারা (চালিত) হইতে পারে। একজন লোক একদমে এই কল দ্বারা বিশ হাত কাপড় বুনিতে পারে। কলটি মেলায় প্রদর্শিত হয় নাই, কিন্তু উক্ত কলের কাপড় দেখা গিয়াছিল। বস্ত্র তাদৃশ পরিষ্কৃত নহে, কিন্তু এই প্রথম উদ্যম, ভবিষ্যতে কাপড় ম্যানচেষ্টারের মত হইতে পারে। মনোমোহন বাবু এই দুই বিষয়ের উল্লেখ করিয়া মেলার উদ্দেশ্য সকল প্রতিপন্ন করিলেন। যাহাতে এদেশ কোন বিষয়ে অন্য দেশের মুখাপেক্ষা না করে অর্থাৎ যাহাতে আমাদের দেশে স্বাবলম্বন জন্মে, এই বিষয় বলিতে গিয়া মনোমোহন বাবু এই নির্দ্দেশ করেন, যে প্রকৃত দেশহিতৈষী আমাদের মধ্যে নাই। উন্নতির যে যে উপকরণ প্রয়োজনীয়, ভারতে সে সমুদয়ই আছে, একজন মনের মত দেশহিতৈষী নাই। যাঁহারা হিতৈষী বলিয়া সর্ব্বত্র পরিচিত, দেশহিতৈষী বলিয়া ভারতের এক প্রান্ত হইতে অন্য প্রান্ত যাঁহাদিগের নাম শুনিতে পাওয়া যায়, তাঁহাদের মধ্যে অধিকাংশই রায় বাহাদুর রাজা বাহাদুর দেশহিতৈষী, স্বার্থপর দেশহিতৈষী। অবশেষে মনোমোহন বাবু উপস্থিত সভ্যমণ্ডলীকে

শিল্পচর্চ্চা করিতে অনুরোধ করেন। ইদানীং ভারতবর্ষের বিশেষতঃ বঙ্গদেশের মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের অবস্থা দিন দিন অতি মন্দ হইতেছে। দেশের ভাল মন্দ অবস্থা এই মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের উপর সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করে সুতরাং যাহাতে অস্মদ্দেশীয় মধ্যবিত্তগণের অবস্থা উন্নত হয়, এরূপ কোন উপায় বিধান করা আদৌ কর্ত্তব্য। মনোমোহন বাবুর মতে এদেশে শিল্পচর্চ্চা বৃদ্ধি হইলে, এ দেশের লোক স্বাবলম্বন শিক্ষা করিলেই মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের অবস্থা ভাল হইবে এবং তাহার সঙ্গে সঙ্গে দেশের উন্নতি হইবে। এই মর্ম্মে মনোমোহন বাবু বক্তৃতা শেষ করিলে, বাবু নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় জাতি চরিত্র বিষয়ক একটি সুন্দর বক্তৃতা করেন। বিজাতীয়গণ বিশেষতঃ ইংরাজগণ সভাস্থলে সংবাদপত্রে এবং পুস্তকে বাঙ্গালী চরিত্রে অনেক দোষারোপ করেন এবং সেইরূপ দোষারোপ যে অন্যায়, নগেন্দ্র বাবু সুন্দররূপে তাহা প্রতিপন্ন করিলেন। পূর্ব্বকালের ভারতবর্ষীয়গণ সত্যবাদী ও সত্যপ্রিয়, ইহার প্রমাণ নগেন্দ্র বাবু, আয়িরান ও হিউন স্যাংয়ের নাম করিয়া বলিলেন যে, এই উভয় পর্য্যটকই স্ব স্ব প্রণীত পুস্তকে ভারতবাসীরা সত্যপ্রিয়, তাহাদের মধ্যে প্রবঞ্চক নাই, স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। পরে নগেন্দ্র বাবু ইংরাজগণের চরিত্র যে পবিত্র নহে, ইহা ম্যাটজিনি, বকল, হামিল্টন, হ্যালাম প্রভৃতির লিখিত গ্রন্থ হইতে ইংরাজের দোষ বর্ণনা করিয়া সপ্রমাণ করিলেন। আমাদের জাতীয় চরিত্র ভাল, ইহা প্রমাণ করিবার উদ্দেশ্য কি? নগেন্দ্র বাবু বলিলেন, ইহাতে আত্মগৌরব বাড়ে এবং আত্মগৌরব শুভ সাধক ইহা বলা বাহুল্য। অবশেষে সভাপতি বালকগণের পদ্যে উৎসাহ, মনোমোহন বাবুর বক্তৃতায় কর্ম্ম এবং নগেন্দ্র বাবুর বক্তৃতায় ধর্ম্ম বিষয়ে সভ্যগণ শিক্ষালাভ করিল, ইহা বুঝাইয়া দিলেন। ইহার পর সভা ভঙ্গ হইল।

"পরে উদ্যানের স্থানে স্থানে বাজি, কুস্তী, লাঠিখেলা, সঙ্গীত, বাদ্য ও ব্যায়াম হইতে লাগিল। সন্ধ্যার সময় আতশবাজী পুড়িল। এই সকল অতিশয় আনন্দদায়ক হইয়াছিল। বস্তুতঃ হিন্দু মেলা একেবারে নির্জ্জীব, একথা আমরা বলি না, ইহা দ্বারা নানাবিধ শুভ সাধিত হইতেছে, কিন্তু আকারানুরূপ মঙ্গল দেখি না। সাধারণের ইহার প্রতি তাদৃশ যত্ন নাই, ইহা সামান্য ক্ষোভের বিষয় নহে।"

এই অধিবেশনের সময় বাঙালী যুবকদের সঙ্গে ফিরিঙ্গীদের একটা সংঘর্ষ হয়। বিপিনচন্দ্র পাল নবগোপাল মিত্রের জাতীয় ব্যায়ামশালার ছাত্র ছিলেন। তিনি এ বৎসর জাতীয় মেলায় যোগ দেন। সংঘর্ষে বিপিনচন্দ্র পাল, জিতেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, সুন্দরীমোহন দাস প্রভৃতি যুবকবৃন্দ লিপ্ত ছিলেন। বিপিনচন্দ্র পুলিস কর্তৃক ধৃত হন এবং বিচারে তাঁহার কুড়ি টাকা জরিমানা হয়। বিপিনচন্দ্র তাঁহার নবযুগের বাংলা গ্রন্থে ও আত্মজীবনীতে এ সম্বন্ধে বিশদ বর্ণনা দিয়াছেন।

বাঙালী এককালে অঙ্গচালনায় বিশেষ পারদর্শী ছিল। তাহার তেজবীর্য্যও বহু ক্ষেত্রে প্রকাশ পাইত। কিন্তু পাশ্চাত্য শিক্ষার আওতায় এবং অধিক পরিমাণে শাসন-নীতিবৈগুণ্যে তাহার শক্তিচর্চ্চায় ভাটা পড়িয়া যায়। বাঙালী যুবকদের মধ্যে শরীরচর্চ্চার উৎকর্ষ সাধন হিন্দু মেলার কর্ত্তৃপক্ষ একটি বিশেষ কর্ত্তব্য বলিয়া গণ্য করিয়াছিলেন। নবগোপাল মিত্রের উৎসাহে জাতীয় ব্যায়ামাগার ব্যতীত আরও বহু ব্যায়াম বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। হিন্দু মেলার সাধারণ অধিবেশনে যুবকদের মধ্যে ব্যায়ামের প্রতিযোগিতা হইত। যাঁহারা উৎকৃষ্ট বলিয়া বিবেচিত হইতেন তাঁহাদের হিন্দু মেলা নামাঙ্কিত পদক দেওয়ার রীতি ছিল।

ব্যায়ামকুশলী অন্নদাপ্রসাদ মিত্র ১৭৯৭ শকাব্দে এই পদক পান। সাধারণের কৌতূহল নিবৃত্তির জন্য অন্নদাপ্রসাদের যথাসামান্য পরিচয় এখানে দেওয়া গেল। অন্নদাপ্রসাদের আদিনিবাস হাওড়া জেলার অন্তর্গত বাঁকুল গ্রামে। তিনি দরিদ্রের সন্তান ছিলেন, কিন্তু অল্প বয়সেই অতিশয় সাহসী বলিয়া পরিচিত হন। ডন কুস্তি ব্যায়াম সন্তরণ প্রভৃতিতে তিনি সুপটু ছিলেন। তাঁহার জন্ম ১২৬৭ বঙ্গাব্দের ১ মাঘ। সুতরাং পদক প্রাপ্তিকালে ১৭৯৭ শক বা ইংরেজী ১৮৭৬ সনে তিনি পঞ্চদশ বৎসর বয়স্ক যুবক। তিনি বাংলার বাহিরে সুদূর পঞ্জাব পর্য্যন্ত গমন করেন। পরে কলিকাতায় ফিরিয়া তাঁহার ব্যবসায়ে লিপ্ত হন। বর্ত্তমান এম. এল. বসু কোম্পানী নামক শিল্প প্রতিষ্ঠান তাঁহার চেষ্টায় গড়িয়া উঠে। অন্নদাপ্রসাদ মিত্র রাশ নাম, পরবর্ত্তীকালে তিনি 'রাখালচন্দ্র মিত্র' নামে পরিচিত হন।

হিন্দু মেলার উদ্দেশ্য ও আদর্শ বাংলার বিভিন্ন অনুষ্ঠান প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ক্রমশঃ ব্যাপ্তিলাভ করে। ব্যায়াম বিদ্যালয়ও নানা স্থানে প্রতিষ্ঠিত হইতে থাকে। একটি ব্যায়াম বিদ্যালয়ের কথা 'সংবাদ প্রভাকর' ১৮৭৮ খ্রীষ্টাব্দের ৩০ শে ডিসেম্বর তারিখে এইরূপ লেখেন—

"বঙ্গযুবকদিগের বলোৎকর্ষসাধন বিদ্যালয়। কয়েক দিবস অতীত হইল, আমরা প্রভাকরে প্রকাশ করিয়াছি যে, আপার সারকিউলার রোডে বঙ্গীয় যুবকদিগের বলোৎকর্ষসাধন জন্য একটি নূতন বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইতেছে। গত বুধবার ২৫ শে ডিসেম্বর বৈকালে সেই বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা কার্য্য সমাধা হইয়াছে। তৎকালে রেভারেণ্ড ম্যাকডনাল্ড, বিবি ম্যাকডনাল্ড, ডাক্তার কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, বাবু কেশবচন্দ্র সেন, বাবু সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ঢাকায় জমিদারবাবু শ্রীব্রজেন্দ্রকুমার রায়চৌধুরী, বাবু কালীচরণ সোম এবং বাবু লোকনাথ মৈত্র প্রভৃতি অনেকগুলি সম্ভ্রান্ত লোক তথায় উপস্থিত ছিলেন। বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা ঘোষিত হইলে বিদ্যালয়ের ব্যায়াম বিভাগের শিক্ষক বাবু হরিচরণ মুখোপাধ্যায় বিশেষ দক্ষতার সহিত কতিপয় ব্যায়াম প্রদর্শন করিয়া সকলকে মুগ্ধ করেন। পরে সমবেত ছাত্রবৃন্দ ক্রিকেট, ব্যাডমিন্টন প্রভৃতি ক্রীড়ায় নিযুক্ত হন। সন্ধ্যার প্রাক্কালে বিদ্যালয়ের কার্য্য সমাপ্ত হয়।"

একাদশ অধিবেশন, ১৮৭৭

জাতীয় মেলার এ অধিবেশনেও পূর্ব্ব পূর্ব্ব বারের রীতি অনুসৃত হইয়াছিল। এবারকার অধিবেশন বিশেষ সাফল্যমণ্ডিত হয় নাই বলিয়া দুঃখ করিয়া 'সাধারণী'তে (৪ মার্চ্চ ১৮৭৭) এক ব্যক্তি লেখেন—

"দেখিবার মধ্যে একটি কাপড়ের কল, দেশীয় দেশলাই (match box) কালি, এবং সাবান দেখিলাম।...কি করিয়া 'মিরার' সম্পাদক মেলার কৃতকার্য্যতা স্বীকার করিয়াছেন জানি না,...।"

কিন্তু এবারকার মেলা যে একেবারে ব্যর্থ হয় নাই তাহা এই লেখকের লেখা হইতেই জানা যাইতেছে। সপ্তদশবর্ষীয় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সদ্যগত দিল্লীর দরবার[১] সম্পর্কে? স্বরচিত যে কবিতাটি আবৃত্তি করিয়াছিলেন তাহা উপস্থিত সকলেরই চিত্তহারী হইয়াছিল। এই লেখকই বলিতেছেন—

"আমরা নিরাশ মনে নবগোপাল বাবুকে অভিসম্পাত করিয়া ফিরিয়া আসিতেছিলাম, এমন সময়ে মহর্ষি দেবেন্দ্র বাবুর পুত্র জ্যোতিরিন্দ্র এবং রবীন্দ্রের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়। রবীন্দ্র বাবু 'দিল্লীর দরবার' সম্পর্কে একটি কবিতা এবং একটি গীত রচনা করিয়াছিলেন। আমরা একটি প্রকাণ্ড বৃক্ষ ছায়ায় দুর্ব্বাসনে উপবিষ্ট হইয়া তাঁহার কবিতা এবং গীতটি শ্রবণ করি। রবীন্দ্র এখনও বালক, তাঁহার বয়স ষোল কি সতর বৎসরের অধিক হয় নাই। তথাপি তাঁহার কবিত্বে আমরা বিস্মিত এবং আর্দ্রিত হইয়াছিলাম, তাঁহার সুকুমার কণ্ঠের আবৃত্তির মাধুর্য্যে আমরা বিমোহিত হইয়াছিলাম। যখন দেখিলাম যে বঙ্গের একটি সুকুমারমতি শিশু ভারতের জন্য এরূপ রোদন করিতেছে, যখন দেখিলাম যে তাহার কোমল হৃদয় পর্য্যন্ত ভারতের অধঃপতনে ব্যথিত হইয়াছে, তখন আশাতে আমাদের হৃদয় পরিপূর্ণ হইল। তখন ইচ্ছা হইল রবীন্দ্রের গলা ধরিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলি—আয় ভাই 'আমরা গাইব অন্য গান।' একজন সুপরিচিত কবিও সেখানে উপস্থিত ছিলেন, তিনি দ্রবিত হৃদয়ে বলিলেন যখন এই কবি প্রস্ফুটিত কুসুমে পরিণত হইবে, তখন দুঃখিনী বঙ্গের একটি অমূল্য রত্ন লাভ হইবে।"

এই সুপরিচিত কবি আর কেহই নহেন, "পলাশির যুদ্ধে"র কবি নবীনচন্দ্র সেন। নবীনচন্দ্র 'আমার জীবনে'[২] এ সম্পর্কে লিখিয়াছেন—

"স্মরণ হয় ১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দে[৩] আমি কলিকাতায় ছুটিতে থাকিবার সময়ে কলিকাতার উপনগরস্থ কোনও উদ্যানে 'নেশনাল মেলা' দেখিতে গিয়াছিলাম।...একজন সদ্য-পরিচিত বন্ধু

১. পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য।

২. চতুর্থ ভাগ, পৃ. ২৬৪।

৩. ইহা ঠিক নহে, ১৮৭৭ খ্রীষ্টাব্দ হইবে।

মেলার ভিড়ে আমাকে 'পাকড়াও' করিয়া বলিলেন যে একটি লোক আমার সঙ্গে পরিচিত হইতে চাহিতেছেন। তিনি আমার হাত ধরিয়া উদ্যানের এক কোণার এক প্রকাণ্ড বৃক্ষ তলায় লইয়া গেলেন, দেখিলাম সেখানে সাদা ঢিলা ইজার চাপকান পরিহিত একটি সুন্দর নবযুবক দাঁড়াইয়া আছেন। বয়স ১৮।১৯, শান্ত স্থির। বৃক্ষ তলায় যেন একটি স্বর্ণ মূর্ত্তি স্থাপিত হইয়াছে। বন্ধু বলিলেন—'ইনি মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কনিষ্ঠ পুত্র রবীন্দ্রনাথ।' তাঁহার জ্যেষ্ঠ জ্যোতিরিন্দ্রনাথ প্রেসিডেন্সী কলেজে আমার সহপাঠী ছিলেন। দেখিলাম সেই রূপ, সেই পোষাক, সহাসি-মুখে করমর্দ্দন কার্য্যটি শেষ হইলে, তিনি পকেট হইতে একটি 'নোটবুক' বাহির করিয়া কয়েকটি গীত গাহিলেন, ও কয়েকটি কবিতা গীতকণ্ঠে পাঠ করিলেন। মধুরকামিনী-লাঞ্ছন কণ্ঠে, এবং কবিতায় মাধুর্য্যে ও স্ফুটোন্মুখ প্রতিভায় আমি মুগ্ধ হইলাম।"

'সাধারণী'র উক্ত লেখক এ বৎসরকার অধিবেশন সম্বন্ধে নিজ মত ব্যক্ত করিয়া সর্ব্বশেষে লেখেন—

"উপসংহারকালে আমরা নবগোপাল বাবুকে জিজ্ঞাসা করি এই জাতীয় মেলার উদ্দেশ্য কি? শুনিতে পাইতেছি, 'ইন্ডিয়ান লীগ' ও নব প্রসূত 'ইন্ডিয়ান এ্যাসোসিয়েশন' একাঙ্গে পরিণত হইবার কথা হইতেছে, যদি তাহা হয় তবে এই মেলা সম্বন্ধে আমাদের কয়েকটি প্রস্তাব করিবার ইচ্ছা রহিল।"

এই লেখকের লিখিবার ধরণ হইতে বুঝা যাইতেছে যে, ইণ্ডিয়ান লীগ ও ইণ্ডিয়ান এ্যাসোসিয়েশন প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় জাতীয় মেলার স্বতন্ত্র অস্তিত্ব বজায় রাখিবার আর সার্থকতা নাই, কেননা ইহার উদ্দেশ্য ঐ দুই প্রতিষ্ঠানের মধ্যেই ভুক্ত হইয়া গিয়াছে।

পরবর্ত্তী অধিবেশনসমূহ

দ্বাদশ অধিবেশন (১৮৭৮) হইতে জাতীয় মেলা মাঘ-সংক্রান্তির পরিবর্ত্তে সরস্বতী পূজার সময় হইতে থাকে। এবারে মেলা বিশেষ আড়ম্বরের সহিত সম্পন্ন হইয়াছিল বলিয়া মনে হয় না। কারণ এ সময়কার যে-সকল পত্রিকা দেখিবার সুযোগ ঘটিয়াছে তাহাতে এ সম্পর্কে বিশেষ কোন বিবরণ পাই নাই। ১৮৭৮, ১৭ই ফেব্রুয়ারি তারিখের 'সাধারণী'র সংবাদ-স্তম্ভে মেলা সম্বন্ধে এইরূপ বাহির হইয়াছে—

"নবগোপাল বাবুর হিন্দু মেলার এখন ক্রটি আছে। এখন যে সময় নির্দ্ধারণ করিয়াছেন, তাহা ঠিক হইয়াছে। কিন্তু যেরূপ স্থানে করিলে মেলায় অধিক লোকের সমাগম হইবে, তাহা নবগোপাল বাবু এখন ঠিক বুঝিতে পারেন নাই। হয় কলিকাতার মধ্য স্থলেই করিতে হইবে অথবা রেলওয়ে স্টেশনের ধারে কোন বর্দ্ধিষ্ণু নগরে বা গ্রামে করা চাই। এবার যেখানে হইয়াছে তাহা দুয়ের বাহিরে।...শিয়ালদহ স্টেশনের নিকটে করিলেই ভাল হইত। মেলায় দুই এক দিন সাধারণ লোকজনকে বিনা টিকিটে ছাড়িয়া দেওয়া চাই। রীতিমত পালোয়ানের কুস্তী হওয়া চাই। এমন কি ৪।৫ ঘণ্টা কুস্তী হইবে, ৫।৭ মিনিটের কুস্তী বিড়ম্বনা মাত্র। যদি সং রাখিতে হয়, ভাল কারিকর দিয়া সং গড়ান আবশ্যক। ভরসা করি নবগোপাল বাবু এই সকল পরামর্শে কর্ণপাত করিবেন। তিনি যে এতকাল হিন্দু মেলা জীবিত রাখিয়াছেন, আমরা তজ্জন্য তাঁহাকে ধন্যবাদ দি।"

চতুর্দ্দশ অধিবেশন সম্পর্কে 'সুলভ সমাচার' (১৪ই ফেব্রুয়ারি, ১৮৮০) দুঃখ করিয়া লেখেন—

"২৯ শে মাঘ হইতে রাজাবাজার ব্রজনাথ ধরের বাগানে হিন্দুমেলা আরম্ভ হইয়াছে, ইহার উন্নতি না হইয়া দিন দিন হ্রাস পাইতেছে। বাঙ্গালীর উৎসাহ খড়ের আগুন।"

যে যে উদ্দেশ্যে জাতীয় মেলা আবির্ভূত হইয়াছিল তাহা ব্যাপকতরভাবে সংসাধন জন্য সংস্কৃতি ও রাজনীতিমূলক নানা প্রতিষ্ঠান তখনই স্থাপিত হইয়াছিল। কাজেই ইহার অবনতি হইলেও দুঃখ করিবার কিছু নাই। কিন্তু সমসাময়িক লোকের নিকট ইহার হ্রাসপ্রাপ্তি স্বভাবতঃই আক্ষেপের কারণ হইয়াছিল। জাতীয় মেলার অধিবেশন কোন বৎসর হইতে বন্ধ হইয়া যায় তাহা এখনও জানিতে পারি নাই। পূর্ব্ব বৎসরে আগ্রহ উদ্দীপনা তেমন লক্ষিত হয় নাই বটে, কিন্তু দেখিতেছি পরবর্ত্তী ১৮৭৯ সনে মেলা সাড়ম্বরে অনুষ্ঠিত হইতেছে। এবারে মেলার অধিবেশন হয় রাজা বদনচাঁদের টালার উদ্যানে ১১ই হইতে ১৭ই ফেব্রুয়ারি পর্য্যন্ত। এবারকার একটি প্রধান লক্ষ্য করিবার বিষয় ছিল মূল অধিবেশন দিবসে (১৫ই ফেব্রুয়ারি) বিখ্যাত বিদুষী পণ্ডিত রমাবাঈর বক্তৃতা। 'সংবাদ প্রভাকর' এই অধিবেশন সম্পর্কে নিম্নরূপ বিবরণ লেখেন—

"হিন্দু মেলা। বিগত মাঘ সংক্রান্তির দিবস উক্ত জাতীয় মেলা টালার রাজা বদনচাঁদের উদ্যানে আরম্ভ হইয়া গত সোমবারে সমাপ্ত হইয়াছে। মেলার প্রথম দিন অর্থাৎ সংক্রান্তির দিবস

১ নং শঙ্কর ঘোষের লেনে নূতন কলেজিয়েট স্কুলবাটীতে খেলা সংক্রান্ত সাধারণ সভার অধিবেশন হয়। কলিকাতা নর্ম্ম্যাল স্কুলের প্রধান শিক্ষক বাবু গোপালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। বাবু চন্দ্রশেখর বসু হিন্দুধর্ম্মের সারবত্তা সম্বন্ধে এবং বাবু পদ্মনাভ ঘোষাল ভারতবর্ষের ইতিহাস নবীনরূপে লেখা আবশ্যক সম্বন্ধে এক বক্তৃতা করেন। বসুজ মহাশয়ের বক্তৃতা অনেকগুলি শাস্ত্রীয় প্রমাণযুক্ত। পদ্মনাভ বাবুর বক্তৃতা সারগর্ভ এবং মনোহর হইয়াছিল।

"মেলার দ্বিতীয় দিবস ১২ই ফেব্রুয়ারী বুধবার বৈকালে ন্যাসনাল স্কুলে নর্ম্মাল স্কুল, চাঁপাতলা স্কুল, এবং ন্যাসনাল স্কুলের ছাত্রগণ নানাবিধ ব্যায়াম প্রদর্শন করেন, দর্শকবৃন্দ এই ব্যায়ামাভিনয় দর্শনে পরমানন্দ প্রকাশ করিয়াছেন।

"তৃতীয় দিবস বৃহস্পতিবারে এক সভা হয়, এবং বাবু রাজনারায়ণ বসু সভাপতির আসন পরিগ্রহ করেন। মেলার সুযোগ্য সহ সম্পাদক বাবু নবগোপাল মিত্র ছাত্রবৃন্দকে লক্ষ্য করিয়া অনেকগুলি সারযুক্ত উক্তি দ্বারা নীতিগর্ভ উপদেশ দান করেন। পিতৃভক্তি, মনুষ্যত্ব এবং সাহস প্রকাশের উপায়, এবং রাজনীতি ও ধর্ম্ম সম্বন্ধে তর্কবাদ করা ছাত্রদিগের কর্ত্তব্য নহে, এই কয়টি বিষয় তিনি বিশেষরূপে বিবৃত করেন।

"চতুর্থ দিবস শুক্রবারে ১০নং কর্ণওয়ালিস স্ট্রিটে নবগোপাল বাবুর আবাসে জাতীয় সংগীত সমিতি হয়। শনিবার দিবসে কাশীপুরে কামানের কারখানার ঘাটের নিকট গঙ্গাবক্ষে ছাত্রদিগের বাচ খেলা হয়। ন্যাসনাল স্কুলের ছাত্রগণ তাহাতে জয়ী হন।

"মেলার প্রধান দিবস রবিবারে উপরোক্ত উদ্যানে পূর্ব্ব পূর্ব্ব বারের ন্যায় নানাবিধ প্রদর্শনী, ক্রীড়া, গীত, বাদ্য এবং অগ্নিক্রীড়া হইয়াছিল। সর্ব্বপ্রথমে বেলা সার্দ্ধ নবম ঘটিকার সময় ২১১ নং কর্ণওয়ালিস স্ট্রিট হইতে মহাসমারোহ মেলাস্থলে যাত্রারম্ভ হয়। পতাকা, আশাসোঁটা এবং জাতীয় কীর্ত্তন করিতে করিতে মেলার অনুষ্ঠাতা এবং হিতসাধকগণ বরাবর মেলাস্থলে গমন করেন। এতদ্দর্শনার্থ সহস্র সহস্র লোক রাজপথে সমবেত এবং অসংখ্য নরনারী নিজ নিজ বাটীর গবাক্ষাদি হইতে দেখিতে থাকেন। এ দৃশ্যটি পরম রমণীয় হইয়াছিল। মেলাস্থল নানাবিধ পতাকা, পত্র এবং পুষ্পাদিতে পরম রমণীয়রূপে শোভিত হইয়াছিল। দ্বারদেশে হিন্দু প্রথামত কদলী বৃক্ষাবলী রোপিত হইয়াছিল। মেলাস্থলে নানাপ্রকার ক্রীড়া এবং ব্যায়াম প্রদর্শিত হইয়াছিল। একজন বাঙ্গালীর সহিত একজন পঞ্জাবী পালোয়ানের কুস্তী হইয়াছিল। বাঙ্গালী জয়লাভ জন্য যথেষ্ট চেষ্টা করিলেও শেষে কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই, ইহা দুঃখের বিষয় নহে। গতবর্ষে বাঙ্গালী পঞ্জাবীকে হারাইয়াছিল, এবার বাঙ্গালী হারিল, তাহাতে দুঃখ কি? চেষ্টা করা হউক আগামীবর্ষে আবার পঞ্জাবী হারিতে পারে। ইতিহাস যে বাঙ্গালী ও পঞ্জাবীকে শৃগাল এবং সিংহরূপে প্রভেদ করিতেছে, সেই বাঙ্গালী যে এখন পঞ্জাবীর সহিত কুস্তী করিতে সমর্থ হইল, ইহাই প্রশংসার বিষয়। উক্ত কুস্তীর পর দেবী সিংহ এবং পালোয়ান সিংহ পরস্পর অর্দ্ধ ঘণ্টাকাল ধরিয়া কুস্তী করে, কিন্তু শেষ জয় পরাজয় ধার্য্য হয় না। কয়েকজন কর্ণাটী বিচিত্র ক্রীড়া করিয়া দর্শকদিগকে মুগ্ধ করিয়াছিল। পূর্ব্ব পূর্ব্ব বর্ষের ন্যায় বাঙ্গালী লাঠিয়ালগণও বিচিত্র শৌর্য্য প্রকাশ করিয়াছে।

"মেলাস্থলে নানাবিধ দ্রব্য প্রদর্শিত হইয়াছিল। সূচিকার্য্য, কারুকার্য্য, এবং নানা স্থানের বহুবিধ প্রস্তর ও মৃত্তিকার দ্রব্য প্রদর্শিত হইয়াছিল। বিখ্যাতা বিদুষী রমাবাঈ ভারতীয় ভাষা শিক্ষা আবশ্যক,

হিন্দুললনাদিগকে ধর্ম্ম শিক্ষা দেওয়া কর্ত্তব্য, এবং পুরাকালে আর্য্য নারীদিগের স্বাধীনতা সম্বন্ধে অনর্গল বক্তৃতা করেন, তাঁহার বক্তৃতা শ্রবণে দর্শক মাত্রেই বিমোহিত হইয়া তাঁহাকে অগণ্য ধন্যবাদ দান করেন। রজনীতে অগ্নিক্রীড়ার পর মেলা ভঙ্গ হয়। দিবাভাগে বৃষ্টি হওয়ায় আশামত লোক সমবেত হয় নাই। বলা বাহুল্য যে মেলার সুযোগ্য সম্পাদক বাবু দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং সহকারী সম্পাদক বাবু নবগোপাল মিত্রের যত্নে, শ্রমে, এবং অধ্যবসায়ে এই মেলা জাতীয় মান রক্ষা করিতেছে।"

দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর

জাতীয় মেলার তৃতীয় বৎসরে, ১৮৬৯ খ্রীষ্টাব্দের ১৬ই মে, মাত্র আটাশ বৎসর বয়সে সম্পাদক গণেন্দ্রনাথ ঠাকুরের মৃত্যু হয়। গণেন্দ্রনাথ বলিষ্ঠ, কর্ম্মিষ্ঠ, সংগঠনশক্তি সম্পন্ন ও সাহিত্যিক গুণপনাবিশিষ্ট ছিলেন। জাতীয় সঙ্গীত, ব্রহ্ম সঙ্গীত, বিক্রমোর্ব্বশী নাটকের অনুবাদ প্রভৃতি তৎ-রচিত যাহা কিছু প্রকাশিত হইয়াছে, সকলই তাঁহার সাহিত্যিক কৃতিত্বের পরিচায়ক। জোড়াসাঁকো ঠাকুর পরিবারে নাটক অভিনয়ের ব্যাপারেও তিনি অগ্রণী ছিলেন। সকল কার্য্যেই তিনি জ্যেষ্ঠতাত মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের আশীর্ব্বাদ লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার অকাল মৃত্যুতে জাতীয় মেলা বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হইল বটে, কিন্তু ইহার পর হইতে দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর মেলার কার্য্যে যেরূপ একনিষ্ঠভাবে ব্রতী হইলেন তাহাতে ইহার উত্তরোত্তর উন্নতিই হইতে লাগিল। গণেন্দ্রনাথের শূন্যপদে সম্পাদক নিযুক্ত হইয়াছিলেন দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও দেবেন্দ্রনাথ মল্লিক মহাশয়দ্বয়। জাতীয় মেলার প্রতিষ্ঠার সময় হইতে দ্বিজেন্দ্রনাথ নবগোপাল মিত্রের একজন প্রধান পরামর্শদাতা ছিলেন। পূর্ব্বে তাঁহার স্মৃতিকথা হইতে কিঞ্চিত উদ্ধৃত করিয়াছি। তিনি মেলার সঙ্গে কতখানি সূক্ষ্মভাবে যুক্ত ছিলেন, তাঁহার কথায় কিঞ্চিৎ বক্রোক্তি থাকিলেও, নিম্নের অংশ হইতে তাহা বিশেষরূপে জানা যায়—

"সে (নবগোপাল) একটা মেলা বসাইবার কথা বলিল,—তাঁতি, কামার, কুমোর ইত্যাদি লইয়া। আমি বলিলাম,—'ওসব তো দেশের সকলের জানা আছে; দেশী Painting দেখাতে পার?' সে এক Painter নিযুক্ত করিয়া ছবি আঁকাইল। মেলার ক্ষেত্রে গিয়া দেখি, প্রকাণ্ড ছবি। ব্রিটানীয়ার সম্মুখে ভারতবাসী হাতজোড় করিয়া বসিয়া আছে। আমি বলিলাম—'উল্টে রাখ উল্টে রাখ; এই তুমি দেশী Painting করাইয়াছ! আর আমাদের নেশন্যাল মেলায় এই ছবি রাখিয়াছ?' ছবিখানা সরাইয়া উল্টাইয়া রাখা হইল।...একটা নেশন্যাল কাগজ বাহির করিল, কিন্তু মোটেই সুপাঠ্য নয়।[১]

১. সুপাঠ্য না হইলেও স্বাজাত্যবোধের উন্মেষে 'নেশন্যাল পেপারে'র কৃতিত্ব যে অসামান্য ছিল সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। সপ্তম বর্ষপূর্ত্তি উপলক্ষ্যে এই পত্রিকা লেখেন—

It is a sufficient consolation to us to think that since we have begun our career, a great change has taken place in the minds of the educated youths of Bengal. The tide of denationalisation has sustained an ebb. A happy reaction has taken place in native feelings People have begun to disbelieve in the theory that for a nation's progress they have simply to learn the art of borrowing. They have firmly begun to believe in the doctrine that to secure everlasting good to themselves, they should have a basis of their own.

It is a still greater consolation to us to think that since we have begun our career, a great movement has found its footing here — we mean the great movement of the National Gathering, which has roused the sleeping energies of the people and stimulated their physical activity, which has afforded an impetus to the advancement of our national art and industry and which, should God grant it a long life, will doubtless bring an incalculable amount of good to our countrymen. —*The National Paper*, August 7, 1872.

কিন্তু নবগোপালের সময় থেকে এই নেশন্যাল কথাটা দাঁড়াইয়া গেল। নেশন্যাল সঙ্গীত রচনা হইতে আরম্ভ হইল।”[২]

দ্বিজেন্দ্রনাথও জাতীয় মেলা উপলক্ষ্য করিয়া নেশন্যাল বা জাতীয় সঙ্গীত রচনা করিলেন। তাঁহার একটি সঙ্গীত এখানে উদ্ধৃত করিলাম। ইহা জাতীয় মেলায় গীত হইয়াছিল বলিয়া মনে হয়—

মলিন মুখ-চন্দ্রমা, ভারত তোমারি,
রাত্রি দিবা ঝরিছে লোচন-বারি।
চন্দ্র জিনি কান্ত নিরখিয়ে, ভাসিতাম আনন্দে,
আজি এ মলিন মুখ কেমনে নেহারি!
এ দুঃখ তোমার হায় রে সহিতে না পারি!

চতুর্থ (১৮৭০) হইতে সপ্তম অধিবেশন (১৮৭৩) পর্য্যন্ত চারি বৎসর কাল দ্বিজেন্দ্রনাথ জাতীয় মেলার সম্পাদক ছিলেন। এই সময় মধ্যে তাঁহার পরামর্শে এবং নবগোপালের চেষ্টা-উদ্যোগে এই মেলা একটি শ্রেষ্ঠ ও উৎকৃষ্ট জাতীয় প্রতিষ্ঠান হইয়া দাঁড়াইল। জাতীয় মেলা বাৎসরিক অনুষ্ঠান, কিন্তু বর্ষমধ্যে ইহার উদ্দেশ্য প্রচার ও তদনুযায়ী কার্য্য করিবার জন্য নেশন্যাল সোসাইটি বা জাতীয় সভা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। এই সভায় সম্বৎসর ধরিয়া জাতীয় উন্নতিমূলক কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য, শিক্ষা, সাহিত্য, বিজ্ঞান, সমাজ, রাষ্ট্রনীতি নানা বিষয়েই আলোচনা হইতে লাগিল। জাতীয় মেলা ও জাতীয় সভা সম্পর্কে নবগোপাল মিত্রের কৃতিত্বের কথা-প্রসঙ্গে মনোমোহন বসু সম্পাদিত 'মধ্যস্থ' (ফাল্গুন ১২৮০) বলেন—

“কিন্তু জাতীয় ভাব ও জাতীয় অনুষ্ঠানের বিষয় একা তাঁহার গুণানুবাদ করিলেই পর্য্যাপ্ত হয় না। সদ্বিদ্যাবিশারদ নিয়ত-স্বদেশ-হিতৈষী প্রসিদ্ধনামা বাবু দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের নামও সর্ব্বাগ্রে গণনীয়। রোম নগরের এক সেনাপতিকে তরবার, অন্যকে ঢাল বলিয়া যেমন উপমা দেওয়া হইত, আমাদিগের বর্ত্তমান জাতীয় অনুষ্ঠান পক্ষে ঐ উভয় মহাশয়ই সেইরূপ সমহিতকারী হইতেছেন।”

২. বিপিনবিহারী গুপ্ত, পুরাতন প্রসঙ্গ, দ্বিতীয় পর্য্যায়, পৃ. ২০৬-৭।

নবগোপাল মিত্র

জাতীয় মেলা ও জাতীয় সভা দিন দিন বৰ্দ্ধিত হইয়া সমাজের মহা হিতকারী হইয়া উঠিয়াছিল। নবগোপাল মিত্র এতদুভয়েরই প্রাণ ছিলেন। জাতীয় মেলার দ্বিতীয় অধিবেশনেই মনোমোহন বসু মহাশয় ইহার ভাবী উন্নতির সম্ভাবনা দেখিয়া নবগোপাল সম্বন্ধে বলিয়াছেন :

"সমাজের যতদূর বিশৃঙ্খলা ঘটিবার তাহা ঘটিয়াছে এই দুরবস্থা চাক্ষুষ করিয়া কোন্ চিন্তাশীল হিন্দু স্থির থাকিতে পারে? কোন্ সুশিক্ষিত স্বদেশ-বৎসল মন প্রতিবিধানে অগ্রসর না হইয়া স্বীয় ধৰ্ম্ম প্রবৃত্তির উত্তেজনা ও ধিক্কারে বধির থাকিতে পারে? যে সকল মহাশয়গণের এরূপ উন্নত মন যে সকল হিন্দুকুলোদ্ভব মহাত্মাগণ এইরূপ চিন্তাশীল, তাঁহারাই এই 'চৈত্র মেলা'-নামা হিন্দুসমাজ বন্ধনের অদ্বিতীয় উপায় উদ্ভাবন করিয়াছেন। তাঁহাদের মধ্যে সিমুলিয়া বাসী গুণরাশি, নির্ম্মৎসর, অধ্যবসায়ী শ্রীযুক্ত বাবু নবগোপাল মিত্র মহাশয় সৰ্ব্বাগ্রগণ্য। যে সকল গুণদ্বারা বহুজনসাধ্য বৃহৎ কাণ্ডের আবিষ্কর্ত্তা ও নিয়ন্তা হওয়া সম্ভব তাঁহাতে সে সমস্ত গুণ সৰ্ব্বতোভাবে বিদ্যমান আছে। সেই মহৎ গুণাবলীর শৃঙ্খলে অন্যান্য স্বদেশহিতৈষী মহাশয়েরা আবদ্ধ রহিয়া কয়েকটি মধুমক্ষিকার ন্যায় অল্পে অল্পে ক্রমে ক্রমে স্বদেশের সৌভাগ্য মধুচক্র একখানি রচিত করিয়া তুলিতেছে। অতএব তাঁহারা হিন্দুমাত্রেরই কৃতজ্ঞতাভাজন।"[১]

জাতীয় মেলার অষ্টম অধিবেশনে ইহার আশাতীত সাফল্যে উৎফুল্ল হইয়া মনোমোহন স্বীয় 'মধ্যস্থ' পত্রিকায় (ফাল্গুন ১২৮০) নবগোপালের ভূয়সী প্রশংসা করিলেন। অষ্টম অধিবেশনের প্রসঙ্গে তিনি প্রথমেই লেখেন—

"এতদিনে আমাদিগের প্রিয় বন্ধু শ্রীযুক্ত নবগোপাল মিত্র মহাশয়ের অবিচলিত অধ্যবসায়-তরুকে ফলোন্মুখ দেখা যাইতেছে। শুভক্ষণে বঙ্গদেশ এই মহাত্মাকে গর্ভে ধারণ করিয়াছিলেন। আমাদের এই উক্তিকে কোনো কোনো পক্ষীয় কোনো কোনো লোক অতিরিক্ত প্রতিষ্ঠাবাদ রূপে গণ্য করিতে পারেন। কিন্তু আমরা সৰ্ব্বদিক বিবেচনা, এরূপ বিষয়ের সকল কথা স্মরণ এবং অন্যান্য দেশহিতৈষীগণের সহিত ইহার কার্য্যের তুলনা না করিয়া এ কথা বলি নাই। আমরা বহুবৎসরাবধি তাঁহার প্রকৃতি ও কাৰ্য্যাদি পৰ্য্যালোচকের দৃষ্টিতে দেখিয়া ও পরীক্ষা করিয়া আসিতেছি—'মধ্যস্থ' প্রচারের বহু পূর্ব্ব হইতেও আমরা তদ্দর্শক আছি। তাঁহার কৃত অনুষ্ঠানসমূহ সম্বন্ধে অনেকবার অনেক প্রকাশ্য স্থলে স্বাভিপ্রায় মুখে ও লেখনীতে ব্যক্ত করা গিয়াছে, কিন্তু এতকালের এত সুযোগের মধ্যে তাঁহার নাম করিয়া অদ্যকার মত কোন বিশেষ প্রতিষ্ঠা অভিব্যক্ত করি নাই। না করিবার প্রধান কারণ তাঁহার স্বকীয় প্রার্থনা। অর্থাৎ তিনি যখনই কোনো উপলক্ষ্যে আমাদের দ্বারা তাহার কোনো উদ্যোগ দেখিতে পাইতেন, তৎক্ষণাৎ আমাদিগকে সুমিষ্ট কৌশলে

১. মনোমোহন বসু, বক্তৃতামালা, পৃ. ৮-৯

নিবারণ করিয়া রাখিতেন। সে নিবারণের তাৎপর্য্য আর কিছুই নয়, মনোগত ইচ্ছানুযায়ী কাজ যতদিন না হইতেছে—কাজের মত কোনো কাজ যতক্ষণ সমাজ-মধ্যে পূর্ণাবয়বে দৃষ্ট না হইতেছে, ততক্ষণ সুদ্ধ পরস্পরের ধন্যবাদ কোন্ কাজের? তাহাতে বরং অনিষ্ট বই ইষ্ট-সিদ্ধির সম্ভাবনা অল্প।

"এই সদ্ভাবটি মনে প্রাণে লাগিয়া আমরা কেবল চিন্তাকুল ও আশান্বিত হৃদয়ে ধৈর্য্য ধারণ পূর্ব্বক দর্শন ও অপেক্ষা করিতেছিলাম। ১২৭৯ সালের জাতীয় সভার উন্নতি দেখিয়া আশা ও হর্ষের বৃদ্ধি হইল। কিন্তু মেলার অনুষ্ঠানে কোন নব উন্নতি লক্ষিত না হওয়াতে সম্পূর্ণ আশ্বস্ত হইতে পারি নাই। এবারকার মেলায় পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক অঙ্গের পরিবর্দ্ধন ও সুশৃঙ্খলা দর্শনে অন্তঃকরণ বহুলাংশে সন্তৃপ্ত ও সুস্থ হইয়াছে। প্রদর্শয়িতব্য দ্রব্য-সম্ভারাদি সম্বন্ধে যে কিছু উন্নতি দৃষ্টি হইল, আমরা তন্নিমিত্ত অবশ্যই সন্তোষলাভ করিয়াছি; কিন্তু মেলার কয় দিবস অধ্যক্ষগণ সুনিয়ম স্থাপন প্রভৃতি যে সকল কার্য্য করিয়াছেন, তদর্থে শতগুণে বেশী আশা ভরসা প্রাপ্ত হইয়াছি। বিশেষতঃ মেলার প্রধান অথচ শেষদিন রবিবারে আট আনা হারে প্রবেশ-টিকিট বিক্রয় দ্বারা যে অর্থ হইয়াছে তাহা অত্যন্ত আনন্দ ও উৎসাহের বিষয়। আবার অর্থে সামর্থ্যে সমাজের উচ্চশ্রেণীস্থ সাহায্যদাতাগণের সংখ্যাবৃদ্ধি দেখিয়া এবারে এমন ভরসা জন্মিতেছে, যে, এই প্রার্থনীয় জাতীয় অনুষ্ঠান ক্রমে ক্রমে যথার্থই, সমাজ-শুভকরীরূপে তিষ্ঠিতে ও উন্নত হইতে পারিবে। এবার এই সমস্ত দেখিয়া শুনিয়াই সমাজ-বন্ধু মিত্র মহাশয়ের নামে তাঁহার প্রাপ্য প্রতিষ্ঠা উৎসর্গ না করিয়া নীরব থাকিতে পারিলাম না—এবার অন্তঃকরণ আপ্লুত হইয়া উঠিয়াছে, আর চুপ করিয়া থাকা যায় না!

"সেই প্রশংসাবাদ কি, কিসের এবং কতদূর দেয়, তাহাও সংক্ষেপে নিরূপণ করিয়া বলিব। অদ্য আমরা স্থানান্তরে 'জাতীয় ভাবের' ব্যাখ্যা করিয়াছি,...অত্র বঙ্গদেশে বাবু নবগোপাল মিত্রই সেই জাতীয় ভাবের প্রথম ভাবুক ও প্রধান প্রচলন কর্ত্তা। তিনি বিদ্যালয় হইতে নিষ্ক্রান্ত হইতে না হইতেই—তদবধি একাল পর্য্যন্ত ঐ পবিত্র ভাব হৃদয়ে ধারণ করিয়া সমাজের অবস্থা, বান্ধবমণ্ডলীর সাহায্য ও স্বীয় বহুদর্শনজনিত জ্ঞানানুসারে সেই ভাবের রূপান্তর ও উন্নতি যখন যেমন হউক, কিন্তু অনন্যকর্ম্মা ও অনন্যভাবুকরূপে অবিচলিতচিত্তে দৃঢ় অধ্যবসায় সহযোগে সেই পথের পথিক এবং সেই পবিত্র ব্রতের ব্রতী হইয়া আসিতেছেন। কিসে স্বীয় পৈতৃক সমাজ প্রকৃত সামাজিকতা, প্রকৃত জাতীয় ভাব, প্রকৃত স্বদেশানুরাগ প্রভৃতি সদ্‌গুণে ভূষিত হইবে—কিসে তাহারা সমবেত চেষ্টা দ্বারা আপনাদের অবস্থা উন্নত করিবে—কিসে তাহাদিগের ভীরুতা ও স্বার্থপরায়ণতা অপগত হইবে—কিসের তাহারা অপর জাতীয়ের নিকট পূর্ব্ববৎ হেয় পদার্থ না থাকিয়া সভ্য সমাজের পাঁচটার মধ্যে একটা হইতে পারিবে,- তিনি এই চিন্তাতেই নিমগ্ন এই মহোদ্যোগেই ব্যাপৃত—এই অনুষ্ঠানেই কাল কাটাইতেছেন! তাঁহার মুখে 'জাতীয়, জাতীয়, জাতীয়!' তাঁহার সকল কার্য্য 'জাতীয়, জাতীয় জাতীয়।' তাঁহার প্রচারিত সংবাদপত্রের নাম 'জাতীয়!' তাঁহার যত্নে স্থাপিত সভার নাম 'জাতীয়!' বিদ্যালয়ের নাম 'জাতীয়।' ব্যায়ামশালার নাম 'জাতীয়!' মেলার নাম 'জাতীয়!' তিনি জাগ্রত 'জাতীয়!' লইয়াই বিব্রত। তিনি সুপ্তাবস্থায় স্বপ্ন দেখেন 'জাতীয়!' তিনি জাগ্রত 'জাতীয়।' "

মনোমোহন এই প্রসঙ্গে নবগোপালের উৎসাহদাতা ও সহকর্ম্মীদের, যথা রাজা কমলকৃষ্ণ, রাজা চন্দ্রনাথ রায়, দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, রাজনারায়ণ বসু, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর, ভুজেন্দ্রভূষণ চট্টোপাধ্যায়, প্রাণনাথ পণ্ডিত, শ্যামাচরণ শ্রীমানী প্রভৃতির নামোল্লেখ করিয়া বলেন যে, "ইনি বলেন আমায় দেখ উনি বলেন আমায় দেখ।" অর্থাৎ ইঁহারা প্রত্যেকেই জাতীয় মেলার উন্নতি কল্পে সমধিক তৎপর হইয়াছিলেন।[১]

১. নবগোপাল মিত্র প্রসঙ্গে নিম্নমুদ্রিত তথ্য শ্রীশুভেন্দুশেখর মুখোপাধ্যায় আমাদের দিয়াছেন ·

নবগোপাল মিত্রের মৃত্যু সম্বন্ধে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের প্রাথমিক রূপ The Bengal Academy of Literature-এর একবিংশ অধিবেশনে (৪ ফেব্রুয়ারি, ১৮৯৪) একটি প্রস্তাব গৃহীত হয়। ইহা *The Bengal Academy of Literature* পত্রিকার প্রথম বর্ষ সপ্তম সংখ্যায় (৯ ফেব্রুয়ারি, ১৮৯৪) প্রকাশিত হয়। এই প্রস্তাবে সভাপতি মহাশয় নবগোপাল মিত্রের 'আকস্মিক ও অকাল' মৃত্যুর কথা ঘোষণা করেন।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য যে ৭ জানুয়ারি (১৮৯৪) তারিখে নবগোপাল মিত্র অ্যাকাডেমির একটি সভায় জাপান সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ পাঠ করিয়াছিলেন।

নেশন্যাল সোসাইটি বা জাতীয় সভা

চতুর্থ বর্ষের মেলা অনুষ্ঠানের পর হইতেই নেশন্যাল সোসাইটি বা জাতীয় সভারও কার্য্য আরম্ভ হয়। প্রতি মাসে এই সভার একটি করিয়া অধিবেশন হইত। প্রথমে চারিটি বক্তৃতা দানের ব্যবস্থা করা হয়। প্রথম বক্তৃতা হইবার পর 'অমৃতবাজার পত্রিকা' (২৪ মার্চ্চ, ১৮৭০) এ সম্বন্ধে লেখেন—

"সম্প্রতি বাঙ্গলায় যে চারিটী বক্তৃতা হইতেছে, তাহার প্রথম বক্তৃতা সীতানাথ বাবু দিয়াছেন। প্রথম বক্তৃতা যন্ত্রবিষয়ক, সীতানাথ বাবু কর্ত্তৃক। দ্বিতীয় বক্তৃতা বাণিজ্যবিষয়ক যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর কর্ত্তৃক, তৃতীয় বাবু যোগেন্দ্রনাথ ঘোষ কর্ত্তৃক মুদ্রাযন্ত্র-বিষয়ক, চতুর্থ বক্তৃতা বাবু সৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর কর্ত্তৃক ভারতবর্ষীয় সঙ্গীত-বিষয়ক। সীতানাথ বাবুর বক্তৃতা হইয়া গিয়াছে। তিনি বক্তৃতা স্থলে তাঁহার এয়ার পাম্পযন্ত্র আর তাঁহার সৃষ্ট নূতন একটি তাঁত দেখান। তিনি বলেন তন্তু যন্ত্রে একটি লোকে ৪ জনের কাজ করিতে পারে।"

এই উদ্ধৃতির সীতানাথ বাবু সীতানাথ ঘোষ। তিনি জাতীয় সভার বিভিন্ন অধিবেশনে এবং জাতীয় মেলার প্রকাশ্য অধিবেশনেও বিজ্ঞান ও বৈজ্ঞানিক যন্ত্রের ব্যবহার সম্পর্কে একাধিক বক্তৃতা করেন। বিজ্ঞানের, বিশেষতঃ ব্যবহারিক বিজ্ঞানের গবেষণায়, তিনি আমাদের পথ-প্রদর্শক। তিনি 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'তেও তাঁহার গবেষণালব্ধ জ্ঞানের উপর বহু প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন। তাঁহার একটু পরিচয় প্রদান এখানে অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। বক্তৃতার কথা প্রসঙ্গেই 'অমৃতবাজার পত্রিকা' সীতানাথ সম্বন্ধে উক্ত দিবসেই লিখিলেন—

"বাবু সীতানাথ ঘোষের বাটী যশোহর, রায়গ্রামে। অবস্থা ভাল না থাকায় এবং অন্যান্য কারণবশতঃ তিনি কলেজে তাঁহার পাঠ সমাপ্ত করিতে পারেন নাই। এক্ষণে কলিকাতায় অল্প বেতনে কেরাণিগিরি করিতেছেন। সীতানাথবাবুর বয়স অল্প কিন্তু অতি শৈশবকাল অবধি তাঁহার মনের গতি এক দিকে—নূতন যন্ত্র নির্ম্মাণ করা।

"আমাদের যতদূর স্মরণ হয়, সীতানাথ বাবুর প্রথম যত্নের ফল, নূতন একরূপ ঘানি গাছ।...আমরা দুইটি যন্ত্রের চিত্র দেখিয়াছি, একটি এয়ার পম্প, আর একটি এঞ্জিন। এয়ার পম্পে তিনি কৃতকার্য্য হইয়াছেন। এক্ষণে তিনি তাহার প্যাটেন্ট লইতে পারেন, কিন্তু তাহাতে লাভ কি। তাঁহার এয়ার ইঞ্জিন সম্পূর্ণ হয় নাই, কিন্তু যতদূর হইয়াছে তাহাতে তাঁহার বিস্তর বুদ্ধির পরিচয় আছে। এ যন্ত্রের উদ্দেশ্য বাষ্পের পরিবর্ত্তে সামান্য বায়ু ব্যবহার করা ও বায়ুর স্থিতি-স্থাপকত্ব শক্তি কর্ত্তৃক যন্ত্রের গতি দেওয়া।"[১]

১। সীতানাথ ঘোষের কার্য্যকলাপের সংক্ষিপ্ত পরিচয় যোগীন্দ্রনাথ সমাদ্দার 'প্রবাসী' পত্রের ১৩১৮ ফাল্গুন সংখ্যায় (পৃ. ৪৯৩) এবং ১৩১৯ জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায় (পৃ. ২১৩-৫) দিয়াছেন। সীতানাথ ঘোষ *Medical Magnetism* গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। ইহাতে তিনি এইরূপ আত্মপরিচয় দিয়াছেন—"Founder of Electropathy—Magnetic System of Treatment in India."

জাতীয় সভায় প্রদত্ত বক্তৃতাসমূহ নানা দিক হইতেই গুরুত্বপূর্ণ ছিল, এবং কোন কোন বক্তৃতা পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইত। যোগেন্দ্রনাথ ঘোষের মুদ্রাযন্ত্রবিষয়ক বক্তৃতাটিও পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়। জাতীয় সভার পঞ্চম অধিবেশনে বক্তৃতার বিষয় ছিল 'জীবন ও বহির্জগতের সঙ্গে উহার কি সম্বন্ধ'। ১৮ আগস্ট, ১৮৭০-এর 'অমৃতবাজার পত্রিকা' লেখেন—

"জাতীয় সভার পঞ্চম অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। বাবু রাজকৃষ্ণ মিত্র 'জীবন ও বহির্জগতের সঙ্গে উহার কি সম্বন্ধ,' এ বিষয়ে একটি বক্তৃতা পাঠ করেন। মনুষ্যের জীবন ধারণের নিমিত্ত বহির্জগৎ হইতে কি কি প্রয়োজন সেইগুলি তিনি বর্ণন করেন এবং প্রয়োজন সেইগুলি তিনি বর্ণনা করেন এবং প্রয়োজন মত তাঁহার প্রস্তাবিত বিষয়ের স্থান বিশেষ রাসায়নিক প্রদর্শন দ্বারা বুঝাইয়া দেন। তাহার পরে বাবু গিরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় তাঁহার কৃত চরকা প্রদর্শন করেন এবং বাবু সীতানাথ ঘোষ এই কলটিতে কত উপকারের সম্ভাবনা তাহা সভ্যগণকে বুঝাইয়া দেন।"

ইহার পর এ বৎসরে জাতীয় সভার আর কোনো অধিবেশনের সন্ধান পাই নাই। তবে এই সময়ে জাতীয় মেলার উদ্যোক্তারা অন্য কোন কোন বিষয়েও স্বদেশবাসীর উপকার বিষয়ে চিন্তা করিতেছিলেন। তাঁহাদের দ্বারা বিধবাদের শিল্পাদি কর্ম্মে সাহায্যে বিষয়ে ১ ডিসেম্বর, ১৮৭০-এর 'অমৃতবাজার পত্রিকা' লেখেন—

"জাতীয় মেলার উদ্যোগ ও যত্ন দেখিয়া আমাদের প্রত্যাশা ক্রমে বৃদ্ধি পাইতেছে। সম্প্রতি ইহা কর্ত্তৃক একটি সদনুষ্ঠান হইয়াছে। এদেশের বিধবা স্ত্রীরা অনেক স্থলে নিতান্ত সহায়শূন্য অবস্থায় পতিত হয়। ইহাদিগের জীবনোপায়ের নিমিত্ত মেলা কর্ত্তৃক একটি ফণ্ড খোলার যত্ন হইতেছে। আপাতত ৫০০৲ টাকা লইয়া কাজ আরম্ভ হইবে ও ২৫ জন বিধবাকে ইহা হইতে ২৫৲ টাকার মূল্যের জিনিসপত্রাদি দেওয়া হইবে। তাহারা ইহার দ্বারা প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি প্রস্তুত করিয়া হয় জাতীয় মেলা কি ইহার মাসিক সভাতে পাঠাইয়া দিবেন। সেখানে ইহা বিক্রয় হইয়া যাহা পাওয়া যাইবে তাহার মধ্য হইতে সভা কর্ত্তৃক যে টাকা পূর্ব্বে দেওয়া হইয়াছিল, তাহা বাদে যাহা থাকিবে তাহাদিগকে দেওয়া হইবে।"

নেশন্যাল সোসাইটি বা জাতীয় সভা জাতীয় মেলার একটি বিশিষ্ট অঙ্গ। জাতীয় মেলা সাম্বৎসরিক অনুষ্ঠান। জাতীয় মেলার আদর্শ সম্মুখে রাখিয়া স্বদেশের উন্নতিমূলক বিভিন্ন বিষয়ে সম্বৎসর ধরিয়া কার্য্য ও আলাপ-আলোচনার জন্য জাতীয় সভা প্রতিষ্ঠিত হয়। নিম্নের উদ্ধৃতিতে জাতীয় সভার উদ্দেশ্য এইরূপ বর্ণিত হইয়াছে—

"জাতীয় সভা। হিন্দু মেলার স্বাক্ষরকারীগণ কর্ত্তৃক এই সভা প্রতিষ্ঠিতা হইয়াছে। হিন্দু জাতির সর্ব্বশ্রেণীর মধ্যে জাতীয় ভাবের বর্দ্ধন এবং তাঁহাদিগের স্বাবলম্বিত যত্ন দ্বারা বিবিধ উন্নতি সাধন করাই এই সভার মুল উদ্দেশ্য। অন্যূন এক মুদ্রা বার্ষিক দান করিলেই হিন্দুনামধারী মাত্রেই এই সভার সভ্যতা পদের অধিকারী হইবেন।

"সভা দ্বারা 'হিন্দু মেলা' নামা একটি বার্ষিক মেলা অনুষ্ঠিত হয়; তাহাতে সর্ব্ব-সাম্প্রদায়িক হিন্দু সমবেত হইয়া স্বজাতীয় সর্ব্বপ্রকার উন্নতি পক্ষে উৎসাহদান ও উপায়াবলম্বন করা হইয়া থাকে। আর প্রতি মাসে একটি করিয়া সভার অধিবেশন হইয়া সভ্যগণ কর্ত্তৃক স্বজাতীয় হিতকর বিষয়াদি আলোচিত এবং দেশীয় পুরাকালিক শাস্ত্রাদি গ্রন্থের অন্তঃসারত্ব প্রদর্শিত হয়। নির্ব্বাচিত

বিষয়ের মধ্যে কৃষি, শিল্প, বিজ্ঞান ও শারীরিক স্বাস্থ্যবিধায়ক শিক্ষা প্রভৃতির উন্নতি দিকেও বিশেষ দৃষ্টি রাখা হইবে। শাস্ত্রানুসারে ও সভার অন্যান্য উদ্দেশ্য সাধনার্থ যে কয়টি কার্য্যনির্ব্বাহক অধ্যক্ষ সভার প্রয়োজন হইবে, তন্নিয়োগেরও কল্পনা আছে।

"উক্ত উদ্দেশ্য সমূহের সংসাধনকল্পে যে সকল শিক্ষালয় অনুষ্ঠিত হয়, সাধ্যানুসারে তত্তাবতের প্রতি উৎসাহদান ও আনুকূল্য করাও এই সভার অভিপ্রায়।

"জাতীয় সংবাদপত্র ও সাময়িক পত্রিকাদি সহযোগে স্বজাতীয় শুভকর বিষয়াদির সম্যগ আন্দোলন করিতেও সভা ত্রুটি করিবেন না।

"সভার বিশেষ প্রত্যাশা, সমস্ত হিন্দু মহাশয়েরা সভার সভ্য শ্রেণীভুক্ত হইয়া এই স্বজাতীয় অনুষ্ঠানের স্বেচ্ছাপূর্ব্বক সর্ব্বাঙ্গীণ সহায়তা করেন। সভার সম্পাদক বা সহকারী-সম্পাদককে পত্রদ্বারা সভ্য হওনের ইচ্ছা জ্ঞাপন করিলেই হইতে পারিবেক।"

জাতীয় সভার এই অনুষ্ঠানপত্রখানি ২৩ অগ্রহায়ণ ১২৭৯ সংখ্যক 'মধ্যস্থে' প্রকাশিত হয়। 'নেশন্যাল' বা জাতীয় কথাটি এই সভার সঙ্গে যুক্ত করায় কেহ কেহ ইহার এই বলিয়া সমালোচনা করেন যে, ইহা যদি হিন্দু সমাজের মধ্যেই নিবদ্ধ রহিল তাহা হইলে ইহার 'জাতীয়' নামের সার্থকতা কি? কেননা, ভারতবর্ষে হিন্দু ব্যতীত মুসলমান, খ্রীষ্টান প্রভৃতি বহু সম্প্রদায়ই তো আছে। 'মধ্যস্থ' ও 'নেশন্যাল পেপার' উভয় পত্রিকাই প্রতিবাদের এই মর্ম্মে জবাব দেন যে, হিন্দুরা একটি স্বতন্ত্রজাতি এবং হিন্দু জাতির অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মিলনক্ষেত্রকে 'জাতীয়' নামে আখ্যাত করায় কোনই আপত্তির কারণ থাকিতে পারে না। 'নেশন্যাল পেপার' (৪ ডিসেম্বর, ১৮৭২) প্রতিবাদমূলক একখানি পত্র প্রকাশিত করিয়া নিজ মন্তব্যে লিখিলেন—

We do not understand why our correspondent takes exception to the Hindoos who certainly form a nation by themselves, and as such a society established by them can very properly be called a National Society.

অনুষ্ঠানপত্র প্রচারের এক মাসের মধ্যেই, ১৬ই পৌষের অধিবেশনে জাতীয় সভায় এই বিষয়ে বিশেষ আলোচনা হয় এবং ইহার কার্য্য সুপরিচালনার জন্য কয়েকটি কমিটি গঠিত হইয়া বিভিন্ন কার্য্যভার তাহাদের উপর অর্পিত হয়। গুরুত্ব বিবেচনায় এই সভার সংক্ষিপ্ত বিবরণ 'মধ্যস্থ' (২২ পৌষ, ১২৭৯) হইতে এখানে উদ্ধৃত হইল।

"জাতীয় সভা। গত রবিবার সন্ধ্যার পর 'জাতীয় নাট্যশালা' বাটীতে[১] জাতীয় সভার এক প্রকাশ্য অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। তাহাতে কৃতবিদ্য ও বিখ্যাতনামা অনেক মহাশয় সভাসনে ও দর্শক শ্রেণীতে উপস্থিত ছিলেন। মহামান্য রাজশ্রীকালীকৃষ্ণ দেব বাহাদুর প্রধান আসন গ্রহণপূর্ব্বক রীতিমত সভার কার্য্যারম্ভ করিলে বাবু মনোমোহন বসু এই সভা সংস্থাপনের মূলাভিপ্রায় তদ্দ্বারা ক্রমশঃ হিন্দু সমাজের মধ্যে জাতিভাব প্রবর্ত্তন ও ঐক্যবন্ধন দৃঢ়ীকরণ কিরূপে হইতে পারিবে তদ্বিষয় এবং কোনো কোনো স্থলে এই সভার 'জাতীয়' বিশেষণে যে আপত্তি উত্থাপন হইয়াছিল, তাহার প্রতিবাদসূচক অভিপ্রায় ব্যক্তকরতঃ সভার অনুষ্ঠাতাগণের অভিমতানুরূপ এই প্রস্তাব

১. "চিৎপুর রোড গবর্ণমেন্ট নর্ম্যাল স্কুলের সম্মুখে বাবু মধুসূদন-সান্যাল মহাশয়ের বাটী"...'মধ্যস্থ', ১৫ পৌষ, ১২৭৯।

করিলেন যে, এই সভার কার্য্য সুচারু রূপে নির্ব্বাহার্থ ও সুব্যবস্থা সাধন উদ্দেশ্যে পূর্ব্বকার মেলা সম্বন্ধীয় সাধারণ অধ্যক্ষ সভা ব্যতীত বিশেষ কার্য্যকরী একটি বিশেষ অধ্যক্ষ সভা নিযুক্ত হউক। তাহা পঞ্চমাংশে বিভাজিত থাকিবেক।

"সভার স্থান, সময়, সভাপতি, প্রবন্ধ লেখক ও প্রবন্ধের বিষয়াদি অবধারণ এবং পঠিত প্রবন্ধাদি সম্বন্ধে যাহা কিছু কর্ত্তব্য, তত্ত্বাবৎ প্রথম বিভাগের প্রধান কার্য্য হইবে।

"দ্বিতীয় ভাগ শিল্প ও বিজ্ঞান শাখায় নিযুক্ত থাকিবেন। অর্থাৎ সাধারণ শিল্প ও বৈজ্ঞানিক বিষয়ে উৎসাহদান ব্যতীত মেলাস্থলে যাহাতে স্বদেশীয় হস্তসম্ভূত নানাপ্রকার শিল্প পদার্থ প্রদর্শিত ও সেই বিদ্যা সম্বৰ্দ্ধিত হয়, তৎপক্ষে বিশেষ মনোযোগী রহিবেন।

"ব্যায়াম-শিক্ষা-পদ্ধতির উন্নতি দিগে তৃতীয় বিভাগ, কৃষি ও উদ্যানতত্ত্ব সম্বন্ধে চতুর্থ এবং সঙ্গীত কল্পে পঞ্চম বিভাগ নিযুক্ত থাকিবেন।

"যে যে মহাশয়ের যে যে বিভাগে অধ্যক্ষরূপে মনোনীত হইবেন, তাঁহাদিগের নামও প্রস্তাবিত হইল। বিশেষ অধ্যক্ষ সভা ও সাধারণ অধ্যক্ষ সভার অধিবেশন কাল ও কর্ত্তব্য কর্ম্মের নিয়ম কয়েকটির পাণ্ডুলিপিও ঐ প্রস্তাবের সঙ্গে তিনি অর্পণ করিলেন। শ্রীযুক্ত বাবু দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের পোষকতায় তত্ত্বাবৎ সর্ব্ববাদীসম্মত গ্রাহ্য হইল।"

প্রতি মাসেই জাতীয় সভার অধিবেশন হইত এবং সভার ঘরোয়া কার্য্য ব্যতিরেকে বিভিন্ন বিষয়ে সমাজোন্নতিমূলক প্রবন্ধাদি পঠিত হইত। সভার কোন কার্য্যবিবরণী বা সমসাময়িক পত্রিকাদি ধারাবাহিক ভাবে হস্তগত না হওয়ায় ইহার আনুপূর্ব্বিক বিবরণ প্রদান সম্ভব নয়। তবে উপরের উদ্ধৃতি হইতে জানা যাইতেছে যে, ১৮৭২ সালে জাতীয় সভা পুনর্গঠিত হইয়া ইহার কার্য্য রীতিমত চলিবার পক্ষে বিশেষ সুবিধা হয়। এই বৎসরের কাগজপত্র কিছু কিছু হস্তগত হওয়ায় জাতীয় সভার অধিবেশনগুলির অন্ততঃ কয়েকটি বিবরণ জানা সম্ভব হইয়াছে। জাতীয় সভা উত্তরোত্তর উন্নতির দিকে অগ্রসর হইতেছিল। 'মধ্যস্থ' (২৩ ভাদ্র ১২৭৯) ইহার সম্বন্ধে সাধারণভাবে লেখেন—

"বিখ্যাতনামা শ্রীযুক্ত বাবু নবগোপাল মিত্র এবং তদীয় সুযোগ্য ভ্রাতৃবর শ্রীযুক্ত বাবু তারিণীচরণ মিত্র প্রভৃতি মহাশয়ের বিবিধ যত্নে এই সভা দিন দিন বৰ্দ্ধিত হইতেছে। বঙ্গীয় সমাজের প্রধান প্রধান ব্যক্তি প্রধান প্রধান আসন গ্রহণ ও সদ্বক্তা মহাশয়গণ উত্তম উত্তম বিষয়ের বক্তৃতা দ্বারা সর্ব্বমনোরঞ্জন করিতেছেন।"

এ বৎসর জাতীয় সভার দ্বিতীয় অধিবেশন হয় ১৪ই জুলাই তারিখে। ব্যবস্থা-দর্পণ-প্রণেতা শ্যামাচরণ সরকার 'হিন্দু আইন' সম্পর্কে বক্তৃতা করেন। 'মধ্যস্থ' (৬ শ্রাবণ ১২৭৯) লেখেন—

"গত ১৪ই জুলাই রবিবার নেশন্যাল সোসাইটির দ্বিতীয় অধিবেশন বাবু শ্যামাচরণ সরকার 'হিন্দু-লা' অর্থাৎ 'হিন্দুবিধি' বিষয়ে প্রায় দেড়ঘণ্টাকাল এক সুদীর্ঘ বক্তৃতা করিয়াছিলেন, তাঁহার বক্তৃতা অতি উত্তম হইয়াছিল। নবগোপালবাবুর যত্নে এই সভা দিন দিন বৰ্দ্ধিত হইতেছে।"

জাতীয় সভার তৃতীয় অধিবেশন হয় পরবর্ত্তী ১১ই আগষ্ট। জন বীম্‌স নামক সিভিলিয়ান কর্ম্মচারী ফ্রান্সের ফ্রেঞ্চ অ্যাকাডেমির আদর্শে বাংলা ভাষা নিয়ন্ত্রণের জন্য একটি পরিষদ স্থাপনের

প্রস্তাব করিয়াছিলেন। এবার রাজনারায়ণ বসু মহাশয় এই প্রস্তাবের বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করিয়া বাংলা ভাষার উপরে এক দীর্ঘ বক্তৃতা করেন। 'মধ্যস্থ' (২ ভাদ্র ১২৭৯) ইহার বিবরণ এইরূপ দিয়াছেন—

"বিগত ১১ই আগষ্ট রবিবার সার্দ্ধ চারি ঘণ্টার সময় কলিকাতা ট্রেনিং একাডেমী বিদ্যালয়গৃহে নেশন্যাল সোসাইটির তৃতীয় অধিবেশন হইয়াছিল। পণ্ডিত মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। বঙ্গভাষার বিখ্যাত লেখক রাজনারায়ণ বসু বীম্‌স সাহেবের প্রস্তাবিত 'বাঙ্গলা সাহিত্যের ভাষা ও রীতি-সংস্থাপনী সভা' এই প্রসঙ্গোপরি প্রায় তিন ঘণ্টাকাল এক সুদীর্ঘ মৌলিক বক্তৃতা করিয়াছিলেন। তিনি বঙ্গভাষার উৎপত্তি, ইতিহাস, উন্নতি প্রভৃতি সুদীর্ঘরূপে বিবৃত করিয়া পরিশেষে প্রকৃত প্রস্তাব আরব্ধ করেন। তাঁহার বক্তৃতা অতি উৎকৃষ্ট হইয়াছিল। পরে কিয়ৎক্ষণ তর্কবিতর্কের পর সভাপতি মহাশয় এই প্রস্তাব করেন যে সভা কর্ত্তৃক বীম্‌স সাহেবকে ধন্যবাদ দিয়া এই মর্ম্মে এক পত্র লেখা হয় যে তাঁহার মতে সাহিত্যরীতি সংস্থাপনী সভা না হইয়া একটি সমালোচনী সভা হইলে ভাল হয়। এই প্রস্তাব সভ্যগণ কর্ত্তৃক অনুমোদিত হইলে রাত্রি ৮॥০ ঘটিকার সময় সভা ভঙ্গ হয়।"

এই বক্তৃতার কথা আত্ম-চরিতেও রাজনারায়ণ বসু লিপিবদ্ধ করিয়াছেন।

জাতীয় সভার চতুর্থ অধিবেশন হয় পূর্ব্ববর্ত্তী স্থানে ১৫ই সেপ্টেম্বর তারিখে। এবারকার বক্তাও রাজনারায়ণ বসু মহাশয়। তিনি 'হিন্দু ধর্ম্মের শ্রেষ্ঠতা' শীর্ষক এক যুগান্তকারী বক্তৃতা প্রদান করিলেন। সভার সভাপতি হইয়াছিলেন মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর। এই বক্তৃতা লইয়া এ দেশে ও বিদেশে, সপক্ষে ও বিপক্ষে নানারূপ আলোচনা হয়। বঙ্গের উন্নতিশীল ব্রাহ্মগণ ও খ্রীষ্টানগণ বিভিন্ন সভা-সমিতিতে ইহার প্রতিবাদ করিয়াছিলেন। কিন্তু রাজনারায়ণের উক্তির সারবত্তা তাঁহার প্রতিবাদীরাও অনেকে পরে স্বীকার করিতে বাধ্য হন। বসু মহাশয় আত্ম-চরিতে এই বক্তৃতা ও ইহা হইতে উদ্ভূত আন্দোলন সম্পর্কে বিশদ বিবরণ দিয়াছেন।

শারদীয়া পূজার জন্য জাতীয় সভার পঞ্চম অধিবেশন এক সপ্তাহ পূর্ব্বেই ২রা অক্টোবর (১৭ই আশ্বিন) দিবসে অনুষ্ঠিত হয়। রাজা কালীকৃষ্ণ বাহাদুর সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। জাতীয় মেলার অন্যতম উৎসাহী কর্ম্মী 'মধ্যস্থ' সম্পাদক মনোমোহন বসু মহাশয় 'হিন্দু আচার ব্যবহার—সামাজিক ও পারিবারিক' প্রবন্ধে প্রথম অংশ এখানে পাঠ করেন; ইহার দ্বিতীয় অংশ পরবর্ত্তী জাতীয় মেলায় পঠিত হয়। দুইটি অংশই পর পর পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়।

জাতীয় মেলার ষষ্ঠ অধিবেশন হইল ১৭ই নবেম্বর। এবারে বিজ্ঞবর দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় পাতঞ্জল যোগশাস্ত্রের বিষয়ে বক্তৃতা করেন। 'অমৃতবাজার পত্রিকা' (২১ নবেম্বর ১৮৭২) বক্তৃতা সম্বন্ধে লেখেন—

"গত রবিবারে জাতীয় সভায় দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর যোগশাস্ত্র সম্বন্ধীয় একটি বক্তৃতা পাঠ করেন। আমরা বক্তৃতাটি শুনিতে যাই।...দ্বিজেন্দ্রবাবু বক্তৃতায় অসাধারণ বুদ্ধি ও বিদ্যার পরিচয় দেন।..."

জাতীয় সভার সপ্তম অধিবেশন হয় ২৯শে ডিসেম্বর। এবার নীলকমল মুখোপাধ্যায় 'জমীদার ও রাইয়ত' শীর্ষক বক্তৃতা পাঠ করেন। এবারকার অধিবেশনের কথা বিজ্ঞাপিত করিয়া 'মধ্যস্থ' (১৫ পৌষ ১২৭৯) লিখিলেন—

"আগামীকল্য রবিবার রাত্রি ৭॥০টার সময় জাতীয় সভার এক অধিবেশন হইবেক। যে বাটীতে জাতীয় নাট্যশালা সেই বাটীতেই অর্থাৎ চিৎপুর রোডে গবর্ণমেণ্ট নর্ম্যাল স্কুলের সম্মুখে বাবু মধুসূদন সান্যাল মহাশয়ের বাটীতেই হইবেক।...একস্থানেই জাতীয় রঙ্গভূমি ও জাতীয় সভা প্রতিষ্ঠিত হইল।"

অতঃপর জাতীয় নাট্যশালা গৃহেই কিছুকাল যাবৎ জাতীয় সভার অধিবেশন হইতে থাকে। এখানে প্রদত্ত নীলকমল বাবুর বক্তৃতা লইয়া পত্রিকাদিতে আন্দোলন উপস্থিত হয়। সভার অষ্টম অধিবেশন রাজা কালীকৃষ্ণ বাহাদুরের সভাপতিত্বে সুসম্পন্ন হয়। বক্তা—উড়িষ্যাবাসী পণ্ডিত হরিহরদাস (শর্ম্মা), বক্তৃতার বিষয়—ন্যায় কুসুমাঞ্জলি। বক্তৃতা আংশিক লিখিত ও আংশিক মৌখিক প্রদত্ত হয়। ইহা সংস্কৃত ভাষায় ব্যক্ত হইয়া বাংলাতেও সমুদয় বিবৃত হয়। 'মধ্যস্থ' (২০ মাঘ ১২৭৯) বক্তাকে অভিনন্দন জানাইয়া লিখিয়াছিলেন—

"জাতীয় সভাতে বঙ্গীয় সভ্য ব্যতীত ভারতবর্ষের অন্যান্য খণ্ডের হিন্দুগণ আসিয়া যত যোগ দিবেন, ততই 'জাতীয়' বিশেষণের সার্থকতা হইবে। পণ্ডিত হরিহর দাস উড়িষ্যাবাসী, তিনি এই সভায় বক্তৃতা করাতে সেই আশা সিদ্ধি, সুতরাং হর্ষবৃদ্ধি হইতেছে। এই অষ্টম অধিবেশনের সমুদয় কার্য্য বিশেষ আনন্দ সহকারে সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে।"

জাতীয় সভার এই অধিবেশনেই পরবর্ত্তী জাতীয় মেলার তাবদ্বিষয়ে ব্যবস্থা বিধানের ভার কয়েক জন সভ্যের উপর অর্পিত হয়। তাঁহারা যথাক্রমে দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও দেবেন্দ্রনাথ মল্লিক সম্পাদকদ্বয়, নবগোপাল মিত্র সহকারী সম্পাদক, রাজনারায়ণ বসু, সীতানাথ ঘোষ এবং মনোমোহন বসু। 'মধ্যস্থ' কিন্তু লিখিলেন, "বস্তুতঃ যিনি যাহা করুন, কিন্তু গুণাকর সহকারী সম্পাদকের স্কন্ধেই পর্ব্বত।"

জাতীয় সভার কার্য্যক্রম

জাতীয় মেলার সপ্তম অধিবেশনের পর হইতে নেশন্যাল সোসাইটি বা জাতীয় সভার কার্য্য আরও ব্যাপক হইয়া পড়িল। ইহার কার্য্যক্রম শুধু প্রবন্ধ পাঠ বা বক্তৃতা দানের মধ্যেই নিবদ্ধ রহিল না, সমাজহিতকর নানা বিষয়েও ইহা হস্তক্ষেপ করিল। জাতীয় মেলার অধিবেশনের পর জাতীয় সভার অধিবেশন হয় ১৮৭৩, ২৩শে মার্চ্চ (১১ চৈত্র ১২৭৯) দিবসে। রাজা কমলকৃষ্ণ দেব বাহাদুর সভায় পৌরোহিত্য করেন। 'মধ্যস্থ' (১৭ চৈত্র ১২৭৯) বলেন—

"এই সভা ক্রমেই বর্দ্ধিতা হইয়া হিন্দুসমাজের সর্ব্বশ্রেণীর একটি মহামঙ্গলময় সমাবেশভূমি হইয়া উঠিতেছে। গত রবিবারের প্রকাশ্য অধিবেশন সম্ভ্রান্ত ও বিদ্বান জনগণের জনতায় পূর্ণ এবং বিবিধ প্রয়োজনীয় বিষয়ের আলোচনায় সর্ব্বলোকের চিত্তহর হইয়াছিল। প্রসিদ্ধনামা স্বর্গগত বাবু প্রসন্নকুমার ঠাকুর মহাশয়ের দৌহিত্র বাবু ভুজেন্দ্রভূষণ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় স্বীয় রম্য ভবনের দ্বিতীয় তলস্থ এক সুপ্রশস্ত ও সুসজ্জিত গৃহ এক বৎসরের নিমিত্ত সভার ব্যবহার জন্য অর্পণ করাতে সভাধিবেশনের বিশেষ সুবিধা এবং সভার কার্য্য সম্পাদকগণের সম্পূর্ণ অবসান হইয়াছে। সভায় তিন শতাধিক মান্যগণ্য ব্যক্তি আগমন করিয়াছিলেন।"

একটু পূর্ব্বেই বলিয়াছি, সভার কার্য্যক্রম এই সময় হইতে ব্যাপক হইয়া পড়িয়াছিল। এই সভায় মনোমোহন বসু প্রস্তাব করেন যে, "ব্যবস্থাপক সভায় সম্প্রতি আবগারী আইন সংশোধনের প্রস্তাব হইয়াছে. এই সময় দেশের সর্ব্ব স্থান হইতে সর্ব্বনাশক পান দোষের হ্রাসতাকারক উপায় অবলম্বন করিবার জন্য গবর্ণমেন্টকে উত্তেজিত করা উচিত। অন্যান্য সভা এ বিষয়ে অগ্রসর হইয়াছেন। এক্ষণে জাতীয় সভা হইতে জাতীয় অভিপ্রায় গবর্ণমেন্টে অর্পিত হওয়া উচিত। অতএব সভার সাহিত্য বিভাগের প্রতি এই কার্য্যের ভার এবং অপর যোগ্য ব্যক্তিগণকে তাঁহাদের দলভুক্ত করিয়া লইবার ক্ষমতা দেওয়া হউক।"

এই প্রস্তাব সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। সীতানাথ ঘোষ বিগত মেলায় "সংক্রামক জ্বরের কারণ" শীর্ষক যে প্রবন্ধ পাঠ করেন তাহার ভিতরে এমন অনেকগুলি গুরুতর বিষয় সন্নিবেশিত ছিল যাহা বিজ্ঞানবিৎ ইউরোপীয়দের এবং গবর্ণমেন্টের গোচরে আনা কর্ত্তব্য। এজন্য সভার সহকারী সম্পাদক নবগোপাল মিত্রের প্রস্তাবে ইংরেজীতে উক্ত প্রবন্ধের সারমর্ম্ম সঙ্কলনের কথা হয়। ইহার পর রাজনারায়ণ বসু মহাশয় তাঁহার "সেকাল আর একাল" নামক বিখ্যাত বক্তৃতা প্রদান করেন।

'মধ্যস্থ' (৭ বৈশাখ ১২৮০) নববর্ষে পদার্পণ করিয়া পূর্ব্ব বৎসরের কার্য্যাবলীর একটি সালতামামি প্রকাশ করেন। তাহাতে 'জাতীয় সভা' সম্পর্কে তিনি লিখিলেন—

"সর্ব্বাপেক্ষা জাতীয় সভার অভ্যুদয় পরম মঙ্গলের কারণ হইয়াছে। তৎপ্রতিষ্ঠিতা মহাশয়েরা গত বর্ষে যেরূপ একাগ্রতা ও অনুরাগ দেখাইয়াছেন, তাহা যদি অবিচলতি থাকে এবং কার্য্যানুষ্ঠানের

উপকরণ আরো যদি সুপ্রাপ্য হয়, তবে দেখিবেন অত্যল্পকাল মধ্যেই এই সভা দেশের মঙ্গলভূমি হইয়া উঠিবে—অধিকাংশ দেশহিতার্থী মহাশয়েরা ইহাতে সম্মিলিত হইয়া সভার মহোচ্চ নাম ও উদ্দেশ্য সিদ্ধি করিতে পারিবেন। গত বর্ষে এই সভাদ্বারা যে একটি কাজ হইয়াছে, তাহা ইতিপূর্ব্বে নবশিক্ষিত সম্প্রদায়ের স্বপ্নের অগোচর ছিল। তাঁহাদের দৃষ্টিতে হিন্দু-ধর্ম্ম-কর্ম্ম গলিত বস্তু মধ্যেই গণ্য হইত, ১২৭৯ বঙ্গাব্দে সেই দুইটি বস্তুর অভ্যন্তরে চমৎকার সার প্রদর্শিত হইয়াছে। ভবিষ্যতে সেই অভ্যন্তর ভাগের অন্তস্তলে আরো অপূর্ব্ব রত্নসমূহ দৃষ্ট হইবে, এমত ভরসা হইতেছে!"

১৮৭৩ সালের এপ্রিলের প্রথমে কলিকাতা হাইকোর্ট ব্যাভিচারিণী হিন্দু বিধবার পক্ষে স্বামীর বিষয়াধিকারের অনুকূলে একটি রায় দেন। ইহার বিরুদ্ধে জাতীয় সভা তীব্র আন্দোলন উপস্থিত করিলেন। ২০শে এপ্রিল রাজা কমলকৃষ্ণের সভাপতিত্বে জাতীয় সভার এক সাধারণ অধিবেশন হয়। এই অধিবেশনে প্রাণনাথ পণ্ডিত উক্ত রায়ের কুফল প্রদর্শনপূর্ব্বক শাস্ত্রবাক্য এবং এবিষয়ে অতীত ও তৎকালীন পণ্ডিতগণের অভিমত উদ্ধৃত করিয়া একটি সারগর্ভ প্রবন্ধ পাঠ করেন। প্রবন্ধপাঠের পর এ সম্বন্ধে মনোমোহন বসু, নবগোপাল মিত্র, দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, রাজনারায়ণ বসু এবং হাইকোর্টের প্রসিদ্ধ উকীল ভৈরবচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বক্তৃতা করিলেন। রাজনারায়ণ বসু বলেন, 'ইউরোপে স্ত্রীপ্রভুত্ব যেমন সমাজের ভিত্তি, এদেশে সতীত্ব তেমনি আমাদের সমাজ-ভিত্তি! পুরুষের বীরত্ব জন্য তাঁহাদের যেমন, স্ত্রী-সতীত্ব জন্য আমাদের তেমনি বড়াই!' দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর একটি আবেগপূর্ণ বক্তৃতায় এই মর্ম্মে বলিলেন, 'হিন্দুজাতির সমুদয় ভাল ভাল রীতিপদ্ধতিই গিয়াছে, মাত্র স্ত্রীর সতীত্বটিই অব্যাহত ছিল। তাহাও এখন যাইবার উপক্রম হইয়াছে।' হাইকোর্টের রায়ের বিরুদ্ধে বিলাতে আপীল এবং এদেশে ব্যাপক আন্দোলন উপস্থিত করিবার জন্য নিম্নলিখিত প্রস্তাবগুলি সভায় গৃহীত হইল—

"১। ঐ নিষ্পত্তির বিরুদ্ধে আদালতে আপীল করা কর্ত্তব্য।

"২। তজ্জন্য ছয় মাস মাত্র মেয়াদ আছে, তন্মধ্যে অর্দ্ধমাস বিগত হইয়াছে। অতএব অতি সত্বর সকল উদ্যোগ করিতে হইবে।

"৩। ইহার ব্যয় নির্ব্বাহার্থ যে কতিপয় সহস্র টাকার প্রয়োজন, তাহা সাধারণ হিন্দুসমাজ হইতে চান্দা দ্বারা সংগ্রহ করিতে হইবে। শুধু যেন সমর্থ ব্যক্তিগণের নিকটেই দান চাওয়া না হয়, ব্যবসায়ী, চা'ক্‌রে, জমীদার প্রভৃতি ধনীনির্ধনী সকলের নিকটে হইতেই যাহার যেমন সাধ্য (চারি কি এক আনা পর্য্যন্ত) আনুকূল্য গৃহীত এবং এই সভাস্থলেই তাহার সূত্রপাত আরম্ভ হউক।

"৪। এই সমস্ত বিষয় নির্ব্বাহ নিমিত্ত এক বিশেষ অধ্যক্ষ সভা নিযুক্ত হইল। তাহাতে অদ্যতনীয় সভাপতি মহাশয় সভাপতি এবং বাবু প্রাণনাথ পণ্ডিত ও বাবু নবগোপাল মিত্র মহাশয়দ্বয় সম্পাদক এবং উকীল, জমীদার, পত্রসম্পাদক ও অন্যান্য অনেক শ্রেণীর মহাশয়েরা সভ্যরূপে মনোনীত হইলেন।

"৫। অধ্যক্ষসভার প্রতি অনুরোধ রহিল, তাঁহারা যেন সমাতন ধর্ম্মরক্ষিণী প্রভৃতি সভা সমূহকে এই সভার কার্য্যবিবরণ ও প্রস্তাবাদি প্রেরণ পূর্ব্বক সাধারণ হিন্দু সমাজকে একবাক্য করিতে

প্রয়াস পান এবং নির্দ্দিষ্ট অধ্যক্ষগণ ব্যতীত তাঁহাদের মতে অপর যোগ্য ব্যক্তিগণের অধ্যক্ষ সমাজভুক্ত করিতে পারিবেন এমত ভার তাঁহাদের প্রতি অর্পিত হউক।"—'মধ্যস্থ', ১৪ বৈশাখ ১২৮০।

এ বিষয়ে শ্রোতাদের মধ্যে ভীষণ বিক্ষোভ উপস্থিত হইল। সভাক্ষেত্রেই প্রায় দেড় হাজার টাকা চাঁদার প্রতিশ্রুতি পাওয়া গেল। জাতীয় সভাকে কেন্দ্র করিয়া এই বিষয়ে আন্দোলন মফস্বলেও ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। পরবর্ত্তী ১৩ই জ্যৈষ্ঠ (২৫ শে মে ১৮৭৩) এই সম্পর্কে পুনরায় জাতীয় সভার অধিবেশন হয়।—'মধ্যস্থ', ১৮ জ্যৈষ্ঠ ১২৮০

ইতিমধ্যে জাতীয় সভার কর্ম্মকর্ত্তাদের কিঞ্চিৎ রদবদল হইল। রাজা কমলকৃষ্ণ বাহাদুর স্থায়ী সভাপতি হইলেন, সহকারী সভাপতি হইলেন বিচারপতি দ্বারকানাথ মিত্র এবং রাজানারায়ণ বসু। 'মধ্যস্থ' (৪ঠা জ্যৈষ্ঠ ১২৮০) লেখেন, "রাজাবাহাদুর ও রাজনারায়ণ বসু পূর্ব্ব হইতেই সভার প্রতি যথোচিত অনুরাগী ও বিশেষ হিতকারী ছিলেন। এক্ষণে দ্বারকানাথ বাবুর সংযোগ অবিকল মণিকাঞ্চন যোগ হইয়া উঠিল।"

জাতীয় সভার বক্তৃতাও রীতিমত চলিতেছিল। ১৮৭৩, ২৪ শে আগষ্ট অনুষ্ঠিত এক সভায় মনোমোহন বসু মহাশয় দেবালয় ও তীর্থস্থানসমূহ সম্বন্ধে একটি সারগর্ভ বক্তৃতা করেন। সভায় পৌরোহিত্য করেন স্থায়ী সভাপতি রাজা কমলকৃষ্ণ। এ সময় বিলাতে রাজস্ব কমিটিতে সাক্ষ্য দানের জন্য গবর্ণমেণ্ট কতিপয় প্রতিনিধি প্রেরণ করা সাব্যস্ত করেন। এ বিষয়ে সভায়—

"বাবু প্রাণনাথ পণ্ডিত 'রাজস্ব কমিটি'তে এ দেশীয় সাক্ষী সম্বন্ধে একটি বক্তৃতা করেন। গবর্ণমেন্ট কর্ত্তৃক মনোনীত প্রতিনিধি, দেশবাসীর মুখপাত্র নহেন। আলোচনায় দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, নবগোপাল মিত্র ও মনোমোহন বসু এতদ্বিষয়ের বিচারে লিপ্ত হইয়াছিলেন। মনোমোহন বলেন, যখন গবর্ণমেন্টের মনোনীত সাক্ষীগণের মধ্যে প্রায় কাহারো পূর্ব্ব কার্য্য এমন দেখা যায় নাই, যে, তাঁহাকে প্রতিনিধি জ্ঞান করা যাইতে পারে, তখন সভা কর্ত্তৃক তাঁহাদের প্রতি কোন অনুরোধ করা হইলে এইটি বুঝাইবে যেন আমরা (দেশের লোক) তদ্রূপ প্রতিনিধিত্বে বরণ করিলাম ইত্যাদি।

"অনেক বিতণ্ডার পর ধার্য্য হইল যে, এ বিষয়ে প্রাণনাথ পণ্ডিত একখানি স্বাভিপ্রায়লিপি লিখিয়া অধ্যক্ষগণকে দিবেন; তাঁহারা রাজনীতিজ্ঞ দেশীয় বিজ্ঞ ব্যক্তিগণের অভিমত গ্রহণ পূর্ব্বক তাহার মীমাংসা করতঃ সভায় অর্পণ করিবেন।"

"মহা-ব্যায়াম-প্রদর্শন"

জাতীয় মেলা ও জাতীয় সভার উদ্যোক্তাদের একটি বিশেষ কার্য্য ভারতবাসীদের মধ্যে ব্যায়াম চর্চ্চার প্রবর্ত্তন। জাতীয় উন্নতির পক্ষে যে এইটি একান্ত আবশ্যক তাহা তখনকার শিক্ষিত সমাজ একরূপ ভুলিয়াই গিয়াছিলেন। মেলার প্রধান উদ্যোক্তা নবগোপাল মিত্র মহাশয় বিশেষ ভাবে উক্ত বিষয় উপলব্ধি করিয়া মেলা প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে জাতীয় ব্যায়ামশালা প্রতিষ্ঠা করেন। জাতীয় বিদ্যালয়ে ও অন্যান্য শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে ব্যায়মচর্চ্চা ক্রমে একটি বিশেষ শিক্ষণীয় বিষয় হইয়াছিল। ব্যায়ামবিদ্যা প্রবর্ত্তনে জাতীয় মেলা ও জাতীয় সভার সহকারী সম্পাদক নবগোপাল মিত্রের কৃতিত্ব সম্বন্ধে 'মধ্যস্থ' (৭ই বৈশাখ ১২৮০) লেখেন—

"স্বদেশহিতৈষী সহকারী সম্পাদক বাবু নবগোপাল মিত্র মহাশয়ই বঙ্গদেশে ব্যায়ামবিদ্যার প্রথম ও প্রধান প্রবর্ত্তক। তাঁহার অবিচলিত অধ্যবসায় বলেই কয়েক বৎসর মধ্যে ইহা এতদূর উন্নত হইয়া উঠিয়াছে, যে, লেফটেন্যান্ট গবর্ণর প্রভৃতি বড় বড় ইংরেজরাও হিন্দু ছাত্রবৃন্দের অঙ্গচালনা-কৌশল দর্শনে মহা মহা তুষ্ট হইয়াছেন। অধিক কি জাতীয় ব্যায়ামবিদ্যালয়ের একজন উত্তীর্ণ ছাত্র (শ্যামাচরণ ঘোষ) মেং ক্যাম্পবেল সাহেবের প্রতিষ্ঠিত দেশীয় সিবিল সার্ব্বিস শ্রেণীর ব্যায়াম শিক্ষকের পদলাভ করিয়াছেন।"

মৃজাপুর, শিমলা, শুঁড়িপাড়া, বেনিয়াটোলা, আহিরীটোলা প্রভৃতি অঞ্চলে ব্যায়াম-বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়া ছাত্র ও যুবকদের মধ্যে ব্যায়ামবিদ্যা প্রসারলাভ করে। জাতীয় সভার ব্যায়ামবিদ্যা বিভাগ রাজা রামমোহন রায়ের আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীটস্থ ভবনে ব্যায়াম-বিদ্যালয়সমূহের ছাত্রদের দ্বারা এক 'মহা-ব্যায়াম-প্রদর্শনে'র আয়োজন করেন (১১ এপ্রিল ১৮৭০)। 'মধ্যস্থ' (৭ই বৈশাখ ১২৮০) এ দিনকার অনুষ্ঠানের এইরূপ বিবরণ দিয়াছেন—

"৪।।০ টার সময় ব্যায়াম আরম্ভের কথা ছিল, কিন্তু অত্যন্ত উষ্ণতা জন্য এক ঘণ্টা পরে হইল। লোকের জনতা বিস্তর হইয়াছিল। সাধারণতঃ ব্যায়ামের বৈচিত্র্য, নব নব কৌশল, আশাতীতরূপ অঙ্গচালনের পরিপাট্য—সুপ্রণালীবদ্ধ লম্ফ-ঝম্প, কূর্দ্দন, উত্থান, পতন, দণ্ডারোহণ, আবর্ত্তন, স্থান পরিবর্ত্তন, ক্ষিপ্রতা, ধাবন প্রভৃতি দৃষ্টি করিয়া দর্শকমাত্রেই পরম প্রীতি লাভ করিয়াছেন, এবং পুনঃপুনঃ আনন্দ প্রকাশ ও ধন্য ধ্বনিতে রঙ্গভূমি নিনাদিত হইয়া উঠিয়াছিল।

"হুগলীর শিক্ষক বাবু শ্যামাচরণ ঘোষ সমুদয় ব্যায়ামের অধ্যক্ষতা করিয়াছিলেন। জাতীয় বিদ্যালয়ের শিক্ষক বাবু দীননাথ ঘোষ এবং সুযোগ্য ছাত্র যোগীন্দ্রনাথ পাল ও রাজেন্দ্রলাল সিংহ, ইঁহারা সামান্য গুণপনা প্রদর্শন করেন নাই। শুঁড়িপাড়ার সুরথচন্দ্র দে, যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডল এবং বিপিন বিহারী মণ্ডলের কৌশল দর্শনে দর্শকগণ মহা সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন। পরিশেষে একটি ছাত্রকে গোর দেওয়া হইল। প্রায় অর্দ্ধঘণ্টাকাল তিনি মৃত্তিকানিম্নে নিমগ্ন ছিলেন। তাঁহাকে নির্ব্বিঘ্নে কবরোত্থিত হইতে দেখিয়া সকলের মহাবিস্ময় জন্মিয়াছিল।

"ফলতঃ সে দিবসের সমস্ত ব্যাপারই চমৎকার হইয়াছিল। যে স্থানে রঙ্গভূমি হয়, সেস্থান অতি মনোহর। রমাপ্রসাদবাবুর (রায়) বৈঠকখানা বাটী যিনি দেখিয়াছেন, তিনিই বুঝিতে পারিবেন তৎসম্মুখস্থ প্রশস্ত প্রাঙ্গণভূমি এ-কর্ম্মের কেমন উপযুক্ত। অর্দ্ধচন্দ্রাকারে দর্শকগণ কাষ্ঠাসনে উপবিষ্ট; সায়ংকাল বিগত, বাসন্তী শুক্লপক্ষের শশধর মৃদু মধুর করদান করিতেছিল; মন্দ মন্দ মারুতহিল্লোলে সকলেরই শরীর স্ফূর্ত্তি-বিশিষ্ট; সর্ব্বোপরি রমাপ্রসাদবাবুর সুযোগ্য কনিষ্ঠ পুত্র বাবু প্যারীমোহন রায় মহাশয়ের সু-ব্যবস্থা ও সৌজন্য, এত সুখের বিষয় একত্রিত হওয়াতে দর্শক ও প্রদর্শকগণের মন যে প্রীত ও উৎসাহিত হইবে সন্দেহ কি?"

রাত্রি আটটার সময় ব্যায়াম প্রদর্শন সমাধা হইলে রাজনারায়ণ বসু মহাশয় ব্যায়াম শিক্ষক ও ছাত্রগণের কৃতিত্বের বিস্তর প্রশংসা করিয়া বক্তৃতা করিলেন। রাজেন্দ্রলাল সিংহ হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়-বিরচিত একটি সুন্দর কবিতা সুললিত কণ্ঠে আবৃত্তি করেন। সর্ব্বশেষে মনোমোহন বসু মহাশয় প্রদর্শক ও উদ্যোক্তাগণের ভূয়সী প্রশংসা করিয়া ব্যায়াম সম্বন্ধে এইরূপ বলেন। এখানেও দেখা যায় বসু মহাশয় 'স্বাধীনতা' কথাটি উচ্চারণ করিতেছেন—

"বাঙ্গালাদেশে দেহিক উৎকর্ষের এইরূপ উৎসাহ দেখিয়া মনে এইরূপ একটি ভাব উদয় হইতেছে, যেন জ্ঞান নামক পুরুষ বিদ্যা নাম্নী রমণীর সহযোগে একটি অপূর্ব্ব কন্যার উৎপাদন করিলেন। সে কন্যার নাম যুক্তি। যুক্তি দিন দিন বর্দ্ধিতা ও বিবাহের যোগ্যা হইয়া উঠিল। তাহার পিতামাতা সুপাত্রের অভাবে মহা উদ্বিগ্ন। এমন সময় ব্যায়ামের বংশধর সাহস নামা সুপাত্র প্রাপ্ত হইয়া পরমানন্দে তাহাকে ঐরূপ গুণবতী কন্যা সম্প্রদান করিলেন। এই পবিত্র বিবাহ ঘটনা দৃষ্টি করিয়া আমাদের বিলক্ষণ আশা হইতেছে, "স্বাধীনতা" নাম্নী সুরমনোমোহিনী কন্যা জন্মগ্রহণ করিতে পারিবেন।"

জাতীয় ভাব প্রচার

জাতীয় সভার অধিবেশনাদি সম্বন্ধে আর বিশেষ কিছু জানা যায় নাই। মেলার অষ্টম অধিবেশনের পরে ১৮৭৪ খ্রীষ্টাব্দের ৩০ শে মে একটি সভার বিজ্ঞপ্তি পাওয়া যাইতেছে (অমৃতবাজার পত্রিকা, ২৮ মে ১৮৭৪)। ইহাতে কবিবর মধুসূদন দত্তের মেঘনাদবধ কাব্যের দোষ গুণ বিষয়ে রাজনারায়ণ বসুর আলোচনা করিবার কথা ছিল। কিন্তু এ সভা হইয়াছিল বলিয়া মনে হয় না।

জাতীয় সভার আর একটি অধিবেশন হয় ২১ শে জুন দিবসে। এই অধিবেশনের সংক্ষিপ্ত বিবরণ এই—

"গত রবিবারে জাতীয় সভার অধিবেশনে নাটোরের রাজা চন্দ্রনাথ রায়ের একটি বক্তৃতা [The Hindus of the 19th Century] করার কথা ছিল, কিন্তু তিনি সেই দিবস সন্ধ্যার সময় পীড়িত হইয়া পড়েন সুতরাং বক্তৃতা সভায় করা স্থগিত থাকে। অন্যান্য কার্য্যের মধ্যে বাবু মনোমোহন বসু প্রস্তাব করেন যশোর জেলার নড়ালে যে একটি ব্যায়াম শিক্ষোৎসাহিনী সভা সংস্থাপিত হইয়াছে জাতীয় সভা উক্ত সভার অনুষ্ঠাতা হিসাবে এই মহৎ কার্য্যের নিমিত্ত মনের সহিত ধন্যবাদ প্রদান করেন। বাবু শিশিরকুমার ঘোষ প্রস্তাব করেন যে নড়ালের বাবু রাইচরণ রায় যিনি স্বহস্তে শতাধিক ব্যাঘ্র বধ করিয়াছেন, যাঁহার বীরপনা ইংরাজী বাংলা সমুদয় সংবাদপত্রে কীর্ত্তিত হইয়াছে, যাঁহাকে লইয়া দুর্ব্বল বাঙ্গালী জাতি গৌরব করিতে পারেন, জাতীয় সভার এমন পুরুষকে যথোচিত সম্মান করা কর্ত্তব্য, অতএব উক্ত সভা কর্ত্তৃক রাইচরণ বাবুকে একটি সম্মানসূচক স্বর্ণ মেডেল প্রদান করা হয়। উপরোক্ত প্রস্তাবদ্বয় সর্ব্বসম্মতিক্রমে সভা কর্ত্তৃক গ্রাহ্য হয়। সভায় রাজা কমলকৃষ্ণ বাহাদুর, রাজা হরেন্দ্রকৃষ্ণ বাহাদুর, বাবু শ্যামাচরণ সরকার, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর, কুমার গোপীন্দ্র প্রভৃতি প্রধান প্রধান লোক উপস্থিত ছিলেন। রাজা কমলকৃষ্ণ বাহাদুর সভাপতির আসন গ্রহণ করেন।"—'অমৃতবাজার পত্রিকা', ২৫ জুন ১৮৭৪

জাতীয় মেলার পরবর্ত্তী বার্ষিক অধিবেশনে রাইচরণ রায়কে বীরত্ব প্রকাশের জন্য একটি সুবর্ণ পদক দেওয়া হইয়াছিল, পরে জানা যাইবে। জাতীয় সভার আর কোন অধিবেশনের সংবাদ বিজ্ঞাপিত হইতে দেখিতেছি না। তবে ইহাতে দুঃখ করিবার কিছুই নাই। জাতীয় মেলা তথা জাতীয় সভার ভাবাদর্শ নির্দ্দিষ্ট গণ্ডী ছাড়াইয়া সমগ্র দেশমধ্যে এই সময় ব্যাপ্তিলাভ করে। বাঙালী সৈনিক শ্রেণীতে প্রবেশ লাভের জন্য, উদ্‌গ্রীব, সাধারণ রঙ্গমঞ্চে জাতীয় শৌর্য্য-বীর্য উদ্দীপক নাটক অভিনয়ের জন্য ব্যগ্র, সাহিত্যে ও গানে জাতীয় ভাব প্রকাশে উদ্যত। জাতীয় মেলা ও জাতীয় সভার আন্দোলনের ফলে এমন-কি গভর্ণমেন্ট পর্য্যন্ত বিদ্যালয়সমূহে ব্যায়াম শিক্ষার সূচনা করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। ইহা সিবিল সার্ব্বিস পরীক্ষারও বিষয়ীভূত হইয়াছিল।

বাঙালী যুবক সরকারী সৈন্য-বিভাগে প্রবেশের যে সম্পূর্ণ উপযুক্ত ইহা প্রতিপাদন করিয়া নবগোপাল মিত্র ১লা জুন কলিকাতা টাউন হলে এক বক্তৃতা করিলেন। 'অমৃতবাজার পত্রিকা' (৪ জুন ১৮৭৪) লেখেন—

"গত সোমবার টাউন হলে আমাদের দেশহিতৈষী বাবু নবগোপাল মিত্র একটি অপূর্ব্ব বক্তৃতা করিয়াছেন।...ইনি সেই মহাপুরুষ যিনি দেশ উদ্ধার করিবার নিমিত্ত আপন প্রাণ পণ করিয়াছেন।...নবগোপাল বাবু তাঁহার বক্তৃতায় নানারূপ উদাহরণ ও যুক্তির দ্বারা সপ্রমাণ করিয়াছেন যে আমাদের দেশীয়রা যেরূপ বিদ্যাবুদ্ধির দ্বারা বিখ্যাত হইয়াছেন, যদি গভর্ণমেন্ট ইহাদিগকে যুদ্ধক্ষেত্রে প্রবেশ করিতে দেন তাহা হইলে ইঁহারা সমরেও বিখ্যাত হইতে পারেন।... তিনি বিশ্বাস করেন যে আমরা যে এ পর্য্যন্ত যুদ্ধক্ষেত্রে কোনরূপ বিক্রম দেখাইতে পারি নাই সে আমাদের দোষ না। ইংরাজেরা যে আমাদিগকে যুদ্ধক্ষেত্রে প্রবেশ করিতে দেন নাই ইহা কেবল সেই নিমিত্ত।..."

এই সময় জাতীয় ভাবোদ্দীপক বহু নাটক রচিত ও অভিনীত হয়। এ প্রসঙ্গে মনোমোহন বসুর 'হরিশচন্দ্র-নাটক' (পৌষ ১২৮১) বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তিনি ইহাতে যে দুইটি গান সংযোজনা করেন তাহাতে আমাদের তখনকার অবস্থার একটি সুন্দর চিত্র পাওয়া যায়। গান দুইটি মুদ্রিত হইল।

১

রাগিণী বিভাস—তাল একতালা

নরবর নাগেশ্বর শাসন কি ভয়ঙ্কর!
দে কর, দে কর, রব নিরন্তর করের দায় অঙ্গ জর জর!

সিন্ধুবারি যথা শুষে দিনকর,
শোণিত শোষণ করে শত কর,
করদাহে নর নিকর কাতর,
রাজা নয়, যেন বৈশ্বানর! ১॥

ভূমির কর মাত্র ছিল দেশে কর,
কে জানিত এত কর দুখাকর?
কর বিনা রাজা করে না বিচার,
ধর্ম্মে নয়, ধনে জয়ী নর! ২॥

বাড়ী-ঘর-আলো-শান্তি-জল-কর—
স্থলপথে আর সেতুর উপর,

জলে গেলে তরী ধরে রাজচর—
শূন্য বই গতি নাহি আরো! ৩॥

গো-অশ্ব-শকট-কর বহুতর—
পশু-নর, কারো নাহিক নিস্তার!
নীচ কর্ম্মে খাটে তাদের ধরে কর—
নীচাশয় এম্নি রাজ্যেশ্বর! ৪॥

আয়-কর শুনে, গায় আসে জ্বর!
অস্থি-ভেদী রথ্যা-কর কি দুষ্কর!
লবণটুকু খাব, তাতেও লাগে কর!
কত আর কব মুনিবর! ৫॥

মাদকতা-কর ছলে দেশময়,
মদ্যের বিপণি; নিত্য বৃদ্ধি হয়;
সে গরলে দগ্ধ ভারত নিশ্চয়!
হাহাকার রব নিরন্তর! ৬॥

২
রাগিণী বিভাস—তাল একতাল

দিনের দিন সবে দীন হয়ে পরাধীন!
অন্নাভাবে শীর্ণ, চিন্তা-জ্বরে জীর্ণ, অপমানে তনু ক্ষীণ!
সে সাহস বীর্য্য নাহি আর্য্য-ভূমে,
পূর্ব্ব গর্ব্ব সর্ব্ব খর্ব্ব হ'লো ক্রমে,
চন্দ্র-সূর্য্য-বংশ অগৌরবে ভ্রমে,
লজ্জা-রাহু মুখে লীন! ১॥

অতুলিত ধন রত্ন দেশে ছিল,
যাদুকর জাতি মন্ত্রে উড়াইল,
কেমনে হরিল কেহ না জানিল,
এম্নি কৈল দৃষ্টিহীন! ২॥

তুঙ্গদ্বীপ হ'তে পঙ্গপাল এসে,
সার শস্য গ্রাসে, যত ছিল দেশে,
দেশের লোকের ভাগ্যে খোসা ভুষী শেষে,
হায় গো রাজা কি কঠিন! ৩॥

তাঁতি, কর্ম্মকার, করে হাহাকার,
সূতা জাঁতা টেনে অন্ন মেলা ভার—
দেশী বস্ত্র অস্ত্র বিকায় নাকো আর,
হ'লো দেশের কি দুর্দ্দিন! ৪॥

আজ যদি এ রাজ্য ছাড়ে তুঙ্গরাজ
কলের বসন বিনা, কিসে রবে লাজ?
ধ'র্ব্বে কি লোক তবে দিগম্বরের সাজ—
বাকল, টেনা, ডোর, কপীন! ৫॥

ছুঁই সূতা পর্য্যন্ত আসে তুঙ্গ হ'তে,
দিয়াশলাই কাটী, তাও আসে পোতে—
প্রদীপটি জ্বালিতে; খেতে, শুতে, যেতে
কিছুতেই লোক নয় স্বাধীন! ৬॥

হিন্দুকলেজের কৃতী ছাত্র ও সে যুগের একজন বিচক্ষণ সাহিত্যিক ছিলেন মনীষী ভোলানাথ চন্দ্র। তিনি ইংরেজীতেই বেশীরভাগ লিখিতেন। তিনি শম্ভুচন্দ্র মুখোপাধ্যায়-সম্পাদিত 'মুখার্জ্জিস ম্যাগাজিনে' (আগষ্ট ১৮৭৪ এবং জানুয়ারি-জুন ১৮৭৬) ভারতবাসীর ব্যবসা শিল্প বাণিজ্য বিলোপ ও আর্থিক দুর্গতির কথা ওজস্বিনী ভাষায় ব্যক্ত করিয়া ইহা হইতে উদ্ধারের উপায় নির্দ্দেশ করিয়াছেন।[১] আমাদের পূজা-পার্ব্বণে, শ্রাদ্ধাদি ক্রিয়াকলাপে, শয়নাগারে, এমন-কি দূরস্থ পল্লীর দীনতম কুটিরে তখন বিলাতী দ্রব্য প্রবেশ করিয়াছে। ইহার প্রতিকারের উপায় সম্বন্ধে ভোলানাথ বলিয়াছেন।

"Without using any physical force, without incurring any disloyalty, without praying for any legislative succour, it lies quite in our power to regain our lost position. It would be no crime for us to take to the only but most effectual weapon—moral hostility—left us in our last extremity. Let us make use of this potent weapon by resolving to non-consume the goods of England. Let us always remember that the progress of India rests with the people

১. শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ ঘোষ "মনীষী ভোলানাথ" পুস্তকে (২য় সং, পৃ ১৫৪-৭৪) উক্ত প্রবন্ধনিচয় হইতে বহু আবশ্যক অংশ উদ্ধৃত করিয়াছেন।

themselves, and that her material prosperity must spring more from their own energy, perseverance and self-reliance than from any modification of the existing laws."

ভোলানাথের মতে অন্য কাহারও মুখাপেক্ষী না হইয়া আমরাই ইহার প্রতিকার করিতে পারি। সকলে মিলিয়া প্রতিজ্ঞা করিব যে, আমরা কেহই বিলাতী দ্রব্য স্পর্শ করিব না। তাহা হইলে আমাদের উদ্দেশ্য অনেকাংশে সিদ্ধ হইতে পারে। জাতীয় মেলার অন্যতম উদ্দেশ্য—আত্মনির্ভর। ভোলানাথও বলিতেছেন, এই আত্মনির্ভর দ্বারা আমাদের কার্য্য সিদ্ধ হইবে। তিনি সঙ্গে সঙ্গে এই আশার বাণীও আমাদের শুনাইয়াছেন—

"The increased knowledge, energy and wealth of the Indians of the 20th or 21st century, would enable them to follow both agriculture and manufactures, to develop the subterranean resources, to open mines and set up mills to launch ships upon the ocean and carry goods to the doors of consumers in England and America."

অর্থাৎ, বিংশ ও একবিংশ শতাব্দীর ভারতবাসীরা তখন মাত্র কৃষিজীবী থাকিবে না, কৃষি ও শিল্প উভয় কর্ম্মেই তাহারা লিপ্ত হইবে, ভূগর্ভস্থ খনিজ দ্রব্যাদি উদ্ধার করিবে, কল স্থাপন করিবে, সমুদ্রে জাহাজ ভাসাইয়া ইংলণ্ড আমেরিকাবাসীদের ব্যবহারের নিমিত্ত তাহাদেরই গৃহকোণে আমাদের শিল্পজাত দ্রব্য পৌঁছাইয়া দিবে। স্বদেশী আন্দোলনের সূচনার চল্লিশ বৎসর পূর্ব্বে বঙ্গদেশে জাতীয় মেলা যে জাতীয়তার প্লাবন বহাইয়াছিল তাহার দরুনই তখন আমাদের এসব চিন্তা সম্ভবপর হয়।

একটু পূর্ব্বেই বলিয়াছি, জাতীয় মেলা প্রবর্ত্তিত ব্যায়াম-অনুশীলন তৎকালীন সরকার গ্রহণ করিয়া নিজ নিজ বিদ্যালয়ে প্রচলিত করেন। ১৮৭৩, ১১ই এপ্রিলে জাতীয় সভার উদ্যোগে কলিকাতায় একটি "মহা-ব্যায়াম-প্রদর্শন" হইয়াছিল। ১৮৭৫, ৭ই জানুয়ারী সরকার এইরূপ একটি ব্যায়াম-প্রদর্শনের আয়োজন করেন। সরকারী স্কুলের ছাত্রদের মধ্যেই ইহা নিবদ্ধ রাখা হইবে জানিয়া 'অমৃতবাজার পত্রিকা' (১৭ ডিসেম্বর ১৮৭৪) ইংরেজী স্তম্ভে লিখিয়াছিলেন—

To hold a gymnastic tournament without the students of the National [School] is to perform the act of Hamlet without the hero. We do not think that without the trained students of the school the tournament cannot be made worth seeing.

যাহা হউক, জাতীয় বিদ্যালয়ের ছাত্রদের বাদ দিয়াই সরকারী ব্যায়াম-প্রদর্শন হইয়া গেল। ইহার বিবরণও কম কৌতুকপ্রদ নহে, এজন্য 'সুলভ-সমাচার' (১২ জানুয়ারী ১৮৭৫) হইতে ইহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদত্ত হইল—

"বাঙ্গালীর ছেলেরা সময়ে আহার, সময়ে নিদ্রা ও সকল প্রকার খেলা পরিত্যাগ করিয়া দিনরাত্রি পুস্তকের উপর বিড় বিড় করিয়া বকিয়া ক্রমে জুজু হইবার উপক্রম হইতেছিল, আমাদের ছোটলাট ক্যাম্বেল সাহেব ইহা দিব্য চক্ষে দেখিয়া এদেশীয় সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় ব্যায়াম শিক্ষা, সাঁতার দেওয়া, ঘোড়ায় চড়া এবং ভূমি জরিপের ব্যবস্থা করিয়া দেন। তাঁহারই যত্নে ও ইচ্ছায়

এক্ষণে অনেক স্থলে ব্যায়াম আরম্ভ হইয়াছে। ভিন্ন ভিন্ন স্কুলের ছেলেরা কে কেমন এই বিদ্যা শিখিতে পারিয়াছে তাহার পরীক্ষার জন্য গত বৃহস্পতিবার [৭ জানুয়ারী ১৮৭৫] বেলা ১১টা হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত আলিপুরের ছোটলাট সাহেবের বাড়ীর মাঠে ব্যায়াম শিক্ষার লড়াই হইয়া গিয়াছে। হুগলী, পাটনা, ঢাকা ও বহরমপুর কলেজ, কলিকাতার মাদ্রাসা কলেজ, কলিকাতার নর্ম্মাল স্কুল, হাবড়া স্কুল ও বারাকপুর স্কুল প্রভৃতি নানা স্থানের বিদ্যালয় হইতে ছেলেরা পরীক্ষা দিতে আসিয়াছিল। অনেক সাহেব এবং রাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর, বাবু কৃষ্ণদাস পাল, মান্যবর মৌলবী আব্দুল লতিফ খাঁ প্রভৃতি সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোক তামাসা দেখিতে ও বালকদিগকে উৎসাহ দিতে আসিয়াছিলেন। জোড়াদণ্ড (প্যারেলাল বার্স), দোল (ট্রাপিজিয়ম), অঙ্গুরীয় (রিঙ্গস্), মই, খুঁটি-দণ্ড এবং কাঠের ঘোটকের উপর বালকেরা আশ্চর্য্য ক্রীড়া সকল করিয়া দর্শকদিগকে মোহিত করিয়া দিল। হস্তের কব্জা, বাহু, সমস্ত হাত, সমুদায় শরীরের উপর জোর দিয়া বাজীকরদিগের অপেক্ষাও অদ্ভুত কুস্তি সকল দেখাইতে লাগিল। দুই হাতের উপর ভর দিয়া পা আকাশের দিকে উচ্চ করিয়া জোড়াদণ্ডের উপর চলিয়া যাইতে লাগিল, কেহ দড়ির উপরে গিয়া সোজা লম্বা হইয়া খাড়া হইয়া রহিল, কেহ অঙ্গুরীয় মধ্যে পা প্রবেশ করিয়া দিয়া চরকী বাজীর মত ঘুরিতে লাগিল, কেহ দড়ির উপর ডন খাইতে আরম্ভ করিল, কেহ মই-এর পশ্চাৎ দিক হইতে ঝুলিয়া অদ্ভুত রূপে তড়াক তড়াক করিয়া লাফাইয়া উঠিয়া চলিল, দণ্ডের উপর দুইটা ছেলে পরস্পরের বুক পা দিয়া জড়াইয়া নাগর দোলার মত ঘুরিতে লাগিল, এইরূপ নানা চতুরতা ও কৌশল দেখাইয়া ভিন্ন ভিন্ন কলেজ স্কুলের ছেলেরা পরস্পরে জিতিতে ও পরস্পরকে হারাইতে লাগিল। আশ্চর্য্য! বাঙ্গালীর ছেলে হইয়া রৌদ্রে পড়িয়া সমস্ত দিন এইরূপ ঘোর পরিশ্রম করিয়াও দমিল না। লড়াইয়ের মধ্যে সকলেই বাঙ্গালীর ছেলে, কেবল ৩ জন মুসলমান ও একটি সাহেবের ছেলে ছিল।"

এই প্রতিযোগিতায় ঢাকা কলেজের ছাত্রবৃন্দ শীর্ষস্থান অধিকার করে। পরবর্ত্তী ১৪ই জানুয়ারী 'অমৃতবাজার পত্রিকা' পুনরায় লেখেন যে, "নেশন্যাল স্কুলের ছাত্রদিগকে পরীক্ষার অনুমতি না দেওয়ায় অত্যন্ত অন্যায় কাজ হইয়াছে। তবে আমরা এ গৌরব করিতে পারিব যে, এ দেশে যে ব্যায়াম চর্চ্চার উন্নতি হইয়াছে তাহার প্রধান কারণ উক্ত স্কুলের প্রতিষ্ঠাতা বাবু নবগোপাল মিত্র।"

নেশন্যাল স্কুল বা জাতীয় বিদ্যালয়

জাতীয় মেলার প্রধান উদ্যোক্তা নবগোপাল মিত্র মহাশয় এ যাবৎ বিভিন্নভাবে ব্যায়ামাগার ও অন্যান্য বিদ্যাশিক্ষার আয়োজন করিতেছিলেন। কিন্তু ১৮৭২ সনের ১লা এপ্রিল হইতে এই সকল বিভিন্ন প্রচেষ্টা কেন্দ্রীভূত করিবার জন্য ১৩নং কর্নওয়ালিশ ষ্ট্রীটস্থ ক্যালকাটা ট্রেনিং একাডেমি ভবনে একটি নেশন্যাল স্কুল স্থাপন করিলেন। সকালে ও বিকালে এখানে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা হয়। নিম্নের বিজ্ঞপ্তিটি হইতে প্রতিষ্ঠাকালে কি কি বিষয় শিক্ষাদানের ব্যবস্থা হয় জানা যাইবে :

NATIONAL SCHOOL

(For the cultivation of Arts, Music and for physical Training)

Opened from the 1st of April last at the premises of the Calcutta Training Academy, No. 13, Cornwallis Street.

Class	*On what days of the week to be opened and when*	*Fee*
Arts		
Drawing and Modelling	Monday and Wednesday from 8-30 to 10-30 a.m.	0 8 0
Music	Thursday and Saturday from 7-30 to 9 p.m.	1 0 0
Physical Education	Thursday and Saturday from 5 to 6-30 p.m.	0 8 0

Moral instructions will also be imparted

National Press
April, 1872

For admission apply to
Nobogopal Mitter[১],

এই বিজ্ঞপ্তি হইতে জানা যাইতেছে যে, প্রতিষ্ঠাকালে নেশন্যাল স্কুলে মাত্র চিত্রাঙ্কন, সঙ্গীত ও ব্যায়াম শিক্ষার ব্যবস্থা হইয়াছিল। প্রতিষ্ঠার ছয় মাসের মধ্যেই ইঞ্জিনীয়ারিং ও সার্ভেয়িং এবং রসায়নবিদ্যা শিক্ষারও ব্যবস্থা হইল। আর্টস্ স্কুলের শ্যামাচরণ শ্রীমানী এবং স্কুল অফ ফিজিক্যাল সায়ান্সের রাজকৃষ্ণ মিত্র যথাক্রমে উক্ত বিষয়সমূহ শিখাইবার ভার গ্রহণ করিলেন। পাঠের সময় ও বেতনাদি[২] নিম্নাংশ হইতে জানা যায়—

১. *The National Paper*, July 10, 1872

২. *The National Paper*, September 4, 1872

Geometrical Drawing etc. etc.	Wednesday, Friday and Saturday from 8 to 9 a.m.	2 0 0
Chemistry	Tuesday and Thursday from $6\frac{1}{2}$ to $8\frac{1}{2}$ p.m.	1 0 0

শ্যামাচরণ শ্রীমানী ইঞ্জিনীয়ারিং ও সার্ভেয়িং (Geometrical Drawing) শিক্ষার গুরুত্ব প্রতিপাদন করিয়া এই শ্রেণী খুলিবার দিন ১লা আগষ্ট স্কুল গৃহে একটি বক্তৃতা প্রদান করেন। তাহাতে তিনি বলেন :

The study of Geometrical Drawing gives one the power to delineate, by plans, elevations, and sections, the length, breadth and height, or in other words the magnitude and make of any object, where a house, a machine, a bridge, a boat or a fort, and as all such delineations could be made by the same rules, and the same principles, a knowledge of this branch of Art is of equal importance to the Architect, the Mechanist, the Engineer (I should also mention the would-be Indian C.S.) and in fact to all classes of mechanical workmen, such as carpenters, bricklayers, blacksmiths etc., etc.

নেশন্যাল স্কুলে উদ্ভিদ্‌বিদ্যা ও অশ্বারোহণ শিক্ষারও ক্রমে ব্যবস্থা হয়। পরবর্ত্তী অক্টোবর হইতে অশ্বারোহণ শিক্ষাদান সম্বন্ধে এইরূপ জানা যাইতেছে—

"আগামী ইংরেজী মাস হইতে নেশন্যাল স্কুলে ঘোড়া চড়ার একটি নূতন শ্রেণী খোলা হইবেক। মাসিক বেতন ৫ পাঁচ টাকা।"—'মধ্যস্থ' ১৬ ভাদ্র, ১২৪৮, অতিরিক্ত সংখ্যা।

সে-যুগের বহু ছাত্র এই নেশন্যাল স্কুলেও সকালে বিকালে যোগদান করিয়া বিশেষ বিশেষ বিষয়ে পারদর্শী হইয়াছিলেন। পরবর্ত্তী কালে ইহারা অনেকে খ্যাতিলাভ করিয়াছেন। দেশপূজ্য সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভ্রাতা ব্যায়ামবীর জিতেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বিখ্যাত বাগ্মী বিপিনচন্দ্র পাল, ডাঃ সুন্দরীমোহন দাস প্রভৃতি নবগোপালের নেশন্যাল স্কুলে ব্যায়াম শিক্ষা করিতেন। নেশন্যাল স্কুলের পূর্ব্বেই নবগোপাল সম্ভবতঃ অশ্বারোহণ শিক্ষার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। কারণ সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর লিখিতেছেন—

"তিনি একটা অশ্বশালা খুলেছিলেন, তাকে সবাই বলত নবগোপালের Circus, তাতে আমরা কেউ কেউ ঘোড়ায় চড়া শিখতে যেতুম।"—'আমার বাল্য কথা ও আমার বোম্বাই প্রবাস', পৃ. ৩৯।

ভারত সভা

জাতীয় মেলা কয়েক বৎসর যাবৎ যেরূপ সাড়ম্বরে চলিয়া আসিতেছিল, নবম ও দশম অধিবেশনে সেরূপ সমারোহ না হওয়ায় 'সোমপ্রকাশ', 'সাধারণী' প্রভৃতি সংবাদপত্র আক্ষেপ করিয়াছিলেন। জাতির উন্নতিকল্পে বিভিন্ন বিষয়ে এই মেলা যেরূপ প্রেরণা দিতেছিল তাহাতে ইহার অবনতিতে আক্ষেপ হইবারই কথা। তবে, এতদিন পরে পূর্ব্বাপর্য্য আলোচনা করিয়া দেখিলে মনে হয় জাতীয় মেলা যে উদ্দেশ্যে আবির্ভূত হইয়াছিল তাহা জাতির শিক্ষিত-সাধারণের মধ্যে তখনই অনেকাংশে অনুপ্রবিষ্ট হয়। ছাত্রসভায় সুরেন্দ্রনাথের বক্তৃতা, ইণ্ডিয়ান লীগ প্রতিষ্ঠা, রঙ্গমঞ্চে জাতীয় ভাবোদ্দীপক নাটকাদির অভিনয়, জাতীয় সঙ্গীত পুস্তকাকারে প্রকাশ, বাংলা সাহিত্যের উন্নতি-বিষয়ে আলোচনা প্রভৃতির কথা আমরা জানিতে পারিয়াছি। জাতীয় মেলা যে বাঙালীর প্রাণে স্বদেশানুরাগ ও স্বাবলম্বন-স্পৃহা উদ্রেক করিয়াছিল, সাক্ষাৎ বা পরোক্ষভাবে এসব তাহারই অনুক্রম বলিলে এতটুকুও অত্যুক্তি করা হইবে না।

দশম অধিবেশনের পরবর্ত্তী আর একটি প্রধান ঘটনা—১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দের ২৬ শে জুলাই কলিকাতায় ইণ্ডিয়ান এ্যাসোসিয়েশন বা ভারত-সভা প্রতিষ্ঠা। এই সভা প্রতিষ্ঠার মূলে প্রত্যক্ষ কি কি কারণ ছিল সে সম্বন্ধে এখানে কিছু বলিবার আবশ্যক নাই, তবে স্বদেশবাসী জনসাধারণের হিতকল্পে যে ইহা প্রতিষ্ঠিত হয় সে সম্বন্ধে দ্বিমত নাই। মূল উদ্দেশ্য বর্ণনা করিতে গিয়া চন্দ্রনাথ বসু বলেন, "যে যে বিষয়ে দেশের ইষ্টানিষ্ট অনুস্যূত রহিয়াছে, যে যে বিষয়ের উপর দেশীয় জনসাধারণের সুখ দুঃখ নির্ভর করিতেছে, সভা তৎসমস্ত বিষয়েই লক্ষ্য করিয়া কার্য্যক্ষেত্রে প্রবিষ্ট হইবেক। উদারতা সহকারে এরূপ প্রশান্তভাবে কার্য্য করাই সভার উদ্দেশ্য।"[১] স্বদেশের হিতকল্পে দশ জনে মিলিয়া কার্য্য করিবার যে সাধু ইচ্ছা তখনকার বাঙালী মনে উদিত হইয়াছিল তাহার মূলে রহিয়াছে প্রধানতঃ এই জাতীয় মেলার শিক্ষা। এই দিনকার সভায় জাতীয় মেলার প্রধান উদ্যোক্তা নবগোপাল মিত্র মহাশয়ও যোগদান করেন এবং ভারত-সভার অধ্যক্ষ-সমিতির সভ্যগণের নাম উল্লেখ করিয়া ইহা গঠনের প্রস্তাব উত্থাপন করেন। তিনিও ইহার অন্যতম অধ্যক্ষ হইলেন। ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকারের বিজ্ঞান সভাও এই সময়ে (২৯ শে জুলাই ১৮৭৬) প্রতিষ্ঠিত হইল।

১. "ভারত সভা", 'সাধারণী', ৩০শে জুলাই, ১৮৭৬।

বারুইপুরের মেলা

জাতীয় মেলার ষষ্ঠ অধিবেশনের পর ইহার কার্য্যকলাপ বিশেষভাবে প্রসারলাভ করে। পূর্ব্বে বলিয়াছি, জাতীয় মেলার আদর্শে বারুইপুর, দিনাজপুর প্রভৃতি অঞ্চলেও মেলা অনুষ্ঠানের সূত্রপাত হয়। বারুইপুরে তৃতীয় বার্ষিক মেলা হয় ১২৭৮ সালের ফাল্গুন-সংক্রান্তি দিবসে। মূল মেলার উদ্যোক্তাগণ ইহাতেও যোগদান করিয়াছিলেন। মনোমোহন বসু মহাশয় এই অধিবেশনে একটি আবেগপূর্ণ বক্তৃতা করেন। তাঁহার শ্রোতা পল্লীবাসী, সুতরাং পল্লীবাসীদের বোধগম্য করিয়া তিনি বক্তৃতা করিলেন। মেলার উদ্দেশ্য বিবৃত করিতে গিয়া তিনি বলেন—

"এই মেলা রাধাকৃষ্ণের উৎসবের জন্য নয়; গঙ্গার উদ্দেশ্যেও নয়; পীরের মহিমাসূচকও নয়; এই মেলার উদ্দিষ্টা দেবী তন্ত্রোক্তা নন—পুরাণোক্তা নন! ইঁহার নাম 'উন্নতি'। উন্নতি দেবীকে প্রসন্ন করিবার জন্যই—তাঁহার অর্চ্চনা করিবার জন্যই এই মেলা প্রতিষ্ঠিতা হইয়াছে। শারদীয়া মহাদেবীর ন্যায় এই উন্নতি দেবীও দশভুজা। তাঁহারও দশ হস্তে দশবিধ অস্ত্র আছে;—প্রথম হস্তে কৃষি, দ্বিতীয় হস্তে উদ্যানতত্ত্ব, তৃতীয় হস্তে বাণিজ্য, চতুর্থে শিল্প, পঞ্চমে ব্যায়াম, ষষ্ঠে সাহিত্য, সপ্তমে প্রতিযোগিতা, অষ্টমে সামাজিকতার জীর্ণ সংস্কার, নবমে স্বাবলম্বন এবং দশম হস্তে ঐক্য! "উদ্যম" নামক সিংহের পৃষ্ঠে আরূঢ়া হইয়া উন্নতি দেবী এই সব অস্ত্র বিশেষতঃ শেষোক্ত অস্ত্র দ্বারা দৈব্যপতি 'পরবশ্যতার' বক্ষস্থল বিদ্ধ করিতেছেন। দৈত্যরাজের সর্ব্বাঙ্গে রুধিরধারা, চক্ষু রক্তবর্ণ, দেহ কম্পিত জরজর, পরাস্তপ্রায়, তথাপি কি আশ্চর্য্য হারিয়াও হারিতেছে না—মরিয়াও মরিতেছে না! দেখে আতঙ্ক হয়, ব্রহ্মার বর পাইয়া অমর হইয়া কি দুষ্ট দৈত্য ভারত পীড়নে অবতীর্ণ হইয়াছে? কিন্তু ভরসা আছে বরদান কালে কোনো গুপ্ত ছিদ্র না রাখিয়া দেবতারা অসুর ও রাক্ষসকে বর দান করেন না। আমাদের এই দুর্জ্জয় শত্রুদমনেরও অবশ্য কোনো গুপ্ত রন্ধ্র আছে, আমরা তাহার নিগূঢ় জানি না। সেই গুপ্ত ছিদ্র পাইবার প্রয়াসে—অমঙ্গলরূপী অসুর দলের পিতা, ভর্ত্তা ও অধিনায়ক সেই পরবশ্যতার দমন প্রয়াসেই উন্নতি দেবীর ঘটস্থাপন স্বরূপ এই মেলার অনুষ্ঠান!"

প রি শি ষ্ট

রাজনারায়ণ বসু রচিত অনুষ্ঠান-পত্র

এই অনুষ্ঠান পত্রখানিতে যে-সব বিষয় লিখিত ও আলোচিত হয় তাহাকেই ভিত্তি করিয়া জাতীয় মেলার প্রতিষ্ঠা :

A Society for the Promotion of National Feeling among the Educated Natives of Bengal

Now the European ideas have penetrated Bengal, the Bengalee mind has been moved from the sleep of ages. A restless fermentation is going on in Bengalee Society. A desire for change and progress is everywhere visible. People discontented with old customs and institutions are panting for reform. Already a band of young men have expressed a desire to sever themselves at once from Hindu Society and renounce even the Hindu name. It is to be feared that the tide of revolution may sweep away whatever good we have inherited from our ancestors. To prevent this catastrophe and to give a national shape to reforms, it is proposed that a Society be established by the influential members of native society for the promotion of national feeling among the educated natives of Bengal. Without due cultivation of national feeling, no nation can be eventually great. This is a fact testified to by all history.

The Nationality Promotion Society shall first of all use their best endeavours to revive the national gymnastic exercises. Half a century ago, there was a gymnasium in almost every village. This old practice should be again brought into life. The remark, lately made by our Excellency the Governor-General on seeing the boys of a Vernacular School at Ooterparah, to the effect, that the rising generation of Bengalees is not so strong and able-bodied as the previous one, is quite true. The cause of it is the too great importance attached now-a-days to bookish education in neglect of physical. The consequences are want of energy, a sickly habit of body, and premature old age and death. Many a young man after shining at college has broken down early and proved a regular incapable in after life. The Nationality Promotion Society shall publish tracts in Bengalee on the importance of physical education with special reference to its prevalence in ancient times, quoting passages from Sanskrit books in proof of such prevalence, and shall afford pecuniary aid to gymnasia established in the most important places in Bengal, where Hindu gymnastics will be taught. The Society will also publish tracts in Bengalee, giving, by instances quoted from the ancient history of the country, proofs of the military

prowess of the ancient Bengalees, and mentioning isolated instances of the existence of such prowess in modern Bengalees also, such as the celebrated "fighting Moonsiff" who figured in the late Sepoy Rebellion on behalf of the English. The Nationality Promotion Society shall take into consideration in connection with this subject that of the best means of improving the present very weak and innutritious diet of the Bengalee, which has in fact deteriorated from that of former generations.

The Nationality Promotion Society shall establish a Model School for instruction in Hindu music. Every nation has its music. It is to be regretted that the majority of the educated natives of India neither cultivate European nor native music. If they have any taste for music they have a little for the rude one of Jattras. The writer of this article recollects the cultivation of Hindu Music having been general in his infancy. Now little attention is paid to it by the general mass of educated natives. It will be the duty of the Society to establish a Hindu Musical School and cause such songs to be sung by its students as have a moral scope and have a tendency to infuse partriotism and martial enthusiasm into the heart.

The Nationality Promotion Society shall also establish a school of Hindu Medicine, where Hindu Materia Medica, and practice of physic will be taught freed from the error and absurdities that disfigure them. There are many excellent Hindu medicines which have been found to be very efficacious in some severe disorders. It is to be highly regretted that the knowledge of such medicines is being lost. It would have indicated want of foresight on the part of Providence, if India, so rich in every other thing, could not have produced medicinal herbs calculated to heal the diseases of its inhabitants. The hopes, that were formed of the graduates of the Medical College enriching English Pharmacopœa with Hindu Medicines, after due trial and experiment have proved vain. The Nationality Promotion Society shall endeavour to fulfil such expectations. The teacher of the proposed Hindu School of Medicine should be one who is acquainted with both English and Hindu medical sciences.

The Nationality Promotion Society will publish in the Bengalee the results of the researches of the Sanskrit scholars of Europe in the department of Indian Antiquities giving special prominence to their descriptions of prosperity and glory of ancient India, physical, intellectual, moral, social, political, literary and scientific. It will collect and publish both in English and Bengalee testimonies in favour of native character. It will publish in those languages tracts containing the panegyrics pronounced by European writers on the merits of the people of ancient and modern India. It will also publish in the Bengalee, biographies of the illustrious men of Ancient and Modern India, especially of Bengal, containing translations of the eulogiums pronounced upon them by European writers.

The Nationality Promotion Society shall afford every encouragement in their power to the cultivation of Sanskrit. It shall patronize the publication of important Sanskrit works, co-operating with the Asiatic Society of Bengal in this respect and shall offer pecuniary rewards or panegyrical addresses to the best Sanskrit scholars of Bengal.

The Nationality Promotion Society shall make it binding upon its members to ground the knowledge of their sons in their mother-tongue before giving them an English education. Education both in Bengalee and English, if carried on simultaneously, does great injury to the Bengalee education of a student, as he pays greater attention to the English than to the Bengalee language. Even for the sake of English education, we should ground our children's knowledge in their mother-tongue, before setting them to learn English. If a boy, after studying the Bengalee for six or seven years, study English, he makes rapid progress in the last mentioned language, and gets clearer ideas of what he reads in it than he would otherwise have done. Vernacular Scholarship-holders are found by experience to be the best boys in an English school. Any man who has the least patriotic feeling will not neglect to ground his sons in their mother-tongue first of all before giving them an English education.

The Nationality Promotion Society shall try its best to prevent the daily increasing corruption of the colloquial language of the educated natives who mix, in common conversation, English words with Bengalee in the most ridiculous manner imaginable. An idea which can be easily expressed in the Bengalee, they express by an English word. Southey says in his essay on style : "Ours is a noble language, a beautiful language. I can tolerate a Germanism for family sake; but he who uses a Latin or a French phrase where a pure old English word does as well, ought to be hung, drawn and quartered for high treason against his mother-tongue." If our educated natives had a tittle of such patriotic love for their mother-tongue, they would not commit such gross violations of propriety and taste in their common conversation as they are at present observed to do. The poverty of the Bengalee is no excuse as such poverty is not real but imaginary. The Bengalee language has of late been much enriched by the exertions of some of the educated natives whose names will be held in grateful remembrance by posterity. Even if the Bengalee were really a poor unfurnished language, it would be the duty of every patriot to improve it by constant use of it in a pure form in conversation. It must be admitted that it is impossible to avoid using English words to express particular scientific ideas, particular posts and offices, certain public buildings, particular furniture, etc., etc., for which there are no equivalents to the Bengalee language. We would be quite unintelligible if we use new coined Bengalee equivalents or such as have not come into common use in order to express

the above ideas,* but it is quite unpardonable on the part of an educated native to express in English what he can easily do in the Bengalee. He should speak either pure Bengalee or pure English, but he should not jumble up both the languages. At present the colloquial language of the educated natives is a *lingua franca*, a most corrupt jargon, shocking, though we are unconscious of the same, to men of sense and good taste and reflecting great disgrace on us as a nation. An European gentleman would laugh to hear our conversation. Our written language is receiving daily improvements, but it is to be regretted that our colloquial language is so much neglected. No nation can make rapid strides in the path of progress unless they possess a highly developed language fit to answer all the requirements of conversation of writing. The Revd. Mr. Richards in his address to the University of Madras, says ; "Gentlemen, let me say there is but little hope of a nation, until it has some sense of nationality; and nationality without a national language, which is the free spontaneous outcome of the national mind, is a delusion. Probably, the best index to the growth of a people is growth and development of its language. Moreover, there is an interchange of cause and effect; help a people to develop their language in accordance with its own laws and you help them to acquire freedom of thought, and so gradually the other habits which are necessary to the formation of national character. I appeal then to your patriotism. I appeal to you on behalf of your mother-tongue ; it is well worthy your regard."

The Nationality Promotion Society shall make it binding upon its members to correspond with each other in the Bengalee. The Members of no nation correspond with each other in a foreign language. No English man for instance would correspond with another in French or German. Why should educated natives then insult their mother-tongue by writing letters to each other in English? Is our language so poor as to render it too difficult for one to write a common letter in it? It is excusable, nay more, it is proper, on the part of youths studying English, or even those who have recently left College to correspond with each other in English for the sake of acquiring proficiency in English writing ; but it is not at all proper on the part of elderly people to do so. Business letters that require to be written in English should of course be written in that language.

The Nationality Promotion Society shall endeavour to prevail upon their countrymen to hold in the Bengalee language the proceedings of such societies as do not require the co-operation of Englishmen, and are exclusively composed of Bengalees, or have not as their object the improvement of youth in English speaking or writing. If it be necessary to publish such proceedings for the

---

* Persian words that have been naturalized into the Bengalee language and for which common unpedantic pure Bengalee words cannot be substituted should of course be considered as Bengalee words.

information of Government and the European public, they can be translated into English, for the purpose. Although the time is not yet ripe for the change, the Nationality Promotion Society shall from this time endeavour to impress upon the minds of their countrymen, the impropriety on the part of an educated native of delivering at public meetings, speeches addressed to his countrymen in English or of writing pamphlets so addressed in that language. An Englishman, for instance, would not address his countrymen in French and German. [1] It must be submitted that reformers and public agitators are obliged to address their educated countrymen in English, or else they do not obtain a hearing from the majority of them, such is their fondness for everything English and aversion towards everything Bengalee ; but it is expected that the good sense of our educated countrymen would gradually allow this practice to fall into disuse. The writer of this article regrets the prevalence of Anglo-Mania in his time which has obliged him to initiate a movement in favour of his mother-tongue by addressing his educated countrymen in English.

No reform is accepted by nation unless it comes in a national shape. The Nationality Promotion Society will not initiate or take an active part in social reformation—as such reformation is not its principal end or aim—but will aid it by rousing national feelings in its favour. Men naturally look to the past for sanction for their acts and nothing aids reformation so much as a former national precedent. The Nationality Promotion Society shall therefore publish tracts in the Bengalee containing proofs of the existence of liberal and enlightened customs in Ancient India, such as female education, personal liberty of females, marriage by election of the bride, marriage at adult age, widow-marriage, inter-marriage, and voyage to distant countries. It will try to introduce such foreign customs into educated society as have a tendency to infuse national feeling into the minds of its members such as that of holding festivities in honor of men of genius as is done amongst European nations. The Nationality Promotion Society will not resist the introduction of goods foreign customs into educated native society, as that would be a bar to all improvement ; but will try to give if possible to foreign customs already introduced a national shape. It has for instance become almost a custom among the educated natives to congratulate each other on the occasion of the New Year's day. The Nationality Promotion Society will endeavour to induce them to offer such congratulation to each other on the occasion of our New Year's day, the 1st of Bysakh. It will use its best endeavours to prevent the introduction of pernicious foreign customs such as that of drunkenness. It will attempt to prevent the falling into abeyance of the good old customs of our

1. Periodicals for the discussion of political subject and pamphlets intended for the perusal of both Europeans and natives, or of the natives of the different presidencies should of course be written in English.

country. There is for instance a custom prevalent in our country of sisters making affectionate presents to brothers on a certain day of the year. It would be a great loss if the tide of revolution sweep away such beautiful customs as the one above-mentioned. No one can object to the Bhratriditya if freed from the superstitious observances that accompany it. The Nationality Promotion Society shall, in a few words, try firstly, to prevent the introduction of evil foreign customs into educated native community; secondly, to introduce such foreign customs as have a tendency to infuse national feeling into the minds of its members; thirdly, to give, if possible, to foreign customs already introduced a national shape, fourthly, to aid social reformation by citing old precedents in its favour; and fifthly, to prevent the abolition of such old customs of the country as are beneficial in their nature. [1]

The Nationality Promotion Society will not overlook even such trifling points as the regulation of etiquette, with a view to give a national shape to the same. It would be impossible to abolish all foreign modes of etiquette that have crept into educated native society, nor is it desirable to do so. Such cordial usages as the hearty hand-shake, some thing similar to which has, by the by, prevailed among our countrymen of the North-West, from a remote antiquity, as is evidenced by the Sanskrit plays, but the members of the Nationality Promotion Society shall give the preference to our national *namuskar* and *pranam* on all occasions on which it is practicable to do so.

With regard to dress, the Nationality Promotion Society need not direct its attention to that subject, as the educated natives have already adopted a mode which is not strictly European. This has been as required by the demands of nationality. If we at all imitate other nations, we should not do so slavishly. We should chalk out a path of our own. We should follow the same principle in the improvement of the dress of our women.

With regard to diet, the educated natives belonging to the higher classes of Society have adopted a mode of living that cannot be called *exclusively* European. It cannot be otherwise. The European mode of living is quite unsuited to the people of this country. Those educated natives who adopted an exclusively European mode of living were obliged by ill health in the course of a few years to resume the native or to modify the former. Those who have adopted a partly European mode of living will find it beneficial to Indianize it still further. The Nationality Promotion Society will direct their attention to this point, as well as to the diet of the majority of the educated natives which is in fact deteriorated as has been observed before from that of our ancestors. Anent this subject, we may observe that it would be the duty of

1. There would be no hindrance on the part of a Member of the Nationality Promotion Society, to be a Member of a Social Reformation Society, the rules of which do not require him to surrender his nationality.

the Nationality Promotion Society to reprobate the practice of frequenting European hotels so common among our educated countrymen. This practice shows a greedy hankering after European food, and demeans us in the eyes of foreigners. It must appear ridiculous in the eyes of all Europeans, except hotel-keepers.

With regard to dramatic entertainments the Nationality Promotion Society need not direct its attention to the same, as the educated natives of Bengal are already adopting a national plan of such amusements. They do not, like the Parsees of Bombay, act English plays, but do so Bengalee dramatic compositions on the English plan. This is as it should be. For carving out our nationality, we should adopt the principle of adaptation in other things as we have done in this.

An attempt to shew that the religion of our ancestors contains much that is worthy of respect as well as union to represent political grievances to Government are calculated to promote national feeling ; but the Nationality Promotion Society will not take measures for the same as there are separate associations, namely, the Brahmo Somaj and the British Indian Association, established solely for the purposes above-mentioned. It will abstain from the agitation of religious and political subjects.

The above Scheme of a Society for the promotion of National feelings among the educated natives of Bengal is of course subject to modifications by the public.

It would be unreasonable to expect that such a Society would prove to be the cause of every national feeling. Its main object would be to promote and foster national feelings which would lead to the formation of a national character and thereby to the eventual promotion of the prosperity of the nation.

Such movements as the establishment of a Society like the one proposed should originate in the metropolis. People of the Mofussil as is the case in every country follow suit in everything with those of the metropolis.

It is intended to publish a translation of this article in Bengalee in the form of a pamphlet[১] and circulate it among the mass of our countrymen.

১. উমেশচন্দ্র দত্ত বাংলা ভাষায় এই অনুষ্ঠান-পত্রখানির অনুবাদ করেন। ('বিবিধ প্রবন্ধ', ১৮৮২, পৃ. ৭৩-৮৩ দ্রষ্টব্য)

শিক্ষিত বঙ্গবাসিগণের মধ্যে জাতীয় গৌরবেচ্ছা সঞ্চারিণী সভা সংস্থাপনের প্রস্তাব।

"...আমি ইংরাজী ১৮৬৬ সালে "Prospectus of a Society for the Promotion of National Feeling among the Educated Natives of Bengal." আখ্যা দিয়া ইংরাজীতে একটি ক্ষুদ্র পুস্তিকা প্রকাশ করি। তাহার অনুবাদ "জাতীয় গৌরবেচ্ছা সঞ্চারিণী সভা সংস্থাপনের প্রস্তাব" নামে এই গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট হইল। উক্ত অনুবাদ কার্য্য আমার পরমপ্রিয় আত্মীয় ও স্বসম্পর্কীয় সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদক শ্রীযুক্তবাবু উমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয় দ্বারা সম্পাদিত হইয়াছে। এই প্রস্তাব দ্বারা উদ্বুদ্ধ হইয়া বান্ধববর শ্রীযুক্তবাবু নবগোপাল মিত্র মহাশয় হিন্দুমেলা ও জাতীয় সভা সংস্থাপন করেন।"—দেওঘর, ১৫ই জ্যৈষ্ঠ, ব্রাহ্ম সম্বৎ। রাজনারায়ণ বসু, বিবিধ প্রবন্ধ, প্রথম খণ্ড।

অধুনা ইউরোপীয় জ্ঞানালোক বঙ্গদেশে প্রবিষ্ট হইয়া এতদ্দেশীয় জনগণের মনকে চির নিদ্রা হইতে জাগরিত করিয়াছে। বঙ্গীয় সমাজে অবিশ্রান্ত আন্দোলন চলিয়াছে। পরিবর্ত্তন ও উন্নতির স্পৃহা সর্ব্বত্রই দৃষ্টিগোচর হইতেছে। নব্য-সম্প্রদায় প্রাচীন রীতি-পদ্ধতিতে বীতরাগ হইয়া সমাজ সংস্করণার্থ একান্ত উৎসুক হইতেছেন। ইতিমধ্যেই একদল যুবক হিন্দুসমাজ হইতে এককালে বিচ্ছিন্ন হইতে এবং হিন্দু নাম পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছেন। আমরা পূর্ব্বপুরুষদিগের নিকট হইতে যে সকল সুরীতি ও সুনীতি লাভ করিয়াছি তাহাও পাছে এই পরিবর্ত্তনের স্রোতে ভাসিয়া যায় আশঙ্কা হইতেছে। যাহাতে শিক্ষিত দলের মধ্যে জাতীয় গৌরবেচ্ছা সঞ্চারিত হইয়া এই ভয়ঙ্কর অমঙ্গল নিবারিত হয় এবং সমাজ সংস্কার সকল জাতীয় আকার ধারণ করে, তন্নিমিত্ত এতদ্দেশীয় প্রভাবশালী মহোদয়গণ একটি সভা সংস্থাপন করুন। জাতীয় গৌরবেচ্ছার উন্মেষণ ব্যতীত কোন জাতি মহত্ত্ব লাভ করিতে পারে নাই। সমগ্র ইতিহাস এই সত্যের সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে।

জাতীয় ব্যায়াম চর্চ্চার পুনরুদ্দীপনার্থ সর্ব্বতোভাবে চেষ্টা করা জাতীয় গৌরবেচ্ছা সঞ্চারিণী সভার সর্ব্বপ্রথম কার্য্য হইবে। অর্দ্ধ শতাব্দীর পূর্ব্বে প্রায় প্রতি গ্রামে এক একটি ব্যায়ামশালা ছিল। এই প্রাচীন প্রথাটী পুনঃ প্রবর্ত্তিত করা কর্ত্তব্য। কিয়দ্দিন গত হইল, আমাদিগের ভূতপূর্ব্ব মহিমান্বিত গবর্ণর জেনারেল সার্ জন্ লরেন্স্ বাহাদুর উত্তরপাড়ার বঙ্গবিদ্যালয়ের বালকগণকে লক্ষ্য করিয়া বলেন "নবীন বঙ্গসন্তানেরা প্রাচীনদিগের ন্যায় বলিষ্ঠ ও দৃঢ়কায় নহে" বস্তুতঃ এ কথা সম্পূর্ণ সত্য। আজি কালি ব্যায়ামের প্রতি বিরাগ এবং পুস্তকাধ্যয়নের প্রতি অতিরিক্ত অনুরাগই ইহার কারণ। নির্ব্বীর্যতা, চিররুগ্‌ণতা, অকালবার্দ্ধক্য এবং অকাল-মৃত্যু ইহার ফল। অনেক যুবক বিদ্যালয়ে লব্ধপ্রতিষ্ঠ হইয়া অচিরাৎ ভগ্নশরীর হইয়াছেন এবং চিরজীবনের জন্য অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়িয়াছেন। জাতীয় গৌরবেচ্ছা সঞ্চারিণী সভা, প্রাচীন কালে ব্যায়ামচর্চ্চার কতদূর প্রাদুর্ভাব ছিল

বিশেষরূপে উল্লেখ করিয়া ও তৎপ্রমাণার্থ সংস্কৃত শাস্ত্র হইতে বচন সকল উদ্ধৃত করিয়া ব্যায়াম চর্চ্চার আবশ্যকতা বিষয়ক পুস্তকসকল, বঙ্গভাষায় প্রচার করিবেন এবং হিন্দুব্যায়াম শিক্ষার্থ বঙ্গদেশের প্রধান প্রধান স্থানে যে সকল ব্যায়ামশালা স্থাপিত হইবে তাহাতে অর্থ সাহায্য প্রদান করিবেন। এই সভা প্রাচীন বাঙ্গালিদিগের সামরিক প্রভাবের দৃষ্টান্তসকল ও দেশের প্রাচীন ইতিবৃত্ত হইতে সঙ্কলন করিয়া বাঙ্গালা পুস্তক সকল প্রকাশ করিবেন এবং বর্ত্তমানকালীন বঙ্গবাসিদিগের মধ্যে যে এরূপ উদাহরণের অসদ্ভাব নাই তৎপ্রমাণার্থ গত সিপাহী বিদ্রোহের সময়ের প্রসিদ্ধ সমরোৎসাহী মুন্‌সেফের দৃষ্টান্তের ন্যায় ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত দৃষ্টান্তসকল প্রদর্শন করিবেন। এই প্রসঙ্গে বাঙ্গালিদিগের বর্ত্তমান খাদ্য পূর্ব্বাপেক্ষা কতদূর নিকৃষ্ট হইয়াছে, তাহা পূর্ব্বকার বাঙ্গালিদিগের আহার অপেক্ষা কত অসার এবং অপুষ্টিকর ও তাহার উৎকর্ষ সাধনের প্রকৃষ্ট উপায় কি, তাহাও আলোচনা করা আবশ্যক।

জাতীয় গৌরবেচ্ছা সঞ্চারিণী সভা হিন্দু তৌর্য্যত্রিক বিদ্যাশিক্ষার্থ একটি আদর্শ বিদ্যালয় সংস্থাপন করিবেন। প্রত্যেক জাতিরই তৌর্য্যত্রিক আছে। এতদ্দেশীয় শিক্ষিতদিগের অধিকাংশ দেশীয় বা ইউরোপীয় সঙ্গীত শাস্ত্রের আলোচনা করেন না ইহা অত্যন্ত আক্ষেপের বিষয়। তাঁহাদিগের যে কিছু সঙ্গীতানুরাগ, অসভ্য যাত্রাদিতে প্রদর্শিত হয়। এতদ্দেশে সঙ্গীতবিদ্যার আলোচনা সাধারণের মধ্যে প্রচলিত ছিল, আমরা বাল্যকালে দেখিয়াছি। এ বিষয়ে বর্ত্তমান কৃতবিদ্যগণ অত্যল্প মনোযোগী। এই সভা একটি হিন্দু তৌর্য্যত্রিক বিদ্যালয় স্থাপন করিয়া তাহার ছাত্রগণকে এরূপ সঙ্গীত শিক্ষা দিবেন যদ্দ্বারা নীতিগর্ভ উপদেশ প্রদত্ত হয় এবং অন্তঃকরণে দেশহিতৈষিতা ও সমরানুরাগের সঞ্চার হইতে পারে।

জাতীয় গৌরবেচ্ছা সঞ্চারিণী সভা একটি হিন্দু চিকিৎসা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত করিবেন। সেখানে ভারতবর্ষ জাত ভৈষজ্য দ্রব্যের গুণ ও ভেষজ প্রস্তুতকরণ বিদ্যা অধীত হইবে। এমত অনেক হিন্দু ঔষধ আছে যদ্দ্বারা দুরারোগ্য রোগ সকল আরোগ্য হইয়াছে। ভারতবর্ষ সকল বিষয়ে রত্নগর্ভা হইয়া ইহার সন্তানদিগের রোগনিবারণোপযোগী ঔষধ উৎপাদন করিতে পারেন না, এরূপ হইলে সর্বজ্ঞ পরমেশ্বরের প্রতি অদূরদর্শিতা-দোষস্পর্শ হয়। মেডিকেল কলেজের কৃতবিদ্য ছাত্রেরা বিশেষ আলোচনা ও পরীক্ষা করিয়া হিন্দু-ঔষধ দ্বারায় ইংরাজী চিকিৎসাশাস্ত্রের শ্রীবৃদ্ধিসাধন করিবেন বলিয়া আমাদিগের যে আশা ছিল তাহা বিফল হইয়াছে। এই আশা পূরণ করিবার নিমিত্ত বর্ত্তমান সভা সচেষ্ট হইবেন। যে ব্যক্তি ইংরাজী ও হিন্দু উভয়বিধ চিকিৎশাস্ত্রে পারদর্শী তিনি প্রস্তাবিত বিদ্যালয়ের শিক্ষকতা পদে নির্যুক্ত হইবেন।

জাতীয় গৌরবেচ্ছা সঞ্চারিণী সভা ভারতবর্ষের পুরাবৃত্ত বিষয়ে ইউরোপীয় সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতদিগের অনুসন্ধানলব্ধ সত্যসকল বাঙ্গালা ভাষায় প্রচার করিবেন এবং ঐ সকল পণ্ডিতগণের গ্রন্থে প্রাচীন ভারতবর্ষের শারীরিক, মানসিক, আধ্যাত্মিক, সামাজিক এবং রাজনীতি, সাহিত্য ও বিজ্ঞান বিষয়ক উন্নতির যে কিছু বিবরণ পাওয়া যায়, তাহা বিশেষ সমাদরের সহিত স্বীয় প্রকাশিত বাঙ্গালা পুস্তকে প্রকটন করিবেন। সভা এতদ্দেশীয়দিগের সদ্‌গুণের প্রমাণ সকল ইংরাজী ও বাঙ্গালা ভাষায় সংগ্রহ ও প্রচার করিবেন ; প্রাচীন ও অধুনাতন ভারতবর্ষীয়দিগের সুখ্যাতি যাহা কিছু ইউরোপীয় গ্রন্থকারদিগের লেখনী হইতে বহির্গত হইয়াছে তাহা পুস্তকাবদ্ধ করিয়া প্রকাশ করিবেন।

এই সভা হইতে ভারতবর্ষের বিশেষতঃ বঙ্গদেশের প্রাচীন ও বর্ত্তমান প্রসিদ্ধ মহাত্মাদিগের জীবনচরিত বাঙ্গালা ভাষায় প্রকাশিত হইবে।

সংস্কৃত ভাষার অনুশীলনার্থ জাতীয় গৌরবেচ্ছা সঞ্চারিণী সভা যতদূর সাধ্য উৎসাহ দান করিবেন। ইহার সভ্যেরা উৎকৃষ্ট সংস্কৃত পুস্তক সকলের প্রচার বিষয়ে সহায়তা করিবেন। এ বিষয়ে তাঁহারা বঙ্গদেশীয় আসিয়াটিক সোসাইটীর সহকারিতা করিবেন এবং এতদ্দেশীয় সংস্কৃতবিৎ পণ্ডিতদিগকে অর্থ পারিতোষিক এবং প্রশংসামূলক পত্রাদি প্রদান করিবেন।

জাতীয় গৌরবেচ্ছা সঞ্চারিণী সভার সভ্যগণের মধ্যে এই নিয়ম প্রচলিত থাকিবে যে তাঁহাদিগকে সন্তানগণকে ইংরাজী শিখাইবার পূর্ব্বে বঙ্গভাষা ভাল করিয়া শিক্ষা দিতে হইবে। বাঙ্গালা ও ইংরাজী যুগপৎ শিক্ষা দিলে ইংরাজীর প্রতি সমধিক মনোযোগ আবশ্যক হয় সুতরাং বাঙ্গালা পাঠের ব্যাঘাত ঘটিয়া উঠে। ইংরাজী পাঠের সৌকর্য্যার্থেও বাঙ্গালা ভাষার প্রথম শিক্ষা আবশ্যক। যদি কোন বালক ছয় সাত বৎসর বাঙ্গালা ভাষা অধ্যয়ন করিয়া ইংরাজী শিখিতে প্রবৃত্ত হয়, তাহা হইলে সে অতি সত্বরে শেষোক্ত ভাষায় উন্নতি লাভ করিতে সমর্থ হয় এবং যাহা কিছু অধ্যয়ন করে, তাহার সুস্পষ্ট ভাব গ্রহণ করিতে পারে—অন্য উপায়ে সেরূপ হইবার সম্ভাবনা নাই। ইংরাজী বিদ্যালয়ের ছাত্রগণের মধ্যে বাঙ্গালা ছাত্রবৃত্তিপ্রাপ্ত বালকেরা যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, ইহা পরীক্ষাদ্বারা সপ্রমাণ হইয়াছে। যাঁহার মনে কিছুমাত্র স্বদেশানুরাগের ভাব আছে, তিনি স্বীয় সন্তানগণকে ইংরাজী শিখাইবার পূর্ব্বে মাতৃভাষা একটুকু ভাল করিয়া শিক্ষা না দিয়া নিশ্চিন্ত থাকিতে পারেন না।

এতদ্দেশীয় কৃতবিদ্যগণ কথোপকথন কালে বাঙ্গালার সহিত ইংরাজী শব্দ সকল মিশ্রিত করিয়া হাস্যাস্পদ হইয়া থাকেন, দিন দিন এইরূপ ভাষাবিকৃতি বৃদ্ধি হইতেছে, জাতীয় গৌরবেচ্ছা সঞ্চারিণী সভা ইহার নিরাকরণার্থ সাধ্যমত চেষ্টা করিবেন। যে ভাব বাঙ্গালা ভাষায় সহজে ব্যক্ত হয় তাহা তাঁহারা ইংরাজীতে প্রকাশ করেন। সদি নামক ইংরাজী গ্রন্থকর্ত্তা রচনা-প্রণালী বিষয়ে একটি প্রস্তাব লেখেন তাহাতে বলিয়াছেন, "আমাদের ভাষা অতি উৎকৃষ্ট—অতি সুন্দর ভাষা। ইংরাজীর সহিত জর্ম্মন ভাষার অতি নিকট সম্বন্ধ অনুরোধে দুই একটি জর্ম্মন শব্দ ব্যবহার সহ্য করিতে পারি, কিন্তু সেখানে বিশুদ্ধ সহজ ইংরাজী শব্দের দ্বারায় মনের ভাব ব্যক্ত হইতে পারে, সেখানে যিনি লাটীন বা ফরাসী কথা ব্যবহার করেন, মাতৃভাষার বিষম বিদ্রোহী বলিয়া তাঁহাকে প্রথমে ফাঁসি দিয়া তাহার পর তাঁহার শরীর খণ্ড খণ্ড করিয়া কাটিয়া ফেলা উচিত।" এতদ্দেশীয় শিক্ষিতদিগের মধ্যে যদি এপ্রকার স্বদেশ-ভাষানুরাগের অণুমাত্র ভাব থাকিত, তাহা হইলে তাঁহারা এক্ষণে কথোপকথন সময় যে প্রকার অসঙ্গত ও সভ্যরুচি-বিরুদ্ধ আচরণ করেন তাহা কখনই করিতেন না। "বাঙ্গালা ভাষায় শব্দের অনটন" কোন কাজের কথা নহে, সে অনটন বাস্তবিক নহে—তাহা কাল্পনিক। কিছুদিন হইল কতকগুলি দেশীয় কৃতবিদ্য মহাত্মাদিগের যত্নে বাঙ্গালা ভাষার যথেষ্ট শ্রীবৃদ্ধি সাধন হইয়াছে ; ভাবী বংশীয়দিগের নিকট ইঁহারা চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবেন। যদি বাঙ্গালা ভাষা সত্য সত্যই হীন ও অসম্পূর্ণ অবস্থায় থাকে, সর্ব্বদা বিশুদ্ধ প্রয়োগ সহকারে কথোপকথন দ্বারায় তাহার উন্নতিসাধন করা প্রত্যেক দেশহিতৈষী ব্যক্তির কর্ত্তব্য। কোন কোন বৈজ্ঞানিক ভাব, বিশেষ বিশেষ পদ ও কার্য্যালয়ের নাম ও কোন কোন গৃহোপকরণ প্রভৃতির

নামোল্লেখ করিতে হইলে ইংরাজী শব্দ অপরিহার্য্য, কারণ তাহাদের বাঙ্গালা নাম কিছুই নাই। এরূপস্থলে স্ব-কপোল-কল্পিত নূতন বাঙ্গালা শব্দ অথবা অপ্রচলিত শব্দ ব্যবহার করিলে কেহ আমাদিগের কথা বুঝিতে পারিবে না।[১] কিন্তু যেখানে বাঙ্গালা ভাষায় মনের ভাব সহজে ব্যক্ত হয়, সেখানে ইংরাজী ভাষা ব্যবহার করা শিক্ষিত ব্যক্তির পক্ষে অমার্জ্জনীয় দোষ। হয় তিনি বিশুদ্ধ ইংরাজী নয় বিশুদ্ধ বাঙ্গালা ব্যবহার করুন, কিন্তু এই উভয় ভাষা মিশ্রিত করিয়া যেন গোলযোগ না করেন। শিক্ষিতদিগের বর্ত্তমান কথোপকথনের ভাষা অতি বিকলাঙ্গ-ভাষা—অতি বিকৃত অপভাষা এবং আমরা অনুধাবন করি আর না করি, ইহা জ্ঞানী ও সুরুচিসম্পন্ন সভ্যদেশের লোকদিগের নিকট নিতান্ত ঘৃণার্হ ও আমাদিগের জাতি সাধারণ লজ্জাসূচক। আমাদিগের কথাবার্ত্তা শুনিলে ইউরোপীয় কোন ভদ্রলোক হাস্য না করিয়া থাকিতে পারেন না; আমাদিগের লিখিত ভাষা দৈনন্দিন উন্নতিলাভ করিতেছে, কিন্তু কথোপকথনের ভাষার প্রতি আমাদিগের নিতান্ত অনাদর ইহা অত্যন্ত ক্ষোভের বিষয় বলিতে হইবে। যতদিন কোন জাতি কথোপকথনের ও রচনার সম্পূর্ণরূপে উপযোগী উন্নত ভাষার অধিকারী না হন, ততদিন সে জাতি উন্নতির পথে দ্রুতবেগে অগ্রসর হইতে পারেন না। রেবরেণ্ড রিচার্ড সাহেব মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ে বক্তৃতাকালে বলিয়াছিলেন "মহোদয়গণ! যে পর্য্যন্ত জাতীয় গৌরবেচ্ছার সঞ্চার না হয়, সে পর্য্যন্ত কোন জাতির, জাতি-প্রতিষ্ঠালাভ করিবার আশা নাই ; জাতীয় ভাষা জাতীয় মনোবৃত্তির স্বাভাবিক নিদর্শন, তাহার উন্নতি ব্যতীত জাতীয় গৌরবসাধন মনের ভ্রান্তি মাত্র। কোন জাতির উন্নতি পরীক্ষা করিতে হইলে তদীয় ভাষা তাহার উৎকৃষ্ট প্রমাণ। অধিকন্তু কার্য্যকারণের পরস্পর সহকারিতা আছে, কোন জাতির স্বাভাবিক নিয়মে ভাষোন্নতির উপায় করিয়া দাও, তাহা হইলেই তাহার স্বাধীন চিন্তার উন্মেষ হইবে এবং ক্রমে জাতীয় চরিত্র নির্ম্মাণোপযোগী অন্যান্য গুণও সমুৎপন্ন হইবে। হে কৃতবিদ্যগণ! প্রকৃত স্বদেশ হিতৈষীতা প্রদর্শন করুন। আপনাদিগের মাতৃভাষার শ্রীবৃদ্ধি সাধনার্থ আপনাদিগকে অনুরোধ করিতেছি, এ বিষয়ে সমুচিত মনোযোগ প্রদান করা আপনাদিগের কর্ত্তব্য।[২]

জাতীয় গৌরবেচ্ছা সঞ্চারিণী সভার সভ্যগণের মধ্যে আর একটি বিষয় প্রচলিত থাকিবে। সে নিয়ম এই যে তাঁহারা বাঙ্গালা ভাষায় পরস্পরকে পত্রাদি লেখেন। কোন জাতির লোকে পরস্পরকে বিজাতীয় ভাষায় পত্রাদি লেখেন না। ইংরাজেরা পরস্পর পরস্পরকে ফরাসী বা জর্ম্মন্

১. যে সকল পারস্য শব্দ-বাঙ্গালা ভাষার অন্তর্গত হইয়া গিয়াছে ও যাহার অর্থ কঠিন সাধুভাষা শব্দ ব্যতীত সহজ শব্দে প্রকাশ করা যায় না, সে সকল শব্দ ব্যবহার করিতে হানি নাই।

২. Gentlemen! let me say there is but little hope of a nation until it has some sense of nationality without a national language, which is the free spontaneous out-come of the national mind, is a delusion Probably the best index to the growth of a people is the growth and development of its Language. Moreover there is an interchange of cause and effect ; help a people to develop their language in accordance with its own laws and you help them to acquire freedom of thought, and so gradually the other habits which are necessary to the formation of national character. I appeal then to your patriotism, I appeal to you on behalf of your mother tongue ; it is well worthy your regard.

ভাষায় পত্রাদি লেখেন না। তবে এতদ্দেশীয় শিক্ষিতগণ পরস্পর পরস্পরকে ইংরাজী ভাষায় পত্র লিখিয়া কেন মাতৃভাষার অবমাননা করেন? আমাদিগের ভাষা কি এত দীন যে তাহাতে কোন ব্যক্তি একখানি সামান্য পত্রও লিখিতে পারেন না? যে সকল যুবক বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করেন অথবা সম্প্রতি বিদ্যালয় ছাড়িয়াছেন ইংরাজী লিখনে নৈপুণ্য লাভের নিমিত্ত পরস্পরের সহিত ইংরাজীতে পত্রাদি লেখা তাঁহাদিগের পক্ষে নিন্দনীয় নহে বরং তাহা আবশ্যকও বলা যায়, কিন্তু বয়স্ক ব্যক্তিদিগের পক্ষে এরূপ করা উচিত নহে। বিষয়কর্ম্ম ঘটিত যে সকল লিপি ইংরাজীতে লেখা আবশ্যক, তাহাই কেবল ইংরাজীতে লেখা কর্ত্তব্য।

যে সকল সভায় ইংরাজদিগের সহকারিতার আবশ্যকতা নাই এবং যাহার সকল সভ্য বাঙ্গালী, অথবা যুবকদিগের ইংরাজী লিখন ও কথনে নৈপুণ্যলাভ যাহার উদ্দেশ্য নয়, তাহার কার্য্য বাঙ্গালা ভাষায় সম্পন্ন করিবার জন্য এ সভার সভ্যেরা দেশীয় লোকদিগকে প্রবৃত্ত করিতে যত্নশীল হইবেন। যদি তাহার কার্য্যবিবরণ গবর্ণমেন্ট বা ইউরোপীয় সমাজকে অবগত করা আবশ্যক হয়, প্রয়োজনমত ইংরাজীতে তাহা অনুবাদিত হইতে পারে।

কোন শিক্ষিত ব্যক্তির পক্ষে স্বদেশীয় লোকদিগের সমক্ষে ইংরাজীতে বক্তৃতা করা অথবা তাহাদিগকে আপনার অভিপ্রায় প্রকাশ করিবার জন্য ইংরাজীতে লিখিয়া প্রকাশ করা যে অসঙ্গত, এই সভার সভ্যেরা তাহা স্বদেশীয় লোকদিগকে হৃদয়ঙ্গম করিয়া দিতে চেষ্টা করিবেন। একজন ইংরাজ কই ফরাসী কি জর্ম্মন্ ভাষায় বক্তৃতা অথবা ঐ ভাষায় লিখিত পুস্তক দ্বারা স্বদেশীয় লোকদিগকে স্বীয় অভিপ্রায় জ্ঞাপন করেন না।[১] দেশীয় শিক্ষিতগণের মধ্যে অধিকাংশ ব্যক্তির ইংরাজী ভাষার প্রতি এরূপ অনুরাগ এবং বাঙ্গালার প্রতি এরূপ বিরাগ যে, সমাজ সংস্কারক এবং সাধারণ হিতকর বিষয়ের আন্দোলনকারীগণ ইংরাজীতে বক্তৃতা করিতে বাধিত হন, নতুবা অধিকসংখ্যক শ্রোতা প্রাপ্ত হন না; কিন্তু আমাদিগের দেশীয় শিক্ষিত ভ্রাতৃগণ সদ্বিবেচনা লাভ করিয়া ক্রমশঃ ঐ অনুরাগ পরিত্যাগ করিবেন আশা হইতেছে। এই প্রস্তাব লেখক তাঁহার সময়ে ইংরেজানুকরণের প্রাদুর্ভাব দেখিয়া দুঃখিত হইতেছেন এবং মাতৃভাষায় উন্নতি সাধনের জন্য আন্দোলন করিতে গিয়াও শিক্ষিতদিগকে ইংরাজীতে এই প্রবন্ধ লিখিয়া আপনার অভিপ্রায় জ্ঞাপন করিতে বাধ্য হইতেছেন।

কোন সমাজ সংস্কার জাতীয় আকারে পরিণত না হইলে কোন জাতি তাহা অবলম্বন করেন না। জাতীয় গৌরবেচ্ছা সঞ্চারিণী সভা কোন সমাজ সংস্কারের প্রবর্ত্তক বা বিশেষ সহযোগী হইবেন না—তাহা ইহার মুখ্য উদ্দেশ্য নহে—কিন্তু তাহার অনুকূলে জাতীয়ভাব রক্ষা করিয়া সাহায্য দানে বিরত হইবে না। মনুষ্যেরা স্বভাবতঃ আপনাদিগের কার্য্যের পোষকতা পাইবার জন্য ভূতকালের প্রতি দৃষ্টিপাত করেন, সুতরাং গতকালের উদাহরণ দ্বারা সমাজ সংস্কারের যেরূপ সাহায্য হয়, এরূপ অন্য কিছুতেই নহে। গৌরবেচ্ছা সঞ্চারিণী সভা বাঙ্গালা ভাষার এরূপ পুস্তক সকল প্রকাশ করিবেন যাহাতে ভারতবর্ষে প্রাচীনকালে স্ত্রীশিক্ষা, স্ত্রীলোকের স্বাধীনতা, স্বয়ম্বর বিবাহ, পূর্ণবয়সে

১. রাজকার্য্য আলোচনা জন্য সম্বাদপত্র অথবা যে সকল পুস্তক উভয় ইংরাজ ও এতদ্দেশীয় লোক অথবা ভারতবর্ষস্থ ভিন্ন ভিন্ন দেশীয় লোকের পাঠের জন্য প্রস্তুত করিতে হইবে তাহা ইংরাজীতে লেখা কর্ত্তব্য।

বিবাহ, বিধবা বিবাহ, অসবর্ণ বিবাহ, সমুদ্রযাত্রা ইত্যাদি উদার ও সভ্য প্রথা প্রচলিত ছিল তাহার দৃষ্টান্ত প্রদর্শিত হইবে।

যে সকল বিজাতীয় প্রথাদ্বারা সভ্যগণের মধ্যে জাতীয় গৌরবেচ্ছা সমুত্তেজিত হয়, তৎপ্রচলনের চেষ্টা করিতে হইবে। ইউরোপীয়েরা যেমন পরলোকপ্রাপ্ত অসাধারণ প্রতিভাসম্পন্ন ব্যক্তিগণের স্মরণার্থ উৎসব করেন, এতদ্দেশীয়দিগকে সেইরূপ করিতে সভা প্রবৃত্তি দিবেন, এ সভা শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে কোন বিদেশীয় উৎকৃষ্ট প্রথা প্রবর্ত্তিত দেখিলে তাহাতে বাধা দিয়া উন্নতির ব্যাঘাত করিবেন না, কিন্তু সেই প্রবর্ত্তিত প্রথা স্বজাতীয় আকারে পরিণত করিতে চেষ্টা করিবেন। ইংরাজী নববর্ষ উপলক্ষে পরস্পরে আনন্দ প্রকাশ করা ও নববর্ষে যাহাতে পরস্পরের কুশল হয় এমত বাসনা প্রকাশ করা শিক্ষিতদিগের মধ্যে একটা প্রথা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। গৌরবেচ্ছা সঞ্চারিণী সভা স্বজাতীয় নববর্ষের প্রথম দিন অর্থাৎ ১লা বৈশাখে সেই আনন্দ সম্ভাষণের প্রথা প্রবর্ত্তিত করিতে সচেষ্ট হইবেন। সুরাপানের ন্যায় বিষময় বিজাতীয় প্রথাসকল নিবারণার্থ সর্ব্বতোভাবে চেষ্টা করিতে হইবে; এবং স্বজাতীয় প্রাচীন সুপ্রথাসকল অনাদৃত না হয় তাহারও উপায় করিতে হইবে। আমাদিগের একটি দেশাচার আছে, ভ্রাতৃদ্বিতীয়ার দিনে ভগিনীরা ভ্রাতাদিগকে স্নেহসূচক উপঢৌকন দিয়া থাকেন। পরিবর্ত্তন-স্রোতে এরূপ মনোহর প্রথাসকল যদি ভাসিয়া যায়, যারপনারই ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হইবে। ভ্রাতৃদ্বিতীয়া-রীতি যদি তাহার আনুষঙ্গিক কুসংস্কারসূচক ক্রিয়াসকল বর্জ্জিত হইয়া অনুষ্ঠিত হয় তাহা হইলে কেহ তাহাতে আপত্তি করিতে পারে না। এতদ্রূপ প্রথা সর্ব্বতোভাবে রক্ষা করা কর্ত্তব্য। স্থূলকথা এই, সভা প্রথমতঃ শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে বিজাতীয় কুপ্রথা যাহাতে প্রবর্ত্তিত না হয়, তদ্বিষয়ে সতর্ক থাকিবেন; দ্বিতীয়তঃ যে সকল বিজাতীয় প্রথা দ্বারা জাতীয় গৌরবেচ্ছা সঞ্চারিত হইতে পারে তাহার প্রবর্ত্তন চেষ্টা করিবেন ; তৃতীয়তঃ প্রবর্ত্তিত বিজাতীয় প্রথাসকল জাতীয় আকারে পরিণত করিতে যত্নশীল হইবেন ; চতুর্থতঃ পুরাকালে প্রচলিত প্রথার উদাহরণ দিয়া সমাজ সংস্কারের সাহায্য করিবেন; পঞ্চমতঃ কল্যাণকর প্রাচীন আচার ব্যবহার যাহাতে বিলুপ্ত না হয়, তাহার উপায় অবলম্বন করিবেন।[১]

জাতীয় গৌরবেচ্ছা সঞ্চারিণী সভা, শিষ্টাচার অকিঞ্চিৎকর বিষয় বলিয়া তাহা জাতীয় আকারে পরিণত করিতে উপেক্ষা করিবেন না। শিক্ষিত সমাজে যে সকল বিদেশীর শিষ্টাচার প্রবর্ত্তিত হইয়াছে তাহা উঠাইয়া দেওয়া সহজসাধ্য এবং বাঞ্ছনীয়ও নহে। প্রণয়সূচক কর-স্পর্শ-প্রথা ভারতবর্ষের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলস্থ লোকদিগের মধ্যে অতি প্রাচীনকাল হইতে প্রচলিত হইয়া আসিয়াছে, ইহা সংস্কৃত নাটক দ্বারা সপ্রমাণ হয়। এ প্রকার প্রথা পরিত্যজ্য নহে, কিন্তু সভা যতদূর পারেন জাতীয় প্রচলিত নমস্কার ও প্রণাম প্রথা রক্ষা করিবেন।

শিক্ষিত সম্প্রদায় যে প্রকার পরিচ্ছদ অবলম্বন করিয়াছেন তাহা ঠিক ইউরোপীয় নহে, অতএব তদ্বিষয়ে গৌরবেচ্ছা সঞ্চারিণী সভাকে চিন্তিত হইতে হইবে না। ইহা জাতীয় অভাব পুরণোপযোগী হইয়াছে। যদি আমাদিগকে অন্যজাতির অনুকরণ করিতে হয়, আমরা দাসবৎ করিব না। আমরা নিজে আপনাদিগের পথ নিরূপণ করিব। পরিচ্ছদ বিষয়ে আমরা এইরূপ করিয়াছি। আমাদিগের

১. কোন সমাজ সংস্কারিণী সভার সভ্য হইতে হইলে যদি জাতীয় ভাব পরিত্যাগ করিতে না হয়; জাতীয় গৌরবেচ্ছা সঞ্চারিণী সভার কোন সভ্য সেরূপ সভার সভ্য হইতে পারেন।

স্ত্রীজাতির পরিচ্ছদের উন্নতিসাধনেও আমরা এই নিয়মের অনুসরণ করিব। তাহা ঠিক বিলাতী রকম করিলে হইবে না।

খাদ্যের বিষয়ে উচ্চশ্রেণীস্থ বাঙ্গালীরা যে প্রণালী অবলম্বন করিয়াছেন, তাহা সম্পূর্ণ ইউরোপীয় নহে। এ বিষয়ে যেরূপ হওয়া উচিত তাহাই হইয়াছে। ইউরোপীয় খাদ্য এদেশীয়দিগের পক্ষে সহ্য হইবার নহে। যে সকল ব্যক্তি সম্যক্‌রূপে ইউরোপীয়-খাদ্য ব্যবহার করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন, তাঁহাদিগকে অনতিকালমধ্যে পীড়াবশতঃ দেশীয় খাদ্য পুনঃসেবন করিতে অথবা অবলম্বিত খাদ্যপ্রণালীর পরিবর্ত্তন করিতে হইয়াছে। যাঁহারা কতক পরিমাণে ইউরোপীয় আহার প্রণালী অবলম্বন করিয়াছেন, তাঁহাদিগের জানা কর্ত্তব্য যে তাহা আরও জাতীয় আকারে পরিণত করা উপকারজনক। সভা এ বিষয়ে মনোযোগী হইবেন এবং এতদ্দেশীয় দিগের বর্ত্তমান আহার অনেক পরিমাণে তাঁহাদিগের পূর্ব্বপুরুষদিগের আহার অপেক্ষা কেন নিকৃষ্ট হইয়া পড়িয়াছে ইহার কারণ নির্দ্দেশ ও ইহার প্রতিকারের চেষ্টা করিবেন।

শিক্ষিত সম্প্রদায় নাটকাভিনয় বিষয়ে জাতীয় প্রথা অবলম্বন করিতে আরম্ভ করিয়াছেন অতএব বর্ত্তমান সভার তদ্বিষয়ে মনোনিবেশ করা অনাবশ্যক। বোম্বাইয়ের পারসিকদিগের ন্যায় ইহারা কেবল ইংরাজী নাটকের অভিনয় করেন না, কিন্তু ইঁহারা ইংরাজী প্রণালী অনুসারে বাঙ্গালা নাটকের অভিনয় করিয়া থাকেন। এইরূপ হওয়াই বিধেয়। জাতীয় উন্নতিসাধন করিবার জন্য এ বিষয়ে যেমন আমরা জাতীয় ভাব রক্ষা করিয়া উন্নতি লাভ করিয়াছি অন্যান্য বিষয়ও সেরূপ চেষ্টা করা কর্ত্তব্য।

আমাদিগের পূর্ব্বপুরুষদিগের ধর্ম্মে অনেক সারবান্ বিষয় আছে ইহা প্রদর্শন করিবার জন্য এবং গবর্ণমেন্টের নিকট রাজ্যশাসন সংক্রান্ত অত্যাচার জ্ঞাপন জন্য সকলে একমত হইলে জাতীয় গৌরবেচ্ছা বর্দ্ধিত হইতে পারে, কিন্তু যখন এই বিশেষ অভিপ্রায়দ্বয় সংসাধন জন্য ব্রাহ্মসমাজ ও ভারতবর্ষীয় সভা বর্ত্তমান রহিয়াছে, তখন তদ্বিষয়ে স্বতন্ত্র চেষ্টা অনাবশ্যক। ধর্ম্ম এবং রাজনীতি সংক্রান্ত বিষয়ের আন্দোলনে জাতীয় গৌরবেচ্ছা সঞ্চারিণী সভার হস্তক্ষেপ করিবার প্রয়োজন নাই।

উপরে যাহা লিখিত হইল তাহা পরিবর্ত্তিত হইবে না এমত নহে; বঙ্গদেশীয় শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে এ প্রকার জাতীয় গৌরবেচ্ছা সঞ্চারিণী সভার কার্য্যপ্রণালী সাধারণের বিবেচনা মতে জাতীয় ভাব রক্ষা করিয়া মধ্যে মধ্যে পরিবর্ত্তিত হইতে পারিবে।

এ প্রকার সভা দ্বারা যে সর্ব্বপ্রকার জাতীয় গৌরবেচ্ছা পূর্ণ হইবে এরূপ আশা করা যাইতে পারে না ; যে প্রকার জাতীয় গৌরবেচ্ছা দ্বারা জাতীয় চরিত্রের উন্নতি হইতে পারে এবং তদ্দ্বারা ভবিষ্যতে জাতীয় সৌভাগ্যের অভ্যুদয় হইতে পারে তাহাই সংবর্দ্ধন ও পোষণ করা এই সভার প্রধান লক্ষ্য।

প্রস্তাবিত সভ্য সংস্থাপনের আন্দোলন প্রথমতঃ রাজধানীতে হওয়া আবশ্যক। সর্ব্বদেশীয় মফঃস্বলস্থ লোকেরা সকল বিষয়ে রাজধানীবাসীদিগের অনুবর্ত্তী হইয়া থাকেন।

জাতীয় সঙ্গীত

জাতীয় মেলা জাতীয় জীবনে যে প্রেরণা দিয়াছিল তাহার ফলে বাঙালী সমাজ স্বদেশের উন্নতিকল্পে সবিশেষ তৎপর হইয়া উঠিয়াছিল সন্দেহ নাই। কৃষি, শিল্প, সাহিত্য, বিজ্ঞান, শারীর-চর্চ্চা বিভিন্ন বিষয়ের শ্রীবৃদ্ধি সাধনে তাহারা উদ্যোগী হইয়াছিল—পূর্ব্ববর্ত্তী আলোচনা হইতে তাহা আমরা জানিতে পারিয়াছি। তথাপি এখানে একটি বিষয়ের উল্লেখ বিশেষ ভাবে করিতে হইবে, কেননা প্রধানতঃ জাতীয় মেলার অনুষ্ঠান হইতেই তাহার উৎপত্তি। এই বিষয়টি হইল জাতীয় সঙ্গীত। বাংলার সাহিত্য জাতীয় সঙ্গীতে সমুজ্জ্বল ও সমৃদ্ধ। এই সমৃদ্ধির মূলে রহিয়াছে জাতীয়মেলার প্রেরণা। ইতিপূর্ব্বে ডিরোজিও ও কাশীপ্রসাদ ঘোষ ইংরেজী কবিতায় দেশমাতৃকার বন্দনা করিয়াছেন; গুপ্তকবি, রঙ্গলাল ও মধুসূদন ছন্দে জন্মভূমির ও জননী বঙ্গভাষার প্রশস্তি করিয়াছেন। কিন্তু ছন্দ ও সুরে দেশমাতার বন্দনা প্রশস্তি জাতীয় মেলা হইতেই আরব্ধ হয়। জাতীয় মেলার প্রথম অধিবেশন উপলক্ষে কোন্ কোন্ সঙ্গীত রচিত ও গীত হইয়াছিল তাহা জানা না গেলেও পরবর্ত্তী অধিবেশনসমুহে গীত কয়েকটি সঙ্গীতের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে। দ্বিতীয় অধিবেশনে "মিলে সবে ভারত সন্তান" গানটি গীত হয়। বঙ্কিমচন্দ্র এই সঙ্গীতটির উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করিয়া গিয়াছেন। ইহার রচয়িতা যে সুপ্রসিদ্ধ সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর তাহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। দ্বিতীয় অধিবেশনে আর একটি বিখ্যাত সঙ্গীত গীত হয়—"লজ্জায় ভারত যশ গাইব কি করে।" ইহার রচয়িতা মেলার প্রথম সম্পাদক গণেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়। এই দুইটি সঙ্গীত ব্যতীত জাতীয় মেলায় গীত অন্যান্য সঙ্গীতের রচয়িতাদের নাম কি কার্য্য বিবরণীতে, কি সমসাময়িক পত্র-পত্রীতে, কি দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের "জাতীয় সঙ্গীত" শীর্ষক সঙ্কলন-পুস্তকে কোথাও দেওয়া হয় নাই। রবীন্দ্রনাথ হিন্দু মেলার শেষের দিক্‌কার কোন কোন অধিবেশনে শুধু স্বরচিত কবিতাই আবৃত্তি করেন নাই, স্বরচিত সঙ্গীতও গান করিতেন। কিন্তু জাতীয় মেলায় গীত বলিয়া উল্লেখ না থাকায় তাঁহার গীতাবলী হইতে এগুলি বাছাই করিয়া লইবার উপায় নাই। যাহা হউক, এই মেলায় গীত বলিয়া যে-সব সঙ্গীতের উল্লেখ পাইতেছি তাহা হইতে কয়েকটি মাত্র এখানে প্রদত্ত হইল। জাতীয় মেলা বাঙালীর প্রাণে যে কি গভীর প্রেরণা দিয়াছিল এই সঙ্গীতগুলিই তাহার প্রমাণ।

রাগিণী খাম্বাজ—তাল আড়াঠেকা

মিলে সব ভারত সন্তান, একতান মনপ্রাণ
গাও ভারতের যশোগান॥

২

ভারত ভূমির তুল্য আছে কোন্ স্থান?
কোন অদ্রি হিমাদ্রি সমান?
ফলবতী বসুমতী, স্রোতস্বতী পুণ্যবতী;
শত খনি রত্নের নিধান॥
হোক্ ভারতের জয়,
জয় ভারতের জয়,
গাও ভারতের জয়,
কি ভয় কি ভয়,
গাও ভারতের জয়॥

৩

রূপবতী সাধ্বী সতী, ভারত ললনা,
কোথা দিবে তাদের তুলনা?
শর্ম্মিষ্ঠা সাবিত্রী সীতা, দময়ন্তী পতিরতা।
অতুলনা ভারত ললনা॥
হোক্ ভারতের জয়,
জয় ভারতের জয়,
গাও ভারতের জয়,
কি ভয় কি ভয়,
গাও ভারতের জয়॥

৪

বশিষ্ঠ গৌতম অত্রি মহামুনিগণ,
বিশ্বামিত্র ভৃগুতপোধন।
বাল্মীকি বেদব্যাস, ভবভূতি কালিদাস,
কবিকুল ভারত ভূষণ॥
হোক্ ভারতের জয়,
জয় ভারতের জয়,
গাও ভারতের জয়,
গাও ভারতের জয়,
কি ভয়, কি ভয়
গাও ভারতের জয়॥

৫

বীর-যোনি এই ভূমি বীরের জননী;
অধীনতা আনিল রজনী,
সুগভীর সে তিমির, ব্যাপিয়া কি রবে চির,
দেখা দিবে দীপ্ত দিনমণি ॥
হোক্ ভারতের জয়,
জয় ভারতের জয়,
গাও ভারতের জয়,
কি ভয় কি ভয়,
গাও ভারতের জয় ॥

৬

ভীষ্ম দ্রোণ ভীমার্জ্জুন নাহি কি স্মরণ,
পৃথ্বীরাজ আদি বীরগণ?
ভারতের ছিল সেতু, যবনের ধূমকেতু
আর্ত্তবন্ধু দুষ্টের দমন ॥
হোক্ ভারতের জয়,
জয় ভারতের জয়,
গাও ভারতের জয়,
কি ভয় কি ভয়,
গাও ভারতের জয় ॥

৭

কেন ডর, ভীরু, কর সাহস আশ্রয়,
যতো ধর্ম্ম স্ততো জয় ॥
ছিন্ন ভিন্নে হীনবল, ঐক্যেতে পাইবে বল,
মায়ের মুখ উজ্জ্বল করিতে কি ভয়?
হোক্ ভারতের জয়,
জয় ভারতের জয়,
গাও ভারতের জয়,
কি ভয় কি ভয়,
গাও ভারতের জয় ॥

রাগিণী বাহার—তাল জৎ

লজ্জায় ভারত যশ গাইব কি করে।
লুঠিতেছে পরে এই রত্নের আকরে॥
সাধিলে রতন পাই, তাহাতে যতন নাই।
হারাই আমোদে মাতি অবহেলা করে॥
দেশান্তর-জনগণ, ভুঞ্জে ভারতের ধন,
এ দেশের ধন হায়, বিদেশীর তরে॥
আমরা সকলে হেথা, হেলা করি নিজ মাতা,
মায়ের কোলের ধন নিয়ে যায় পরে॥

রাগিণী খাম্বাজ—তাল ঝাঁপতাল

সতত রত হও যতনে, দেশহিত সাধনে
একমত ভাব ধরি, এক তানে।
অতুল বল মিলন হয়, সফল হয় মনন চয়
বিমল সুখ সলিল বয়, বিদ্যমানে॥
কি ছিল গুণ কি হল বল, কি হল সব বিভব বল,
ধিক জনম ধন বিফল হীন মানে।
বিনয় করি বচন ধর, খল অলস গরল হর,
যশ কুসুম চয়ন কর, পুলক প্রাণে॥

রাগিণী মুলতান—তাল একতালা

কবে উদিবে সৌভাগ্য ভানু ভারতবরষে।
পোহাইবে দুঃখ নিশা প্রভাত পরশে॥
সভ্যতা সরোজ লতা, প্রাপ্ত হবে প্রবলতা,
প্রস্ফুটিবে সুখাম্বুজ, মানস সরসে।
উন্নতি মরাল কুলে, ভ্রমিবে সলিলে কূলে,
প্রকৃতি প্রমোদে ভুলে, হাসিবে হরিষে॥
উৎসাহেরি উপবনে, একতার সুপবনে,
কামনা কুসুম কলি ফুটিবে সরসে;
দেশহিতাকাঙ্ক্ষী জনে, অলিসম সদাক্ষণে,
মাতিবে মোহিত হয়ে মধুময় রসে॥

রাগিণী পরজ—তাল একতালা

ছাড় হে অসার অলস, প্রস্তুত হও লভিতে যশ।
সাধন কর ভারতের, উন্নতি জন সমাজে।
নিরখি দেখ কাল বিকল, পূর্ব্ববিভব সকল বিফল।
অঙ্গ ভঙ্গ জন্ম-ভূমি, নত শির হয় লাজে॥
যাহে দুখ ভার যায়, একতায় সে উপায়।
ত্যজ ত্যজ ঔদাস্য ভাব, রত হও নিজ কাযে॥
মিলনে হয় হীন সবল, মিলিলে অতি লঘুতৃণ দল,
পায় লৌহ শৃঙ্খল বল, বান্ধে গজরাজে॥

রাগিণী সিন্ধু-কাফি—তাল ঢিমা তেতালা

আসি ভারতভূমে, একবার দেখে যাও আর্য্যগণ।
কোথা, ব্যাস বশিষ্ঠ বাল্মীকি আদি জনক সনক সনাতন।
বুক ফাটে কি বলব আর, ভারতভূমি চেনা ভার,
নাই আচার, নাই অধিকার, আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন।
পাপেতে পুরেছে রাজ্য, লোপ হয়েছে বৈধকার্য্য,
হারাইয়ে বল বীর্য্য, হলো দাসত্ব অবলম্বন।
ছিল যে গৌরব কত, সকলি হইল গত,
কীর্ত্তি হত বৃত্তি হত, এবে হত হয় জীবন।
ধনধান্য রত্নভার, সব যায় সিন্ধু পার,
উঠিয়াছে হাহাকার কেহ না করে শ্রবণ।
রেখে গিয়েছিলেন সেই, শাস্ত্ররূপ শস্ত্র এই,
আজও রক্ষা পায় সেই কোনরূপে ধর্ম্ম ধন।
ভ্রাতৃভাব আর নাই দেশে, দগ্ধ হয় দেশ দ্বেষে দ্বেষে।
আর একবার সদুপদেশে, কর সব দুঃখ মোচন।

রাগিণী আলেয়া—তাল কাওয়ালি

এই ধরাতলে, ধন্য ধন্য ক্ষত্রিয় ললনা
যবন প্রয়াণকালে, পড়িয়া জঞ্জালজালে
সহিলে কতই যন্ত্রণা
পরশিলে দুরাশায়, সতীত্ব যাবে এই ভয়ে,
অনলে জীবন ঢালিয়ে ভয় ভাবনা।

জ্বালিতে সমরানল, করিতে দেশের কুশল
দিলে ভূষণ সকল, হয়ে প্রসন্ন বদনা
স্বদেশের অনুরাগে, বিরাগে আর মনোরাগে,
পাঠালে যবনের আগে, সুতে করি উত্তেজনা!
যত দিন রহিবে ক্ষিতি, তত দিন রহিবে খ্যাতি,
তোমরাই প্রকৃত সতী, সাধ্বী পতি-পরায়ণা।

হিন্দুমেলায় উপহার

১

হিমাদ্রি শিখরে শিলাসনপরি,
গান ব্যাস-ঋষি বীণা হাতে করি—
কাঁপায়ে পর্ব্বত শিখর কানন,
কাঁপায়ে নীহার-শীতল বায়।

২

স্তব্ধ শিখর স্তব্ধ তরুলতা,
স্তব্ধ মহীরুহ নড়েনাক পাতা।
বিহগ নিচয় নিস্তব্ধ অচল;
নীরবে নির্ঝর বহিয়া যায়।

৩

পুরণিমা রাত— চাঁদের কিরণ—
রজত ধারায় শিখর, কানন,
সাগর-উরমি, হরিত-প্রান্তর,
প্লাবিত করিয়া গড়ায়ে যায়।

৪

ঝঙ্কারিয়া বীণা কবিবর গায়,
"কেন রে ভারত কেন তুই, হায়,
আবার হাসিস! হাসিবার দিন
আছে কি এখনো এ ঘোর দুঃখে!"

৫

দেখিতাম যবে যমুনার তীরে,
পূর্ণিমা নিশীথে নিদাঘ সমীরে,
বিশ্রামের তরে রাজা যুধিষ্ঠির;
কাটাতেন সুখে নিদাঘ নিশি।

৬

তখন ও হাসি লেগেছিলো ভাল,
তখন ও বেশ লেগেছিলো ভাল,
শ্মশান লাগিত স্বরগ সমান,
মরু উরবরা ক্ষেতের মত।

৭

তখন পূর্ণিমা বিতরিত সুখ,
মধুর ঊষার হাস্য দিত সুখ,
প্রকৃতির শোভা সুখ বিতরিত
পাখীর কূজন লাগিত ভাল

৮

এখন তা নয়, এখন তা নয়,
এখন গেছে সে সুখের সময়।
বিষাদ আঁধার ঘেরেছে এখন,
হাসি খুসি আর লাগে না ভাল।

৯

অমার আঁধার আসুক এখন,
মরু হয়ে যাক্ ভারত কানন,
চন্দ্র সূর্য্য হোক্ মেঘে নিমগন
প্রকৃতি শৃঙ্খলা ছিঁড়িয়া যাক্

১০

যাক্ ভাগীরথী অগ্নিকুণ্ড হয়ে,
প্রলয়ে উপাড়ি পাড়ি হিমালয়ে,
ডুবাক্ ভারতে সাগরের জলে,
ভাঙ্গিয়া চুরিয়া ভাসিয়া যাক্।

১১

চাইনা দেখিতে ভারতেরে আর,
চাইনা দেখিতে ভারতেরে আর,
সুখ-জন্ম-ভুমি চির বাসস্থান,
ভাঙ্গিয়া চুরিয়া ভাসিয়া যাক্।

১২
দেখেছি সে দিন যবে পৃথ্বিরাজ,
সমরে সাধিয়া ক্ষত্রিয়ের কাজ,
সমরে সাধিয়া পুরুষের কাজ,
আশ্রয় নিলেন কৃতান্ত কোলে।

১৩
দেখেছি সে দিন দুর্গাবতী যবে,
বীরপত্নীসম মরিল আহবে
বীর বালাদের চিতার আগুণ?
দেখেছি বিস্ময়ে পুলকে শোকে।

১৪
তাদের স্মরিলে বিদরে হৃদয়,
স্তব্ধ করি দেয় অন্তরে বিস্ময়;
যদিও তাদের চিতা ভস্মরাশি,
মাটীর সহিত মিশায়ে গেছে!

১৫
আবার সে দিন(ও) দেখিয়াছি আমি,
স্বাধীন যখন এ ভারত ভূমি
কি সুখের দিন! কি সুখের দিন!
আর কি সে দিন আসিবে ফিরে?

১৬
রাজা যুধিষ্ঠির (দেখেছি নয়নে,)
স্বাধীন নৃপতি আর্য্য সিংহাসনে,
কবিতার শ্লোকে বীণার তারেতে,
সে সব কেবল রয়েছে গাঁথা!

১৭
শুনেছি আবার, শুনেছি আবার,
রাম রঘুপতি লয়ে রাজ্যভার,
শাসিতেন হায় এ ভারত ভূমি,
আর কি সে দিন আসিবে ফিরে!

১৮

ভারত কঙ্কাল আর কি এখন,
পাইবে হায়রে নূতন জীবন;
ভারতর ভস্মে আগুন জ্বলিয়া,
আর কি কখন দিবেরে জ্যোতি।

১৯

তা যদি না হয় তবে আর কেন,
হাসিবি ভারত! হাসিবিরে পুনঃ,
সে দিনের কথা জাগি স্মৃতিপটে,
ভাসে না নয়ন বিষাদ জলে?

২০

অমার আঁধার আসুক এখন,
মরু হয়ে যাক্ ভারত কানন,
চন্দ্র সূর্য্য হোক্ মেঘে নিমগন,
প্রকৃতি-শৃঙ্খলা ছিঁড়িয়া যাক্।

২১

যাক্ ভাগীরথী অগ্নিকুণ্ড হয়ে,
প্রলয়ে উপাড়ি পাড়ি হিমালয়ে,
ডুবাক ভারতে সাগরের জলে,
ভাঙ্গিয়া চুরিয়া ভাসিয়া যাক্।

২২

মুছে যাক্ মোর স্মৃতির অক্ষর,
শূন্যে হোক্ লয় এ শূন্য অন্তর,
ডুবুক আমার অমর জীবন,
অনন্ত গভীর কালের জলে।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

দ্র পৃ. ৪২।

দ্র ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, রবীন্দ্র-গ্রন্থ-পরিচয়, দ্বিতীয় সংস্করণ (১৩৫০), ‘‘রবীন্দ্রনাথের স্বাক্ষরযুক্ত প্রথম রচনা”।

দিল্লীর দরবার

দেখিছ না অয়ি ভারত সাগর, অয়ি গো হিমাদ্রি দেখিছ চেয়ে,
প্রলয়-কালের নিবিড় আঁধার, ভারতের ভাল ফেলেছে ছেয়ে।
অনন্ত সমুদ্র তোমারই বুকে, সমুচ্চ হিমাদ্রি তোমারি সম্মুখে,
নিবিড় আঁধারে, এ ঘোর দুর্দ্দিনে, ভারত কাঁপিছে হরষ-রবে!
শুনিতেছি নাকি শত কোটি দাস, মুছি অশ্রুজল নিবারিয়া শ্বাস,
সোনার শৃঙ্খল পরিতে গলায় হরষে মাতিয়া উঠেছে সবে?
শুধাই তোমারে হিমালয়-গিরি, ভারতে আজি কি সুখের দিন?
তুমি শুনিয়াছ হে গিরি-অমর, অর্জ্জুনের ঘোর কোদণ্ডের স্বর,
তুমি দেখিয়াছ সুবর্ণ আসনে, যুধিষ্ঠির রাজা ভারত শাসনে,
তুমি শুনিয়াছ সরস্বতী-কূলে, আর্য্য কবি গায় মন প্রাণ খুলে,
তোমারে শুধাই হিমালয়-গিরি—ভারতে আজি কি সুখের দিন?
তুমি শুনিতেছ ওগো হিমালয়, ভারত গাইছে ব্রিটিশের জয়,
বিষণ্ন নয়নে দেখিতেছ তুমি—কোথাকার এক শূন্য মরুভূমি—
সেথা হতে আসি ভারত-আসন লয়েছে কাড়িয়া, করিছে শাসন,
তোমারে শুধাই হিমালয়-গিরি ভারতে আজি কি সুখের দিন?
তবে এই সব দাসের দাসেরা, কিসের হরষে গাইছে গান?
পৃথিবী কাঁপায়ে অযুত উচ্ছ্বাসে কিসের তরে গো উঠায় তান?
কিসের তরে গো ভারতের আজি, সহস্র হৃদয় উঠেছে বাজি?
যত দিন বিষ করিয়াছে পান, কিছুতে জাগেনি এ মহা-শ্মশান,
বন্ধন শৃঙ্খলে করিতে সম্মান
ভারত জাগিয়া উঠেছে আজি?
কুমারিকা হতে হিমালয়-গিরি
এক তারে কভু ছিল না গাঁথা,
আজিকে একটি চরণ আঘাতে, সমস্ত ভারত তুলেছে মাথা!
এসেছিল যবে মহম্মদ-ঘোরী, স্বর্গ রসাতল জয়নাদে ভরি
রোপিতে ভারতে বিজয় ধ্বজা,
তখনো একত্রে ভারত জাগেনি, তখনো একত্রে ভারত মেলেনি,
আজ জাগিয়াছে, আজ মিলিয়াছে—
বন্ধন-শৃঙ্খলে করিতে পূজা!

ব্রিটিশ রাজের মহিমা গাহিয়া
ভূপগণ ওই আসিছে-ধাইয়া
রতনে রতনে মুকুট ছাইয়া ব্রিটিশ চরণে লোটাতে শির—
অই আসিতেছে জয়পুররাজ, ওই যোধপুর আসিতেছে আজ
ছাড়ি অভিমান তেয়াগিয়া লাজ, আসিছে ছুটিয়া অযুত বীর!
হারে হতভাগ্য ভারত-ভূমি,
কণ্ঠে এই ঘোর কলঙ্কের হার
পরিবারে আজি করি অলঙ্কার
গৌরবে মাতিয়া উঠেছে সবে?
তাই কাঁপিতেছে তোর বক্ষ আজি
ব্রিটিশ রাজের বিজয় রবে?
ব্রিটিশ বিজয় করিয়া ঘোষণা, যে গায় গাক্‌ আমরা গাব না
আমরা গাব না হরষ যান,
এস গো আমরা যে ক-জন আছি, আমরা ধরিব আরেক তান।

দ্র পৃ. ৪৯-৫০।

দ্র ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, রবীন্দ্র-গ্রন্থ-পরিচয়, দ্বিতীয় সংস্করণ (১৩৫০), 'হিন্দুমেলায় পঠিত রবীন্দ্রনাথের দ্বিতীয় কবিতা'। ঐ প্রবন্ধে কবিতাটির বিষয়ে বিস্তারিত বিবরণ আছে।

হিন্দু মেলার বিবরণ

শুভেন্দুশেখর মুখোপাধ্যায় সংকলিত

হিন্দু মেলার বিবরণ

রাজনারায়ণ বসু জাতীয় গৌরব সম্পাদনী সভার কার্যবিবরণে[১] যে অনুষ্ঠানপত্র রচনা করেন তাহা নবগোপাল মিত্র কর্তৃক প্রকাশিত National Paper হইতে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার ১৭৮৭ শক চৈত্র সংখ্যায় মুদ্রিত হয়।[২] প্রধানতঃ ইহারই প্রেরণায় নবগোপাল মিত্র কয়েকজনের সহায়তায় জাতীয় মেলা ও জাতীয় সভা প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ করেন। রাজনারায়ণ বসুর উক্তিতে 'আমরা যখন সঙ্কীর্ণ গৃহে অস্পষ্ট বর্ত্তিকার আলোকে জাতীয় গৌরব সম্পাদনী সভার কার্য্য করিতাম তখন আমরা স্বপ্নেও মনে করি নাই যে, তাহা হইতে চৈত্র (হিন্দু) মেলারূপ বৃহৎ ব্যাপার সম্ভূত হইবে। মেলার ভাবটি নূতন, তাহা আমাদিগের মনে উদিত হয় নাই, কিন্তু মেলা সংস্থাপক মহাশয় তৎসংস্থাপন কার্য্যে আমাদিগের প্রকাশিত "Prospectus of a Society for the Promotion of National Feeling among the Educated Natives of Bengal" প্রস্তাব দ্বারা যে উদ্বুদ্ধ হইয়াছিলেন ও তাহা হইতে বিশেষ সাহায্য প্রাপ্ত হইয়াছিলেন এবং মেলার কোন কোন বিষয়ে ঐ প্রস্তাব অনুসারে অবিকল কার্য্য হইয়া থাকে ইহা তিনি স্বীয় ঔদার্য্য ও মহত্ত্বগুণে স্বীকার করিবেন।'[৩]

১৮৬৭ সালে বাংলা ১২৭৩ সনের চৈত্র-সংক্রান্তিতে আশুতোষ দেবের বেলগাছিয়া উদ্যানে এই মেলার প্রথম অধিবেশন হয় [দ্র. পৃ. ২৬]। প্রথম বৎসরের অনুষ্ঠানে সমারোহ হয় নাই। 'জন্মদিনে কেবল কতিপয় বান্ধব ও প্রতিবেশীমাত্র উৎসাহী ছিলেন। অর্থাৎ নিজ বাটীর লোক ও নিজ কুটুম্ব বই নয়।'[৪] প্রথম বৎসরের কোনো মুদ্রিত কার্যবিবরণ পাওয়া যায় নাই। ১২৭৪ সনের ৩০ চৈত্র শনিবার তারিখে একই স্থানে দ্বিতীয় অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। এই অধিবেশনের কার্যবিবরণ 'চৈত্র

১। 'আমি ইংরাজী ১৮৬৬ সালে "Prospectus of a Society for the Promotion of National Feeling among the Educated Natives of Bengal" আখ্যা দিয়া ইংরাজীতে একটি ক্ষুদ্র পুস্তিকা প্রকাশ করি। তাহার অনুবাদ "জাতীয় গৌরবেচ্ছা সভা সংস্থাপনের প্রস্তাব" নামে এই গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট হইল। উক্ত অনুবাদ কার্য্য আমার পরম প্রিয় আত্মীয় ও স্বসম্পর্কীয় সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের সম্পাদক শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয় দ্বারা সম্পাদিত হইয়াছে। এই প্রস্তাব দ্বারা উদ্বুদ্ধ হইয়া বান্ধববর শ্রীযুক্ত নবগোপাল মিত্র মহাশয় হিন্দু মেলা ও জাতীয় সভা সংস্থাপন করেন।'—রাজনারায়ণ বসু, ভূমিকা, 'বিবিধ প্রবন্ধ', প্রথম খণ্ড; ১২৮৯ শক।

রাজনারায়ণ বসুর আত্মচরিতে (১৩১৫) ভ্রমক্রমে Prospectusটির প্রকাশ কাল ১৮৬১ সাল বলিয়া মুদ্রিত হইয়াছে (পৃ. ১১০)।

২। শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল ইংরাজী অনুষ্ঠানপত্রখানি তাঁহার 'জাতীয়তার নবমন্ত্র বা হিন্দু মেলার ইতিবৃত্ত' গ্রন্থের (১৩৫২) পরিশিষ্টে মুদ্রিত করেন। [দ্র. বর্তমান সংকলনের পৃ. ৯১-৯৭]।

৩। রাজনারায়ণ বসুর আত্মচরিত, ১৩১৫, পৃ. ১২৯-১৩০।

৪। মনোমোহন বসুর বক্তৃতা, হিন্দুমেলার কার্য্যবিবরণ, ১৭৯০ শক;

মেলা' নামে প্রকাশিত হয়। তৃতীয় বৎসরের কার্যবিবরণে এই মেলার নাম হিন্দু মেলা বলিয়া স্বীকৃত হইলেও বস্তুতঃ পক্ষে চতুর্থ বৎসর হইতে ইহা স্পষ্টতঃ হিন্দু মেলা নামে পরিচিত হয়। দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর চতুর্থ বার্ষিক মেলায় তাঁহার সম্পাদকীয় প্রস্তাবে বলেন, 'অদ্যকার এই যে অপূর্ব্ব সমারোহ ইহা এতদিন পরে ইহার প্রকৃত নাম ধারণ করিয়াছে, ইহা হিন্দুমেলা নামে আপনাকে লোক সমক্ষে পরিচয় দিতেছে, বিহঙ্গ-শাবক যেমন অল্পে অল্পে আপনার বল পরীক্ষাপূর্ব্বক ক্রমে উচ্চতর নভোমণ্ডলে উড্ডীন হইতে সাহসী হয়, সেইরূপ প্রথমে জাতীয় মেলা চৈত্র মেলা এইরূপ অস্ফুট শব্দ আমাদের শ্রবণে আনন্দ বর্ষণ করিয়াছিল, এক্ষণে "হিন্দুমেলা" এই সুস্পষ্ট নাম দ্বারা মেলার প্রকৃত মূর্ত্তি প্রকাশ পাইতেছে।' [৫] প্রথম তিন বৎসর মেলা চৈত্র সংক্রান্তিতে অনুষ্ঠিত হইত। চতুর্থ বৎসর হইতে মাঘ-সংক্রান্তিতে মেলা-সংক্রান্তিতে মেলা অনুষ্ঠানের তারিখ নির্ধারিত হয়।

হিন্দুমেলা আমাদের স্বাদেশিকতার প্রথম সূচনা—'ইহাতে অধিক আহ্লাদের বিষয় এই, ব্রিটিশ সাম্রাজ্য হওনাবধি এদেশে যতকিছু উত্তম বিষয়ের অনুষ্ঠান হইয়াছে প্রায় রাজপুরুষগণ অথবা অপরাপর ইংরেজ মহাত্মারাই তাহার প্রথম উত্তেজক এবং প্রধান প্রবর্ত্তক। কিন্তু এই চৈত্রমেলা নিরবচ্ছিন্ন স্বজাতীয় অনুষ্ঠান, ইহাতে ইউরোপীয়দিগের নামগন্ধ মাত্র নাই, এবং যে সকল দ্রব্য সামগ্রী প্রদর্শিত হইবে, তাহাও স্বদেশীয় ক্ষেত্র, স্বদেশীয় ভূগর্ভ, স্বদেশীয় শিল্প এবং স্বদেশীয় জনগণের হস্ত-সম্ভূত। স্বজাতির উন্নতি সাধন, ঐক্য স্থাপন এবং স্বাবলম্বন অভ্যাসের চেষ্টা করাই এই সমাবেশের একমাত্র পবিত্র উদ্দেশ্য।' [৬] দ্বিতীয় বর্ষের অধিবেশনে সম্পাদক গণেন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁহার সম্পাদকীয় প্রস্তাবে ঘোষণা করেন, 'এই মিলন সাধারণ ধর্ম্ম কর্ম্মের জন্য নহে, কোন বিষয় সুখের জন্য নহে, কেবল আমোদ প্রমোদের জন্য নহে, ইহা স্বদেশের জন্য—ইহা ভারতভূমির জন্য।

'ইহার আরো একটি মহৎ উদ্দেশ্য আছে, সেই উদ্দেশ্য আত্মনির্ভর।...যাহাতে এই আত্মনির্ভর ভারতবর্ষে স্থাপিত হয়—ভারতবর্ষে বদ্ধমূল হয়, তাহা এই মেলার দ্বিতীয় উদ্দেশ্য। স্বদেশের হিতসাধন জন্য পরের সাহায্য না চাহিয়া যাহাতে আমরা আপনারাই তাহা সাধন করিতে পারি এই ইহার প্রকৃত ও প্রধান উদ্দেশ্য।'

রাজনারায়ণ বসুর অনুষ্ঠানপত্রে তাঁহার প্রস্তাবিত সভা ধর্মীয় ও রাজনৈতিক আন্দোলন হইতে বিরত থাকিবে এইরূপ ইচ্ছা প্রকাশিত হইয়াছিল—'An attempt to shew that the religion of our ancestors contains much that is worthy of respect as well as union to represent political grievances to Government are calculated to promote national feeling; but the National Promotion Society will not take measures for the same as there are separate Associations, namely, the Brahmo Somaj and the British Indian Association, established solely for the purposes above mentioned. It will abstain from the agitation of religious and political subjects।' তথাপি যে 'স্বাধীনতা' শব্দটি ভারতবর্ষীয় রাজনৈতিক ক্ষেত্রে পরবর্তীকালে বিশেষ গুরুত্ব লাভ করে, দ্বিতীয় বর্ষের চৈত্র মেলায় মনোমোহন বসুর বক্তৃতায় বোধ করি প্রথম প্রকাশ্যে তাহা উচ্চারিত হইল—'তাহার ফলের নাম করিতে এক্ষণে সাহস হয় না, অপর দেশের লোকেরা

৫। হিন্দু মেলা, ১৭৯১ শক।

৬। মনোমোহন বসুর বক্তৃতা, চৈত্রমেলা, ১৭৮৯ শক।

তাহাকে "স্বাধীনতা" নাম দিয়া তাহার অমৃতাস্বাদ ভোগ করিয়া থাকে। আমরা সে ফল কখন দেখি নাই, কেবল জনশ্রুতিতে তাহার অনুপম গুণগ্রামের কথামাত্র শ্রবণ করিয়াছি।'

হিন্দুমেলার ঐতিহাসিকতা ভূমিকা ও তাহার কার্য্যাবলীর যথার্থ মূল্যায়ন বিস্তৃত গবেষণার বিষয়। শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল তাঁহার 'জাতীয়তার নবমন্ত্র বা হিন্দুমেলার ইতিবৃত্ত' গ্রন্থে হিন্দুমেলার ধারাবাহিক ইতিহাস বিশদভাবে আলোচনা করিয়াছেন। এই গ্রন্থে দ্বিতীয় ও তৃতীয় বর্ষের কার্যবিবরণের অংশবিশেষ উদ্‌ধৃত হইয়াছে। হিন্দুমেলার বার্ষিক কার্যবিবরণসমূহ বর্তমানে দুষ্প্রাপ্য। সম্প্রতি এক খণ্ড দ্বিতীয় বর্ষের কার্যবিবরণ পাইয়াছি। ইহার গুরুত্ব বিচারে সমগ্র কার্যবিবরণটি পুনর্মুদ্রিত হইল। ইহা ভিন্ন সম্প্রতি চতুর্থ বর্ষের কার্যবিবরণের সন্ধানও পাওয়া গিয়াছে। তৃতীয় ও চতুর্থ বর্ষের কার্যবিবরণ বারান্তরে প্রকাশের ইচ্ছা রহিল।

দ্বিতীয় বর্ষের কার্যবিবরণের সূচনায় সম্পাদক গণেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও সহকারী সম্পাদক নবগোপাল মিত্র মেলার প্রধান উদ্দেশ্য ব্যক্ত করেন। তার পর 'বিশেষ বিশেষ উন্নতিসাধক কার্য সংসাধন জন্য বিশেষ বিশেষ' ছয়টি মণ্ডলীর নাম ঘোষিত হয়।

প্রারম্ভ সংগীতের পর গণেন্দ্রনাথ ঠাকুর 'চৈত্র মেলার উদ্দেশ্য' বিষয়ে প্রস্তাব পাঠ করেন। অতঃপর নবগোপাল মিত্র বিগত বৎসরের সংক্ষিপ্ত বৃত্তান্ত পাঠ করেন। ইহা ভিন্ন মনোমোহন বসু কর্তৃক প্রদত্ত বক্তৃতার বিবরণ এবং অধিবেশনের বিভিন্ন অনুষ্ঠানের পরিচয় দেওয়া হয়। সর্বশেষে 'চৈত্র মেলার সাহায্যকারিদিগের নাম' ও 'খরচ' মুদ্রিত হয়।

ইহা ছাড়া যে-সকল গান ও কবিতা মেলায় গীত, পঠিত ও প্রচারিত হয় তাহাও অনুষ্ঠানের ক্রমানুসারে মুদ্রিত হয়। [৭]

৭। উদ্বোধনী সংগীত

মিলে সবে ভারত সন্তান। সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর

কবিতা

যথা দেশ দেশান্তর, পর্য্যটিয়ে পান্থবর। অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরী

জাগ জাগ জাগ সবে ভারত সন্তান। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর

আহ কি অপূর্ব্ব শোভা আজি এ কাননে। শিবনাথ শাস্ত্রী

সংস্কৃত কবিতা

সারদা শারদাম্ভোদবর্ণা বর্ণাত্মিকা স্তু নঃ। তারানাথ শর্ম্মা

কল্লান্তোত্থশ্বসন তরলোল্লোলমালাকবালে। রামতারণ শিরোমণি

পূর্ব্বং যে জনকাদয়ো নৃপবরাজাতাস্তদানীং। ভবশঙ্কর বিদ্যারত্ন

সংগীত

উঠ উঠ সকলে হে ভারত সন্তান।

লজ্জায় ভারত যশ গাইব কি করে। গণেন্দ্রনাথ ঠাকুর

এদেশের দুখে কার না সরে চোখের জল।

ছাড় হে অসার অলস, প্রস্তুত হও লভিতে যশ।

প্রচারিত কবিতা

মানিলাম বঙ্গবাসি, বুদ্ধিতে চতুর।

ব্যায়াম বিষয়ক কবিতা

বিদ্যা শিক্ষা সঙ্গে সঙ্গে শিখিলে ব্যায়াম।

দ্বিতীয় বর্ষের কার্যবিবরণ

চৈত্র মেলা

চৈত্র সংক্রান্তি শনিবার ১৭৮৯ শক

গত বৎসর চৈত্রসংক্রান্তিতে এই মেলা প্রথম সংস্থাপিত হয়, দেশীয় লোক মধ্যে সদ্ভাব সংস্থাপন এবং দেশীয় লোক দ্বারা স্বদেশীয় সৎকার্য্য সাধন করাই ইহার প্রধান উদ্দেশ্য। এই বৎসরের মেলার কার্য্য যাহাতে সুচারু রূপে সম্পন্ন হয়, তজ্জন্য কলিকাতাস্থ ভদ্র ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণকে অধ্যক্ষ পদ গ্রহণ করিতে অনুরোধ করা যায় এবং নিম্নলিখিত প্রস্তাব সাধারণ মধ্যে প্রচার করা হয়।

১৭৮৮ শকের চৈত্র সংক্রান্তিতে যে একটি জাতীয় মেলা হইয়াছিল, স্বজাতীয়দিগের মধ্যে সদ্ভাব সংস্থাপন করা ও স্বদেশীয় ব্যক্তিগণ দ্বারা স্বদেশের উন্নতি সম্পাদন করাই তাহার উদ্দেশ্য। কিন্তু যদি এই জাতীয় মেলার উৎসাহ কেবল ক্ষণ কালের নিমিত্ত হয় এবং অস্মদ্দেশীয়দিগের মধ্যে সকল শ্রেণী ও সকল সম্প্রদায়ের এই বিষয়ে একটি অটল উৎসাহ ও যত্ন স্থাপনের উপায় না করা হয়, তাহা হইলে আমারদিগের এই উদ্দেশ্য সম্পূর্ণ রূপে সফল হইবার ব্যতিক্রম ঘটিবে। এই অভিপ্রায়ে আমাদিগের দেশীয় কতিপয় ভদ্র ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিকে উদ্‌যোগী হইতে অনুরোধ করা হইয়াছে এবং স্বদেশের বিশেষ বিশেষ উন্নতি সাধক কার্য্য সংসাধন জন্য বিশেষ বিশেষ মণ্ডলী স্থাপিত হইয়াছে। ইঁহারা সকলেই স্ব স্ব নির্দ্দিষ্ট কার্য্য সাধন করিয়া সাধারণ কার্য্যের প্রতি যত্ন করিবেন। যেরূপে কার্য্য নির্ব্বাহ হইবে, তাহা নিম্নে প্রদর্শিত হইল।

১। এই মেলাভুক্ত একটি সাধারণ মণ্ডলী সংস্থাপিত হইবে, তাঁহারা সমুদায় হিন্দু জাতিকে উপরোক্ত লক্ষ্য সকল সংসাধন জন্য এক দলে অভিভুক্ত এবং স্বদেশীয় লোকগণ মধ্যে পরস্পরের বিদ্বেষ ভাব উন্মূলন করিয়া উপরোক্ত সাধারণ কার্য্যে নিয়োগ করত এই জাতীয় মেলার গৌরব বৃদ্ধি করিবেন।

২। প্রত্যেক বৎসরে আমাদিগের হিন্দু সমাজের কতদূর উন্নতি হইল, এই বিষয়ের তত্ত্বাবধারণ জন্য চৈত্রসংক্রান্তিতে সাধারণের সমক্ষে তাহার একটি সংক্ষিপ্ত বৃত্তান্ত পাঠ করা হইবে।

৩। অস্মদ্দেশীয় যে সকল ব্যক্তি স্বজাতীয় বিদ্যানুশীলনের উন্নতি সাধনে ব্রতী হইয়াছেন, তাঁহাদিগের উৎসাহ বর্দ্ধন করা যাইবে।

৪। প্রতি মেলায় ভিন্ন ভিন্ন স্থানের ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর লোকের পরিশ্রম ও শিল্পজাত দ্রব্য সংগৃহীত হইয়া প্রদর্শিত হইবে।

৫। প্রতি মেলায় স্বদেশীয় সঙ্গীত-নিপুণ ব্যক্তিগণের উৎসাহ বর্দ্ধন করা যাইবে।

৬। যাঁহারা মল্ল-বিদ্যায় সুশিক্ষিত হইয়া খ্যাতি লাভ করিয়াছেন, প্রতি মেলায় তাঁহাদিগকে একত্রিত করিয়া উপযুক্ত পারিতোষিক বা সম্মান প্রদান করা যাইবে এবং স্বদেশীয় লোক মধ্যে ব্যায়াম শিক্ষা প্রচলিত করিতে হইবে।

এই সকল কার্য্যের সুবিধার নিমিত্ত চাঁদা সংগৃহীত হইতেছে। যাঁহারা এই সকল কার্য্যকে স্বদেশের হিতকর বলিয়া বিবেচনা করেন, তাঁহারা অর্থ সাহায্য করিয়া আমাদিগকে যথোচিত উৎসাহিত করিলে বাধিত হইব।

শ্রীগণেন্দ্রনাথ ঠাকুর।
সম্পাদক।
শ্রীনবগোপাল মিত্র
সহকারী সম্পাদক।

যাঁহারা অনুগ্রহ করিয়া উপরোক্ত কর্ম্ম সাধনের ভার গ্রহণ করিয়াছেন, পর্য্যায় ক্রমে তাঁহাদের নাম নিম্নে লিখিত হইল।

১। শ্রীযুক্ত রাজা কমলকৃষ্ণ বাহাদুর, বাবু রমানাথ ঠাকুর, দিগম্বর মিত্র, তারিণীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, কাশীশ্বর মিত্র, দুর্গাচরণ লাহা, নীলকমল বন্দ্যোপাধ্যায়, ঈশ্বরচন্দ্র ঘোষাল, মহেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, প্যারীচরণ সরকার, গিরিশচন্দ্র ঘোষ, জয়গোপাল সেন, দেবেন্দ্রনাথ মল্লিক, কৃষ্ণদাস পাল এবং যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর।

২। শ্রীযুক্ত বাবু নীলকমল বন্দ্যোপাধ্যায়, গিরিশচন্দ্র ঘোষ, ভোলানাথ পাল, রাধিকাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় এবং জগচ্চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

৩। শ্রীযুক্ত বাবু মহেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, প্যারীচরণ সরকার, রাজনারায়ণ বসু, দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য, জয়নারায়ণ তর্কপঞ্চানন, ভরতচন্দ্র শিরোমণি, ভবশঙ্কর বিদ্যারত্ন, তারানাথ তর্কবাচস্পতি এবং হরিনারায়ণ তর্কসিদ্ধান্ত।

৪। শ্রীযুক্ত কুমার সুরেন্দ্রকৃষ্ণ দেব, বাবু জয়গোপাল সেন, প্রসাদদাস মল্লিক, প্রিয়নাথ ঘোষ, ব্রজনাথ দেব, জয়গোপাল মিত্র, যাদবচন্দ্র মুখোপাধ্যায় এবং সালিকরাম।

৫। শ্রীযুক্ত কুমার সুরেন্দ্রকৃষ্ণ দেব, অক্ষয়কুমার মজুমদার এবং ব্রজনাথ দেব।

৬। শ্রীযুক্ত বাবু ঈশ্বরচন্দ্র ঘোষাল, দুর্গাদাস কর, গোপাললাল মিত্র এবং অম্বিকাচরণ গুহ।

শ্রীযুক্ত বাবু কালীপ্রসন্ন ঘোষ, ভবানীচরণ গুহ, নীলকমল মুখোপাধ্যায় এবং যজ্ঞেশপ্রকাশ গঙ্গোপাধ্যায়। ইঁহারা আয় ব্যয় পরীক্ষার ভার গ্রহণ করিয়াছেন।

উপরোক্ত এই সকল প্রস্তাব প্রায় স্বদেশহিতৈষী ব্যক্তি মাত্রের নিকটে সমাদৃত হইয়াছে এবং প্রত্যেকে আপন আপন সাধ্যানুসারে সাহায্যপ্রদান করিয়াছেন। সাহায্যকারিদের নাম ভিন্ন স্থানে প্রকটিত করা গেল।

অবধারিত দিনে আশুতোষ দেবের বেলগাছিয়ার উদ্যানে বেলা প্রায় দশ ঘণ্টার সময় মেলার কার্য্য আরম্ভ হইল।

শ্রীযুক্ত ভবশঙ্কর বিদ্যারত্ন মহাশয় সভা আহ্বান করিলেন এবং এই সঙ্গীত সহকারে সভার কার্য্য আরম্ভ হইল।

সঙ্গীত।

রাগিণী খাম্বাজ—তাল আড়াঠেকা।

১

মিলে সবে ভারত সন্তান,
একতান মন প্রাণ,
গাও ভারতের যশোগান॥

২

ভারতভূমির তুল্য আছে কোন্ স্থান?
কোন্ অদ্রি হিমাদ্রি সমান?
ফলবতী বসুমতী, স্রোতঃস্বতী পুণ্যবতী,
শত খনি রত্নের নিধান॥
হোক্ ভারতের জয়,
জয় ভারতের জয়,
গাও ভারতের জয়,
কি ভয় কি ভয়,
গাও ভারতের জয়॥

৩

রূপবতী সাধ্বী সতী, ভারত ললনা,
কোথা দিবে তাদের তুলনা?
শর্ম্মিষ্ঠা সাবিত্রী সীতা, দময়ন্তী পতিরতা,
অতুলনা ভারত ললনা॥
হোক্ ভারতের জয়,
জয় ভারতের জয়,
গাও ভারতের জয়,
কি ভয় কি ভয়,
গাও ভারতের জয়॥

৪

বশিষ্ঠ গৌতম অত্রি মহামুনিগণ,
বিশ্বামিত্র ভৃগু তপোধন।
বাল্মীকি বেদব্যাস ভবভূতি কালিদাস,
কবিকুল ভারত ভূষণ॥

হোক্ ভারতের জয়,
জয় ভারতের জয়,
গাও ভারতের জয়,
কি ভয় কি ভয়,
গাও ভারতের জয়॥

৫

বীর-যোনি এই ভূমি বীরের জননী;
অধীনতা আনিল রজনী,
সুগভীর সে তিমির, ব্যাপিয়া কি রবে চির,
দেখা দিবে দীপ্ত দিনমণি॥
হোক্ ভারতের জয়,
জয় ভারতের জয়,
গাও ভারতের জয়,
কি ভয় কি ভয়,
গাও ভারতের জয়॥

৬

ভীষ্ম দ্রোণ ভীমার্জ্জুন নাহি কি স্মরণ,
পৃথ্বীরাজ আদি বীরগণ?
ভারতের ছিল সেতু, যবনের ধূমকেতু,
আর্ত্তবন্ধু দুষ্টের দমন॥
হোক্ ভারতের জয়,
জয় ভারতের জয়,
গাও ভারতের জয়,
কি ভয় কি ভয়,
গাও ভারতের জয়॥

৭

কেন ডর, ভীরু, কর সাহস আশ্রয়,
যতো ধর্ম্ম স্ততো জয়॥
ছিন্ন ভিন্নে হীন বল, ঐক্যেতে পাইবে বল,
মায়ের মুখ উজ্জ্বল করিতে কি ভয়?
হোক্ ভারতের জয়,

জয় ভারতের জয়,
গাও ভারতের জয়,
কি ভয় কি ভয়,
গাও ভারতের জয়॥

পরে শ্রীযুক্ত বাবু গণেন্দ্রনাথ ঠাকুর মেলার উদ্দেশ্য বিষয়ে এই প্রস্তাব পাঠ করিলেন।

চৈত্র মেলার উদ্দেশ্য

এই চৈত্র মেলার তত্ত্বাবধায়কগণ এই মেলার উদ্দেশ্য বিবৃত করিবার ভার আমার প্রতি অর্পণ করিয়াছেন এবং তজ্জন্যই আমি আপনাকে এই কর্ম্মের অনুপযুক্ত মনে করিয়াও তাঁহাদের অনুরোধে যথাসাধ্য ইহার উদ্দেশ্য প্রকাশ করিতে উদ্যোগী হইয়াছি। এই মেলার প্রথম উদ্দেশ্য বৎসরের শেষে হিন্দুজাতিকে একত্রিত করা, এইরূপ একত্র হওয়ার ফল যদ্যপি আপাততঃ কিছুই দৃষ্টিগোচর হইতেছে না কিন্তু আমাদের পরস্পরের মিলন এবং একত্র হওয়া যে কত আবশ্যক ও তাহা যে আমাদের পক্ষে কত উপকারী তাহা বোধ হয় কাহারও অগোচর নাই। এক দিনে কোন এক সাধারণ স্থানে একত্রে দেখা শুনা হওয়াতে অনেক মহৎ কর্ম্ম সাধন, অনেক উৎসাহ বৃদ্ধি ও স্বদেশের অনুরাগ প্রস্ফুটিত হইতে পারে, যত লোকের জনতা হয় ততই ইহা হিন্দুমেলা ও ইহা হিন্দুদিগেরি জনতা এই মনে হইয়া হৃদয় আনন্দিত ও স্বদেশানুরাগ বর্দ্ধিত হইতে থাকে। আমাদের এই মিলন সাধারণ ধর্ম্ম কর্ম্মের জন্য নহে, কোন বিষয় সুখের জন্য নহে, কেবল আমোদ প্রমোদের জন্য নহে, ইহা স্বদেশের জন্য—ইহা ভারত ভূমির জন্য।

ইহার আরো একটি মহৎ উদ্দেশ্য আছে, সেই উদ্দেশ্য আত্মনির্ভর। এই আত্মনির্ভর ইংরাজ জাতির একটি প্রধান গুণ। আমরা সেই গুণের অনুকরণে প্রবৃত্ত হইয়াছি, আপনার চেষ্টায় মহৎ কর্ম্মে প্রবৃত্ত হওয়া, এবং তাহা সফল করাকেই আত্মনির্ভর কহে। ভারতবর্ষের এই একটি প্রধান অভাব, আমাদের সকল কর্ম্মেই আমরা রাজপুরুষগণের সাহায্য যাচঞা করি, ইহা কি সাধারণ লজ্জার বিষয়? কেন আমরা কি মনুষ্য নহি? মানব জন্ম গ্রহণ করিয়া চিরকাল পরের সাহায্যের উপর নির্ভর করা অপেক্ষা লজ্জার বিষয় আর কি আছে; অতএব যাহাতে এই আত্মনির্ভর ভারতবর্ষে স্থাপিত হয়—ভারতবর্ষে বদ্ধমূল হয়, তাহা এই মেলার দ্বিতীয় উদ্দেশ্য। স্বদেশের হিতসাধন জন্য পরের সাহায্য না চাহিয়া যাহাতে আমরা আপনারাই তাহা সাধন করিতে পারি এই ইহার প্রকৃত ও প্রধান উদ্দেশ্য।

এই উদ্দেশ্য সাধন জন্য আমাদের স্বদেশীয় কতিপয় ভদ্র মান্য বক্তি এই মেলার কোন না কোন ভার গ্রহণ করিয়াছেন। একতা নিবন্ধন, স্বদেশানুরাগবর্দ্ধন ও স্বদেশের প্রকৃত উন্নতির পথ নির্দ্দেশ জন্য মণ্ডলী সকল সংস্থাপিত হইয়াছে, কেহ কেহ দেশের প্রকৃত উন্নতির প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া তাহা লিপিবদ্ধ করিতেছেন, কেহ কেহ যাহাতে ভারত যুবক যুবতী বিদ্যাভূষণে ভূষিত হয় তাহার জন্য যত্নশীল হইয়া সেই ভার গ্রহণ করিয়াছেন; বিদ্যা এবং জ্ঞান আমরা যেখান হইতে পাই তাহা লইতে কুণ্ঠিত হইব না, কেহ কেহ সেই বিদ্যার ফল-স্বরূপ শিল্পজাত নানাবিধ

সামগ্রী সংগ্রহ করিয়া ভারতবর্ষীয় লোকগণের তৎ তৎ বিষয়ে উৎসাহ বৃদ্ধি করিবার জন্য তাহার প্রদর্শনে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, কেহ কেহ হৃদয়ের প্রকৃত স্বর যে সংগীত—সেই সংগীত বিদ্যার উন্নতি সাধনে ঐকান্তিক যত্ন করিতেছেন, কেহ কেহ বা আমাদের শারীরিক দুর্ব্বলতা বিমোচন জন্য সচেষ্ট হইয়াছেন, কেহ কেহ এই মেলার জন্য সংগৃহীত অর্থ যাহাতে এই মেলারি নিমিত্ত ব্যয় হয় তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখিতেছেন। যখন আমাদের সকলেরি এরূপ যত্ন, তখন আমি মুক্তকণ্ঠে বলিতেছি যে এই কর্ম্ম, বা এই উদ্দেশ্য সফল হইবেই হইবে, কিন্তু নিরুৎসাহের কর্ম্ম নহে এবং সেই উৎসাহের জন্যই সিদ্ধিদাতা ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিয়া এই প্রস্তাবের উপসংহার করিলাম ইতি।

তারিখ ৩০ চৈত্র।
শকাব্দ ১৭৮৯
শনিবার।

তৎপরে শ্রীযুক্ত বাবু নবগোপাল মিত্র সংক্ষিপ্ত রূপে এই বৃত্তান্ত পাঠ করিলেন।

আমরা বিশ্ববিধাতার—মঙ্গল দাতার কৃপায় সাংসারিক সমস্ত আপদ্ বিপদ্ উল্লঙ্ঘন করিয়া ১৭৮৯ শক অতিক্রম করিলাম। এক্ষণে গত বৎসরে আমাদের দেশ মধ্যে বা দেশ সম্পর্কে কি কি প্রধান প্রধান ঘটনা হইয়াছে, সেই সকল বৃত্তান্ত আপনাদের গোচর করিতে প্রবৃত্ত হই।

রাজ্য সম্বন্ধীয়।

এ বৎসর অস্মদ্দেশে, প্রদেশের যুদ্ধ বিগ্রহের কোন উৎপাত সহ্য করিতে হয় নাই, কেবল পঞ্জাব সীমায় বিজোটী জাতির উপদ্রব ঘটে।

আবিশিনিয়ায় যুদ্ধ যাত্রাকে ১৭৮৯ শকের ভারতবর্ষীয় ইতিহাসের একটি প্রধান ঘটনা বলিয়া গণ্য করিতে হইবে। কেন না এই যুদ্ধ ব্যয়ের কিয়দংশ ভারতবর্ষকে সহ্য করিতে হইয়াছে।

অনেকেই এইরূপ আশঙ্কা করিয়াছিলেন, মহীসুরের মহারাজ পরলোক গমন করিলেই উক্ত রাজ্য ব্রিটিশ রাজত্বভুক্ত হইবে; কিন্তু এই বৎসর বৃদ্ধ রাজা কলেবর পরিত্যাগ করাতে, তাঁহার পোষ্য পুত্রই রাজ্য পদ প্রাপ্ত হইয়াছেন, গত বৎসর মহীসুরের রাজ্য সম্বন্ধে ভারতবর্ষের সেক্রেটরি অব ষ্টেট্ মহারাণীর এক ঘোষণা পত্র প্রচার দ্বারা এই রূপ প্রতিপন্ন করিয়াছিলেন, যে তাঁহারা আর এদেশীয় রাজাদিগের রাজ্য আপনাদের রাজ্যাভিভুক্ত করিবেন না।

১৭৮৯ শকে ভারতবর্ষের হিতার্থ লণ্ডন নগরে ইষ্ট ইণ্ডিয়া সভা প্রতিষ্ঠিত হয়, এবং সভ্যেরা ষ্টেট্ সেক্রেটরির নিকট এই আবেদন করেন যে, ভারতবর্ষের চিহ্নিত কর্ম্মচারীর অর্থাৎ সিবিল সর্‌বিস পরীক্ষার দ্বারা ভারতবর্ষীয়দিগের নিমিত্ত যে প্রকার উন্মুক্ত হইয়াছে, তাহাতে কোন ফল দর্শিতেছে না। অতএব যাহাতে লণ্ডনের ন্যায় কলিকাতা, মাদ্রাজ এবং বোম্বেতেও চিহ্নিত কর্ম্মচারীর পরীক্ষা হয় এরূপ প্রণালী প্রচলিত করা হউক।

প্রতি বৎসর রাজস্ব বৃদ্ধি হয় তথাচ অনটন যায় না। সাধারণে ইহাতে অসন্তুষ্ট হইয়া গত বৎসর প্রতিনিধি প্রণালী স্থাপন করিতে অভিলাষ প্রকাশ করেন।

ব্রিটিশ গবর্ণমেন্টের শাসন প্রণালীর অনুকরণ করিয়া জয়পুরের মহারাজ শাসন প্রণালী সংশোধন করিয়াছেন। নবাব সালার জঙ্গ এক কৃতবিদ্য হিন্দু জাতীয় সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির উপর তাঁহার রাজ্য-শাসন ভার দেন, তাহাতে ঐ রাজ্যের অতীব উপকার হইয়াছে।

অগ্রহায়ণ মাসে গবর্ণর জেনেরল লক্ষ্ণৌয়ে একটি দরবার করেন। ঐ দরবারে মানসিংহ প্রভৃতিকে ষ্টার অব ইণ্ডিয়া নামক প্রসিদ্ধ খ্যাতি-চিহ্ন প্রদান করেন।

গত বৎসর বাবু প্রসন্নকুমার ঠাকুর, গবর্ণর জেনারেলের ব্যবস্থাপক সমাজের আসন প্রাপ্ত হইয়াছেন।

অচিহ্নিত কর্ম্মচারীদিগকে (অর্থাৎ প্রায় এদেশস্থ লোককে) সহকারী কমিশনর প্রভৃতি উচ্চ পদ প্রদানের নিয়ম হইয়াছে। কিন্তু যে স্থানে ইংরাজ অধিক আছেন, সেই স্থানে অচিহ্নিতেরা উক্ত পদ পাইবেন না।

মুন্সেফদিগের বেতন বৃদ্ধির পথ পরিষ্কৃত হইয়া সদর-আমিনের পদ বৃদ্ধি ও প্রধান সদর আমিনের বেতন বৃদ্ধি হইয়াছে এবং তাঁহারা শুবারডিনেট জজ বলিয়া খ্যাতি লাভ করিয়াছেন। গত বৎসরে শ্রীযুত বাবু মনোমোহন ঘোষ হাইকোর্টে ব্যারিষ্টরের কর্ম্ম করিতে আরম্ভ করেন।

বাণিজ্য।

গত বৎসর বাণিজ্যে অবস্থা বড় মন্দ গিয়াছে। কিন্তু রেলওয়ের অতিশয় উন্নতি হইয়াছে। অনেক স্থলে নূতন লাইন সংযোজিত হইয়াছে, মাতলা রেলওয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়াতে গবর্ণমেন্ট ঐ রেলওয়ের কর্ত্তৃত্বভার লইয়াছেন।

স্বাস্থ্য সম্বন্ধীয়।

১৭৮৯ শকের কার্ত্তিক মাসে ১৬ তারিখে রাত্রিকালে এক ভয়ানক ঝড় বৃষ্টি হইয়া অনেক অনিষ্ট সাধন করেন। উহা অনেকের সম্পত্তি হানি এবং অনেক জীবের প্রাণ হানি করিয়াছে। কেবল কলিকাতা ও ইহার নিকটস্থ স্থান সমূহেই ন্যূনাধিক বার শত লোকের মৃত্যু হয়। এতদ্ভিন্ন কত স্থানে কত লোক মরিয়াছে, তাহার নির্ণয় হয় নাই। বহু সহস্র গৃহাদি ভূমিসাৎ ও দেশের অনেক শস্য সম্পত্তি নষ্ট হইয়াছে। ঝটিকা কৃত ক্ষতির সংপূরণার্থে দেশীয় ও বিদেশীয় বহুতর ব্যক্তি অনেক অর্থ প্রদান করিয়া বদান্যতা প্রদর্শন করিয়াছিলেন। এই সাহায্য উপলক্ষে লক্ষ মুদ্রারও অধিক সংগৃহীত হইয়াছিল।

প্রসিদ্ধ ব্যাধিমন্দির রঙ্গপুর, দিনাজপুর ও পূর্ণিয়া প্রভৃতি প্রদেশ পূর্ব্বাপেক্ষা স্বাস্থ্যকর হইয়াছে। নদিয়া, হুগলি, বারাশত্ প্রভৃতি স্বাস্থ্য প্রদ প্রদেশগুলি ক্রমে যার পর নাই অস্বাস্থ্যকর হইয়া উঠিয়াছে। মহামারী এই সকল স্থানে স্থিরাধিপত্য স্থাপন করিয়াছে। সুন্দরবন অধিক পরিমাণে পরিষ্কৃত হইতেছে বটে, কিন্তু জনপদগুলি ক্রমে ক্রমে অরণ্যময় হইয়া উঠিতেছে। এ বিষয়ে সকলের বিশেষ দৃষ্টিপাত আবশ্যক।

ঢাকায় গত বৎসর ভয়ানক ওলাউঠা উপস্থিত হইয়া অনেক মনুষ্যকে নষ্ট করে।

মৃত্যু।

গত বৎসরে হিন্দু সমাজের অনেক সম্ভ্রান্ত, বিজ্ঞ, ও স্বদেশের অলঙ্কার স্বরূপ ব্যক্তির মৃত্যু হয়; যথা—

সর রাজা রাধাকান্ত দেব বাহাদুর, অনরবিল শম্ভুনাথ পণ্ডিত, কবিকেশরী প্রেমচাঁদ তর্কবাগীশ ও রাম গোপাল ঘোষ।

বিদ্যা সম্বন্ধীয়।

গত বৎসর শিক্ষা বিভাগের কিছু উন্নতি হইয়াছে। কতকগুলি স্কুলের সংখ্যা বাড়িয়াছে, এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বারা এ বৎসর বিদ্যা শিক্ষার অনেক উন্নতি সাধিত হইয়াছে। শ্রীযুক্ত বাবু দুর্গাচরণ লাহা উন্নতির জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ে ৫০০০০ পঞ্চাশ হাজার টাকা দান করিয়াছেন। পূর্ব্বাপেক্ষা প্রদেশ মধ্যে অধিক পরিমাণ বিদ্যার চর্চ্চা হইতেছে। অনেক পল্লীগ্রামেও ইংরাজি ও বাঙ্গলা বিদ্যালয় স্থাপিত হইতেছে, কেম্ব্রিজের বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি সংস্কৃত ভাষায় অধ্যাপক নিযুক্ত হইয়াছেন। যশোহর স্থানের নিকটবর্ত্তী অমৃত বাজারস্থ অমৃত যন্ত্রালয় হইতে একখানি সাপ্তাহিক সংবাদ পত্রিকা প্রকাশিত হইয়াছে, রাজসাহী প্রদেশে রাজসাহী পত্রিকা নামক একখানি মাসিক সংবাদপত্র জন্মগ্রহণ করিয়াছে এবং একটি মুদ্রাযন্ত্রও আনিত হইয়াছে।

ঢাকা নিবাসী শ্রীযুত বাবু হরিশচন্দ্র মিত্র কর্ত্তৃক জানকী নাটক নামক এক পুস্তক, শ্রীযুত বাবু নবীনচন্দ্র দত্ত কর্ত্তৃক খগোল বিবরণ নামক এক পুস্তক, শ্রীযুত বাবু দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্ত্তৃক তত্ত্ববিদ্যা নামক এক পুস্তক এবং বাবু শ্যাম চাঁদ দাস কর্ত্তৃক কাব্য সংগ্রহ নামক একখানি পুস্তক গত বৎসর প্রকাশ হইয়াছে। এতদ্ভিন্ন গত বৎসর অন্যান্য অনেক পুস্তক মুদ্রাঙ্কিত হইয়াছে।

সমাজ সম্বন্ধীয়।

সমাজের উন্নতি জন্য নানা প্রকার উন্নতি চেষ্টা আরম্ভ হইয়াছে। বহু স্থানে মদ্যপান নিবারণী সভা স্থাপিত হইতেছে। সামাজিক উন্নতির নিমিত্ত অনেক সম্ভ্রান্ত লোক চৈত্র মেলা আরম্ভ করিয়াছেন। ঈশ্বর করুন, ইহার দ্বারা হিন্দু সমাজের প্রকৃত মঙ্গল হউক, দেশীয় লোক দ্বারা দেশীয় সৎ কার্য্য অনুষ্ঠিত হউক এবং সকল জাতি ও শ্রেণী মধ্যে সদ্ভাব সংস্থাপন করুক।

অনন্তর নিম্নলিখিত পদ্যসকল পঠিত হইল।

যথা দেশ দেশান্তর, পর্য্যটিয়ে পান্থবর,
হেরে নানা দৃশ্য মনোরম।
নবীন বান্ধব সনে, নব প্রেম আলাপনে,
করে সুখে সময় যাপন॥
কিন্তু যদি সে সময়, সমুখে উদয় হয়,
স্বদেশ সম্ভূত তরু লতা।
সব দুঃখ তিরোহিত, স্মৃতি পথে বিকটিত,
স্বদেশের সুধাময় কথা॥

অস্মদাদি সেইমত, অবিরত থাকি রত,
নানা মত কাজেতে জড়িত।
থাকিয়াও দেশান্তরে, থাকি যেন দেশান্তরে,
নানা ভাবে চিত আন্দোলিত॥
বিদেশের রীতি নীতি, বিদেশের কাব্য স্মৃতি,
অধ্যয়ন দিবস যামিনী।
তাই আজ পান্থরূপ, হেরি মেলা অপরূপ,
মনে পড়ে ভারত কাহিনী॥
প্রকৃতি প্রমোদোদ্যান, ভারত সুখদ স্থান,
স্বভাবের শোভার নিলয়।
মাধবী-মল্লিকা শ্রম, কোকিলের কুঞ্জবন
গর্ভে যার হীরা মণিময়॥
তুঙ্গ শৃঙ্গ অগোচর, অভ্র ভেদী ধরাধর,
চারি ধার করে যার রোধ।
লক্ষ লক্ষ স্রোতস্বতী, বহে যথা বেগবতী,
হেরে যারে হয় হেন বোধ॥
ভারত সুরূপ যুতা, প্রকৃতির প্রিয় সুতা,
স্বভাবের শোভার প্রতিমা।
প্রবাহিনী শত শত, সেবিয়া কিঙ্করী মত,
সম্পাদিছে সৌন্দর্য্য গরিমা॥
ভারত দুর্ল্লভ দেহে, প্রকৃতি জননী-স্নেহে,
পরায়েছে বিচিত্র ভূষণ।
পর্ব্বত প্রাচীর দিয়া, জল দল বিস্তারিয়া,
রাখে তারে করিয়া বেষ্টন॥
কিন্তু কি বিরূপ কথা, নিদারুণ মনোব্যথা,
আছে যার এমন সম্বল।
কিসের কারণে, তার, অশ্রু নীরে অনিবার,
ভাসমান নয়ন যুগল॥
প্রকৃতির দুঃখ গেল, এই তো বসন্ত এল,
পাত হলো শীতের পীড়ন।
হিমাচল ক্ষীণকায়, বিগত উত্তর বায়
মৃদু বহে মলয় পবন।।
নবীন পল্লব ভরা, নব ফুলে আলো করা,
শোভে তরু নগরে গহনে।

পাইয়ে নূতন প্রাণ, সুতানে করিছে গান,
সুললিত বিহঙ্গম গণে॥
চক্রে ঘোরে ঋতু ছয়, হিমান্তে বসন্তোদয়,
সুপ্রফুল্ল স্বভাব সহসা।
কিন্তু সে বসন্ত কবে, প্রকাশিয়ে যবে যাবে,
ভারত গো! তব হীন দশা॥
কেমনে সুখের দিন, অনন্তে হইল লীন?
আর কি তা আসিবেনা ফিরি?।
কোথায় প্রতাপ শালী, প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ডাবলী,
অস্ত গেল ধরায় আঁধারি?॥
বলহে ভারতবাসী, অকর্ম্ম মৃত্তিকা রাশি,
ভীরুতায় ভীরুতা ভবন।
পড়ে কিনা পড়ে মনে, দাশরথি চারিজনে,
পড়ে মনে কুরুক্ষেত্রে রণ॥?
কেমনে কামিনী কুল, কেশরিণী সমতুল,
দুর্গাবতী গরা রাজ্যেশ্বরী।
স্বরাজ্য করিতে ত্রাণ, সমরে ত্যজিল প্রাণ,
সুকৃপাণ নারী করে ধরি?॥
হেন সব বীর বর, ভারতের প্রভাকর,
কোথা গেল আঁধারি ভুবনে।
যে দেশে পদ্মিনী সতী, জনমে সে দেশ গতি,
হেন হবে, কে জানে স্বপনে॥
যথা রাম রঘুবরে, পিতৃ সত্য রক্ষা তরে,
রাজ্য সুখ পরিহার করে।
যে দেশে পাণ্ডব গণ, রাখিতে আপন পণ,
বিপিনে বিপিনে কাল হরে॥
শাক্য সিংহ যেই দেশে, সহজে সন্ন্যাসী বেশে,
পাশরিয়ে পিতৃ রাজ্য-ধন।
ধরম প্রচার তরে, ফেরে দেশ দেশান্তরে,
যাউক বা থাকুক জীবন॥
কোথায় কোকিল স্বর, কালিদাস কবিবর,
কোথা বাল্মীকি তপোধন।
বিদ্যার আশ্রয় স্থল, কোথা ব্যাস পাতঞ্জল,
গোতম কপিল ঋষিগণ॥

যাদের সমান আর, ত্রিজগতে পাওয়া ভার,
ত্রিজগতে ঘোষে এই রব।
কোথায় বা পরাশর, ভাস্কর পণ্ডিত বর,
জ্যোতিষের মূলাধার সব॥
ক্ষণ কাল প্রকাশিয়ে, ধরাধাম আমোদিয়ে,
কোথা গেল আঁধারি ভুবনে।
যে দেশেতে লীলাবতী, জনমে, সে দেশগতি,
হেন হবে কে জানে স্বপনে॥
হায় কি হইল শেষ, দাহন করিছে দেশ,
সুরায় অনল স্রোতস্বতী।
কত শত পরিবার, পুড়ে হল ছারখার,
হৃদি ফাটে দেখিয়ে দুর্গতি॥
কি কব লোকের গুণ, সুরাতে হতেছে খুন,
তবু তায় না ছাড়িতে পারে।
প্রদীপ পতঙ্গ প্রায়, প্রমত্ত হইয়ে ধায়,
না ভাবি কি হল, হবে পরে॥
জননীর হাহাকার, বনিতার অশ্রুধার,
দ্রবিতে কি পারে কভু তায়।
সন্তানের আর্ত্তনাদ, পরিজন কুৎসাবাদ,
ভূধরে মলয়াঘাত প্রায়॥
লোকের কি ব্যবহার, সদা করে কদাচার,
বলিতে অনল দহে কায়।
সবে তাই ঘরে পরে, অখ্যাতি ঘোষণা করে,
কুলিশ কসেরাঘাত প্রায়॥
বীর্য্যহীন শীর্ণকায়, দেহ ভরা ভীরুতায়,
মুখে মারে আকাশ পাতাল।
প্রচুর ধনের আশে, মনোবীর্য্য সর্ব্বনাশে,
হাতে সদা তোষামোদ জাল॥
ছিছি হে ভারতবাসী, এমন কুকর্ম্ম রাশি,
সাজে কি ভারতবাসী হয়ে।
ক্ষণতরে ক্ষমা দাও, নয়ন মিলিয়া চাও,
উঠ উঠ দিন যায় বয়ে॥
এই বেলা ভাঙ্গ ঘুম, ভারতে লেগেছে ধুম,
উঠেছে যে নব্য সম্প্রদায়।

নিষ্কাষিয়ে জ্ঞান অসি, বিনাশিয়ে ভ্রম রাশি,
দেশের উন্নতি দিগে ধায়॥
নব রাগে হয়ে স্ফীত, নব তেজে উত্তেজিত,
নব রসে হয়ে বলীয়ান।
ভারত গো! তোমাতরে, আত্ম সমর্পণ করে,
আজ তার দেখ গো প্রমাণ॥
দেখ সব একত্তরে, সৌহৃদ্য শৃঙ্খল পোরে,
তব কথা করে উত্থাপন।
দুঃখের যামিনী ঘোর, ত্বরায় হইবে ভোর,
দেখ মাতা মিলিয়ে নয়ন॥
নারীকুল শিল্প কাজ, চারি দিকে হেরি আজ,
আশালতা উত্তেজিতা হয়।
ফিরে পাব কত দিন, হবে তুমি শোকহীন,
আস্যে তব হাস্যের উদয়।।

শ্রী অক্ষয় চন্দ্র চৌধুরী

"জন্মভূমি জননী, স্বর্গের গরীয়সী"।
জাগ জাগ জাগ সবে ভারত সন্তান!
মাকে ভুলি কতকাল রহিবে শয়ান?
ভারতের পূর্ব্ব কীর্ত্তি করহ স্মরণ
রবে আর কত কাল মুদিয়ে নয়ন?
দেখ দেখি জননীর দশা একবার
রুগ্ন শীর্ণ কলেবর, অস্থি চর্ম্ম সার;
অধীনতা অজ্ঞানাদি রাক্ষস দুর্জ্জয়
শুষিছে শোণিত তাঁর বিদরি হৃদয়;
স্বার্থপর অনৈক্যতা পিশাচ প্রচণ্ড,
সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর দেহ করে খণ্ড খণ্ড।
মায়ের যাতনা দেখি বল কোন প্রাণে
সুপুত্র থাকিতে পারে নিরুদ্বিগ্ন মনে?
যে জননী পয়ঃ-সুধা শতনদী-ধারে,
পিয়াইছে নিরবধি আমা সবাকারে;
যে জননী মৃদু হাসি সব দুঃখ ভুলি
উপাদেয় নানা অন্ন মুখে দেন তুলি;
এমন মায়েরে ভোলে যে কোন সন্তান,

নিশ্চয় হৃদয় তার পাষাণ সমান।
ঐ দেখ, মাতা বসি ঘোর কারাগারে
হাতে বেড়ি পায়ে বেড়ি অজ্ঞান-আঁধারে।
ঝরিতেছে অশ্রু-নীর-ঘন বহে শ্বাস,
ছট্ ছট্ করিছেন এ-পাশ ও-পাশ।
ঐ দেখ কাঁদিছেন জননী বিহ্বলা;
(গুমরিয়া কত কাল থাকিবে অবলা?)
অত্যাচার, অবিচার আদি প্রেতগণ,
সে কারার দ্বার-দেশ করিছে রক্ষণ;
ভীষণ মুরতি সব ভীমদণ্ড করে
দ্বার দেশ আগুলিয়া সদা ঘোরে ফেরে।
বিলাপের ধ্বনি শুনি যত রক্ষগণ
তটস্থ হইছে সবে সচকিত মন।
কেহ বা বুঝায় কেহ মুখ চেপে ধরে
"চুপ্ চুপ্" বলি ওঠে সবে এক স্বরে
কিন্তু শোক-বেগ কভু না মানে বারণ
সাগর উথলে যদি কে করে শাসন?
এ সকল দেখি শুনি কার প্রাণে সয়
ওঠরে ভারতবাসী! কি ভয়, কি ভয়!
কোষ মধ্যে অসি দেখ কাঁপিছে সঘনে,
রোষ করি ঝাঁকি ঝাঁকি উঠে ক্ষণে ক্ষণে।
ওরেরে দুর্ব্বল বন্ধু কৃপালু কৃপাণ!
ও নৃশংস প্রেতগণে কর খান্ খান্।
খসাইয়া ফেল্ শীঘ্র বন্ধনের রশি
'সাধু সাধু' তবে তোরে বলি ওরে অসি!
কিন্তু ফাটে যে হৃদয়! আবার কি শুনি!
ক্রমশ বাড়িছে দেখি ক্রন্দনের ধ্বনিঃ—

"ওরে নিদারুণ বিধি, কেন দিয়ে রূপ-নিধি,
মজালে এমন কর্য়ে আমায় বল না?
তস্করে আনিলে ডাকি, অবলারে দিয়ে ফাঁকি,
বুঝিছি, বুঝিছি, তব কেবলি ছলনা।
প্রকৃতি জননী মম! রূপে গুণে নিরুপম॥
তোমার ছিলাম আমি সোহাগের ধন।

কত যত্নে সাজাইতে, কত বিদ্যা শিখাইতে,
জানিতে কি মম দশা হইবে এমন?
কমল-কোরক-মধু, ভ্রমরই পিইবে শুধু,
লুতার তা লুটিবার আছে অধিকার?
এ সকল সাজসজ্জা, দিতেছে কেবলি লজ্জা,
অবশেষে হল ইহা বোঝামাত্র সার।
পৃথ্বী-তলে যত শোভা, ছিল যত মনোলোভা,
সকলি আমার তরে আনিলে হেথায়;—
পঙ্কজ-শোভন-সর, গিরিসিন্ধু নদীবর,
কুসুমাভরণ বন—কত কব হায়!
কত করিতাম ক্রীড়া, জানি নাই কোন পীড়া,
তোমার আঁচল ধরি মনের উল্লাসে;
কভু হিমাচল শিরে, কভু মান! সরোনীরে,
মন সাধে ফিরিতাম আকাশে আকাশে।
এবে বিধি করি আড়ি, সকলি লইল কাড়ি,
অবশেষে ফেলে মোরে ঘোর কারাগারে;
কারে কই দুঃখ-কথা, কে বুঝিবে মম ব্যথা,
এবে পুত্র করে লাজ মা বলিতে মারে!
থাকিত সে কালিদাস, আর ভবভূতিব্যাস,
বাল্মীকি আদি প্রিয় সন্তান সকল,
কিবা সুমধুর তানে, কিবা সুললিত গানে,
প্রতপ্ত হৃদয় মোর করিতে শীতল!
আর কি শুনিবে কান, বীর পুত্র যশোগান,
তাদের ছিলাম আমি প্রাণের জননী;
শুনিলে তাদের কথা, তবু জুড়াইত ব্যথা,
অপার পাথার মাঝে পেতাম তরণী।
কোথা গেল ভীমার্জ্জুন, অস্ত্র শাস্ত্রে সুনিপুণ,
রামচন্দ্র পৃথ্বীরাজ আদি বীরগণ!
এস এস ফিরি পুন, জননীর কথা শুন!
(কিন্তু হায় বৃথা আশা—অরণ্যে রোদন)
তোমরা থাকিতে যদি, বহিত কি দুঃখ নদী,
সহিতে হত কি মোর এত অপমান?
কোপেতে উঠিতে জ্বলি, দস্যুদলে দিতে বলি
সঁপিতে আমার তরে ধন মন প্রাণ।"

দেখ! কুহকিণী আশা, পশি কারাগারে
বুঝাইছে নানা মতে ভারত মাতারে—
"শান্ত হলো প্রিয়সখি—মুছ অশ্রুনীর,
পোহাইব দুঃখ নিশা—হয়ো না অধীর।
তোমার বিলাপ ধ্বনি ভেদিয়া পাষাণ
পৌঁছিয়াছে শুন সখি সেই দিব্যধাম।
প্রকৃতি জননী তব শোকেতে বিহ্বল,
উঠেছে স্বরগে আজি মহা কোলাহল।
ভীমার্জ্জুন ব্যাস আদি দিব্যবাসীগণ,
মাগিতেছেন এই বর ব্রহ্মার সদন,
যেন তব গর্ভে করি জনম গ্রহণ.
উজ্জ্বল করেন পুন তোমার বদন
তোমারে জানাতে ইহা আইলাম হেথা,
শান্ত হও প্রিয়সখি! —কেন কাঁদ বৃথা।"

শ্রী জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।

১

আহা কি অপূর্ব্ব শোভা আজি এ কাননে
যেদিকে ফিরিয়া চাই, সে দিকে দেখিতে পাই,
হাসিছে খেলিছে সবে আনন্দিত মনে।

২

কোলাহলে পরিপূর্ণ সমুদয় স্থল!
জন স্রোত অনিবার, বহে নাহি সংখ্যা তার,
পদভরে যেন ভূমি করে টলমল!

৩

আজি কি অভাগা বঙ্গ মেলিল নয়ন রে মেলিল নয়ন?
ছাড়রে নিদ্রার ঘোর, রজনী হইল ভোর,
উঠে দেখ পূর্ব্বাচলে উদিত তপন।

৪

বঙ্গ বাসি! আর কত থাকিবে নিদ্রায় রে থাকিবে নিদ্রায়?
জাগ জাগ নারীনর, উঠ বাঁধ পরিকর,
অলসে পড়িয়া আর কেন রে শয্যায়?

৫

জন্মে নাকি বীরপুত্র বঙ্গের উদরে রে বঙ্গের উদরে?
আমরা কি চিরদিন, হয়ে আছি পরাধীন,
চিরদিন আছি কিরে নত মুখ করে?

৬

বঙ্গজন! ভ্রাতৃগণ! কর প্রণিধান
পাব না সময় আর, মনসুখে একবার,
বঙ্গের পূর্ব্বের কথা করি আজি গান।

৭

রাজসূয় করি যবে পাণ্ডব তনয়
এদেশ জয়ের তরে, পাঠাইল বৃকোদরে,
বঙ্গ কি এ-হেন ভীরু ছিল সে সময়?

৮

সমুদ্র ও চন্দ্রসেন ভূপতি দুজন,
রাখিতে দেশের মান, সাহসে সঁপিল প্রাণ,
করিল পাণ্ডব সনে ঘোরতর রণ।

৯

বঙ্গের সে শুভ দিন আসিবে কি আর রে আসিবে কি আর?
আর কি সে সুখ পাবে, হীনতা জড়তা যাবে,
জননী বিনত মুখ তুলিবে আবার?

১০

সিংহবাহু নামে এক ছিল নরবর
বিজয় নামেতে তাঁর, ছিল পুত্র, নাম যাঁর,
করিলে নাচিয়ে উঠে উল্লাসে অন্তর।

১১

অভিমানে পিতৃগৃহ ত্যজিল বিজয়।
রাজ্যসুখ বিসর্জ্জিয়ে, জলযানে আরোহিয়ে,
জলনিধি পথে বীর চলিল নির্ভয়।

১২

সাহসে অসম বীর বিক্রমে অটল
রাজধানী পরিহরি, সাহসে নির্ভর করি,
ভাসিল জলধিজলে লয়ে দলবল।

১৩

নবীনা রমণী তার পতিব্রতা সতী
ভোগসুখ অবহেলে, রাজভোগ পদ ঠেলে,
কুমারের পিছে পিছে চলিলা যুবতী।

১৪

বহরে পবন বহ খেলরে সাগর
অরে খেলরে সাগর।
বীরবালা বীরবর, হইয়াছে অগ্রসর,
কখন বিপদ ভয়ে কাঁপে না অন্তর।

১৫

বহিয়া চলিল তরী করে মার মার
দাপটে নাচিছে জল, দেখিয়া বীরের বল,
ভয়ে ভয়ে যেন পথ দেয় পারাবার।

১৬

এরূপে দম্পতি যায় আনন্দিত মন
দিক দশ আবরিয়ে, জলস্থল আছাদিয়ে,
এক দিন ঘন ঘটা ছাইল গগন।

১৭

নীরব নিস্তব্ধ দিক হইল গভীর।
সৌদামিনী তড় তড়, ছোটে বজ্র কড় মড়,
গগন ফাটিয়া যেন হয় শতচির।

১৮

দেখিতে দেখিতে উঠে বিষম তুফান,
সিন্ধু মত্ত ভাব ধরি, উথলে গর্জ্জন করি,
নাচিল তরঙ্গ মালা উড়িল পরাণ।

১৯

উঠে আর পড়ে তরি, মত্তের মতন
ছিন্ন হলো রজ্জু জাল, ছিঁড়িয়া পড়িল পাল,
গেলরে গেলরে সব রাখে কোন জন।

২০

একে একে যত তরী ডুবিতে লাগিল
চারিদিকে হাহাকার, কেবল রোদন সার,
নির্দ্দয় সাগর সব উদরে পূরিল।

২১

কত বীর দিল প্রাণ জলধির জলে।
জানু পাতি বার বার, দেবে করি নমস্কার,
দেখিতে দেখিতে সবে গেল রসাতলে।

২২

এই কি তোমার খেলা গর্ব্বিত সাগর?
কি সুখ ইহাতে পাও, কোথায় লইয়া যাও,
এত খাও তবু কিরে পূরে না উদয়?

২৩

এই দি নির্দ্দয় সিন্ধু খেলা রে তোমার?
বঙ্গের হৃদয় ধন, ছিল যত বীরগণ,
তা সবে হরিলে আজ করি অন্ধকার।

২৪

এদিকে তরির পৃষ্ঠে, দাঁড়ায়ে বিজয়,
হাবু ডুবু করে তরী, একাপট দণ্ড ধরি[১]
বাহিরে দাঁড়ায়ে বীর নির্ভয় হৃদয়।

২৫

ঝঞ্ঝাবাতে কাঁপিতেছে সকল শরীর
করিছে অভয় দান, বীরের গর্ব্বিত প্রাণ,
মুহূর্ত্তের তরে কভু না হয় অস্থির।

২৬

সামাল সামাল রব মুখেতে কেবল।
কত সামালিবে আর, রুষিয়াছে পারাবার,
পদতলে গুঁড়া হয়ে পড়িছে অচল।

২৭

প্রেয়সীর তরে শুধু, হৃদয় কাতর
ভাবে, জল আস্ফালনে, না জানি যে এতক্ষণে,
পড়েছে অজ্ঞান হয়ে তরির উপর।

২৮

চকিতা হরিণী মত বুঝি এতক্ষণে।
ভাসিয়া নয়ন জলে, কোথা প্রাণনাথ বলে,
অভাগারে বার বার করিছে স্মরণ।

১। পট দণ্ড মাস্তুল।

২৯

অথবা পবন বলে বুঝি রসাতলে

গিয়াছে তাহার তরি, আহা মম প্রাণেশ্বরি,

বুঝিবা মিশালো আজ জলধির জলে।

৩০

এরূপে ভাবিছে, তরি ভাসিয়া চলিল।

বিনা কর্ণ কর্ণধার, রোধে তারে সাধ্য কার,

দেখিতে দেখিতে গিয়া লঙ্কাতে পড়িল।

৩১

হেথা কামিনীর তরি ঝটিকা পবনে

বেগে, ছিন্ন ভিন্ন হয়ে, ক্রমে যুবতীরে লয়ে,

মহেন্দ্র দ্বীপেতে আসি লাগে কতক্ষণে।

৩২

দ্বীপের উপরে তবে উঠিল কুমার

বীরাগ্রণী ছিল যারা, কোথায় গিয়াছে তারা,

সে সকল রত্নাকর করেছে সংহার।

৩৩

তথাপি সাহসে ভর করিয়া বিজয়

লয়ে সৈন্য গুটিকত, গর্ব্বিত রাজার মত,

প্রবেশিল রাজপুরে নির্ভয় হৃদয়।

৩৪

বাজিল কঠোর রণ যক্ষরাজ সনে

যোঝে বীর ঘোরতর, ত্রাহি ত্রাহি নারীনর,

লক্ষ লক্ষ যক্ষ গেল শমন সদনে।

৩৫

সমর চত্বরে যেন নাচে যুবরায়।

কঠোর অসির ঘায়, মস্তক উড়িয়া যায়,

রুধিরাদ্র হয়ে কত ধরাতে লোটায়।

৩৬

মার মার রবে বীর হয় অগ্রসর।

প্রচণ্ড আঘাত তার, সহ্য করে সাধ্য কার,

"পলারে, পলারে" রব উঠে ঘোরতর।

৩৭

সর্পের জিহ্বার মত খেলে তরবার।
রথরথী গজ হয়, একেবারে চূর্ণ হয়,
গেলরে গেলরে যক্ষ কে করে নিস্তার।

৩৮

ধন্য ধন্য শস্ত্রশিক্ষা ধন্য বীরপণা!
অস্ত্রে অস্ত্রে ঠকাঠকি, খেলে যেন চকমকি,
লিক লিক উঠিতেছে অনলের কণা।

৩৯

এরূপে যুঝিছে বীর কালান্তের প্রায়।
পড়িল যক্ষের দল, বীর শূন্য রণ স্থল,
কল কল শোণিতের নদী বহে যায়।

৪০

পরিশেষে যক্ষপতি করিল শয়ন।
অবশিষ্ট যক্ষ যত, হলো সবে পদানত,
কুমারেরে দিল সবে রাজ সিংহাসন।

৪১

রাজা হয়ে সিংহাসনে বসে বীরবর।
প্রখর দোর্দ্দন্ত তাপে, যক্ষপুরী ভয়ে কাঁপে,
অনল সমান বীর জ্বলে নিরন্তর।

৪২

এরূপেতে কিছুকাল বিগত হইল
সুখের নাহিক পার, রূপে গুণে ভুলে তাঁর,
যক্ষরাজ বালা তারে পতিত্বে বরিল।

৪৩

শুনিলে এসব কথা লাগয়ে বিস্ময়।
মাথা তোল বঙ্গভূমি, সত্য করে বল তুমি,
দেছিলে কি হেন বীরে উদরে আশ্রয়?

৪৪

হায় রে সে দিন তব ফিরিবে কি আর?
আর কি আরোহী তরী, সাহসে নির্ভর করি,
তোমার তনয় যাবে সাগরের পার?

৪৫

এমনি সাহসী এবে বঙ্গের সন্তান

আবাস কোটর ফেলে, দুদিনের পথে গেলে,

যাই যাই করে যেন কেঁদে, উঠে প্রাণ।

৪৬

বঙ্গের পূর্ব্বের কথা জানে কোন্ জন?

সে কথা শুধাব কারে, কে তাহা বলিতে পারে,

বিস্মৃতি-সলিলে সব হয়েছে মগন।

৪৭

জন্মেছিল এই বঙ্গে কত বীরবর।

মাথা তোলা বঙ্গভূমি, প্রকাশি বল মা তুমি,

তোমা বিনা জননী গো কে দিবে উত্তর।

৪৮

দেখাতে পারি না মুখ মরি মা লজ্জায়

সকলে দুর্ব্বল বলে, ঘৃণা করে পদে দলে,

ছি ছি এত অপমান সহা নাহি যায়।

৪৯

নাহি কোন স্মৃতিস্তম্ভ, নাহিক কবর।

নাহি নাম পরিচয়, হইয়া অঙ্গারময়,

মাটিতে মিশাল কত শূর বীরবর!

৫০

কি করিব? কোথা যাব? কে দিবে বলিয়া

বল মা কিরূপে তবে, তাদের উদ্ধার হবে,

কে তোমার আছে বন্ধু দেহ দেখাইয়া।

৫১

সাগরবাহিনি! অয়ি দেবি! ভাগীরথি!

যুগ যুগান্তর হতে, তুমিত গো এই পথে,

চিরদিন একভাবে যাও স্রোতস্বতি!

৫২

পতিতপাবনী তুমি বলে সর্ব্বজন।

সে কারণে তব তীরে, না জানি যে কত বীরে,

পুরাকালে বঙ্গবাসী করেছে দাহন।

৫৩

পার যদি পয়স্বিনী! জীয়াও সকলে।
তা না পার এই ক্ষণে, নিস্তেজ বঙ্গীয়গণে,
ভাসায়ে লইয়া যাও সাগরের জলে।

৫৪

সগর সন্তানে তুমি! করেছ উদ্ধার
বঙ্গেরে করুণা করি, অমৃত তরঙ্গ ধরি,
জীয়াও সে বীরগণে আজ একবার।

৫৫

তুমিত গো সিন্ধুপ্রিয়ে দেখেছ সকল।
মগধের রাজ্য যবে, ছিল এই দেশে তবে,
বল বঙ্গমাতা হলো কিরূপে বিকল?

৫৬

বল শুনি বল শুনি সেই পুরাকালে
ছিল না কি হেন বীর? সদর্পে যে দিত শির,
সমরচত্বরে সুখে আলিঙ্গিত কালে?

৫৭

বাঙ্গালির পোড়া দেহে কিরে ছিল না রুধির?
ছিল না কি তরবার, প্রখর আঘাতে যার,
ধরাতলে গড়াগড়ি যেত শত শির।

৫৮

ছি ছি এ লজ্জার কথা কহিব কাহায়।
হা অভাগি বঙ্গভূমি! মৃতকল্প আছ তুমি।
নতখে কাঁদি শুধু হেরিয়া তোমায়।

৫৯

স্বাধীনতা হারা হয়ে মগধের করে।
শ্রীহীন অনাথ মত, কত কাল হল গত,
ডুবিল গৌরবরবি কলঙ্কসাগরে।

৬০

তারপর পালবংশ রাখিল সম্মান
উঠ মা জননি বলে, তুলে নিজ বাহুবলে,
অপহৃত মণি তব করিল প্রদান।

৬১

আবার উড়িল কেতু তব করতলে
দূরে গেল মনো দুখ, তুলিলে মলিন মুখ,
শোভিল মধুর হাসি বদন মণ্ডলে।

৬২

রাজমাতা হয়ে মাতা রতন আসনে।
বসিলে তুলিয়া শির, যশোগান সুগভীর,
গাইল ভারতবাসী ভবনে ভবনে।

৬৩

পূজিতে জননি তব চরণ কমলে।
কত শত রাজা আসি, বিবিধ রতন রাশি,
লহ দেবি লহ বলে দিল পদতলে।

৬৪

তব পার্শ্বচরী ঘোর অটল বাহিণী।
শত শত নৃপতির, উন্নত গর্ব্বিত শির,
তব পদে নত করি দিল ওজস্বিনী।

৬৫

তোমার গর্ব্বিত কেতু কলিঙ্গ হৃদয়ে
নিখাতিয়া মদভরে, বীরদর্প চূর্ণ করে,
ফিরে এলো রণমদে উন্মাদিনী হয়ে।

৬৬

এইমাত্র জানি মাতঃ শুনি লোক মুখে
কিরূপে সে বীরবংশ, বল মা হইল ধ্বংস।
স্মরিলে তাদের কথা ভাসি মনোদুখে।

৬৭

ক্রমে গেল পালশশী অস্তাচলশিরে
এদিকে উজ্জ্বল ছবি, ধরি বৈদ্যবংশরবি,
দেখা দিল পূর্ব্বাচলে আসি ধীরে ধীরে।

৬৮

দিগন্ত প্রসারি তার ছুটিল কিরণ।
আবার বঙ্গের যশ, উজলিল দিক দশ,
আবার ভাতিল বঙ্গে রতন আসন।

৬৯

এই বংশে কত বীর জন্মি কত বার,
প্রকাশিয়ে ভুজবল, বিনাশিয়ে অরিদল,
ইন্দ্রপ্রস্থে নিজ রাজ্য করিল বিস্তার।

৭০

সে হেন উজ্জ্বল বংশ সেই ভুজবল,
সে হেন উন্নত নাম, সে হেন সুখের ধাম,
কালেতে বিহীন হায় হইল সকল।

৭১

কোথা হতে সিন্ধুপার হইয়ে যবন।
রাহুর সমান আসি, সুখের শশাঙ্ক গ্রাসি,
চাপিল বঙ্গের গলে গর্ব্বিত চরণ।

৭২

কাতরে কাঁদিলা মাতা পড়ি ধরা তলে
আলু থালু কেশ পাশ, ছিন্ন ভিন্ন হলো বাস,
কত রে তিতিল সুখ নয়নের জলে।

৭৩

মাতার এ দশা দেখি অন্ধের সমান;
সুখাসক্ত পুত্রগণ, ফেলে তাঁরে সর্ব্বজন,
আপন আপন বিলে করিল প্রস্থান।

৭৪

অপমানে নতমুখী মুদিয়া নয়ন,
অনাথা বন্দীর মত, জননী কাঁদিলা কত,
বধির সে বঙ্গবাসী কে করে শ্রবণ!

৭৫

ধিক্ রে লক্ষ্মণসেন ধিক্ শতবার।
ধিক্ তব সিংহাসনে, ধিক্ তব মন্ত্রিগণে,
ধিক্ ধিক্ নরপতি নামেতে তোমার।

৭৬

ছিল না কি হলাহল তোমার ভবনে।
কেন রজ্জু দিয়ে গলে, না ডুবিলে গঙ্গাজলে
কেন তুমি বসেছিলে রাজসিংহাসনে।

৭৭

থাকিয়া স্বাধীনভাবে গৃহে আপনার,
যদি পাত্রমিত্রসনে, প্রবেশিতে হুতাশনে.
তা হলে ত এ কলঙ্ক ঘটিত না আর।

৭৮

হা কি লজ্জা! অপমানে, সরে না বচন
পলাইলে কি কারণে, ভেবেছিলে কি যেন মনে,
পলালে উৎকলদেশে এড়াবে শমন।

৭৯

সেই যদি যমপুরে করিলে গমন
তবে ধরি তরবার, কেন হয়ে অগ্রসার,
না করিলে রণক্ষেত্রে গর্ব্বেতে শয়ন!

৮০

যদি নাই ছিল তব সৈন্যের সম্বল;
তবে কেন একেশ্বর, করি রণ ঘোরতর,
তুচ্ছ নরজন্ম নাহি করিলে সফল?

৮১

লম্বিত পলিত শ্মশ্রু রুধিরাক্ত করে।
সমররঙ্গেতে প্রাণ, দিতে যদি বলিদান,
ঘুষিত তোমার যশ আজি ঘরে ঘরে।

৮২

কারা নিবাসিনী কোন অভাগী কামিনী
যথা ঘোর অন্ধকারে, ভাসে শোক অশ্রুধারে,
বাম করে রাখি খড়্গ ভাবে একাকিনী।

৮৩

যবন নিগড়বদ্ধ হইয়া তেমন,
বঙ্গমাতা বহুদিন, আঁধারে যাপিলা দিন,
রোগে জীর্ণ শোকে শীর্ণ মলিন বদন।

৮৪

মাঝে মাঝে এক এক বীর পুত্র তাঁর
করি সৈন্য আহরণ, করিয়া জীবন পণ
মাতিল সমরে মাকে করিতে উদ্ধার।

৮৫

কিন্তু অসহায় কেবা কি করিতে পারে?
বল ছিল যত দিন, যুঝি সবে হলো ক্ষীণ
সাশ্রুনেত্র হয়ে শেষে হেরিল মাতারে।

৮৬

প্রতাপ আদিত্য রাজা আদিত্য সমান
এরূপে যবন সনে, করি রণ প্রাণপণে,
নিজ বীরত্বের সাক্ষ্য করিল প্রদান।

৮৭

ধন্য তুমি বীরবর করি নমস্কার
ধন্য তুমি গুণধাম, ভুলিব না তব নাম
রাখিব রাখিব গাঁথি হৃদয়ে আমার।

৮৮

আর সে পূর্ব্বের কথা কি হবে স্মরিলে!
স্মরিলে সে সব কথা, মরমে জনমে ব্যথা,
ডুবুক ডুবুক তাহা, বিস্মৃতি সলিলে।

৮৯

যবনের অত্যাচার অন্ধকার প্রায়,
ব্যাপ্ত ছিল এতদিন, ক্রমশ হতেছে ক্ষীণ,
সেই কাল রাত্রি বুঝি এখন পোহায়।

৯০

নিস্পন্দ নিস্তব্ধ হয়ে ছিনু সর্ব্বজন।
ইংরাজের সুশাসন, বহে মন্দ সমীরণ,
খোলো খোলো বঙ্গবাসী, খোলো রে নয়ন।

৯১

উদাসীন থাকিও না এ হেন সময়।
খোলো হৃদয়ের দ্বার, উঠে দেখ চমৎকার,
পূর্ব্ব দিকে হইয়াছে অরুণ উদয়।

৯২

যামিনী প্রভাত হলো জাগ বঙ্গ জন।
যাহারা পশ্চাতে ছিল, ওই তারা ফেলে গেল,
আর কেন? চেয়ে দেখ— মেল নয়ন।

৯৩

আর কেন? আলস্যের হয়েছে প্রচুর।
উঠরে সাহস ধর, চল হই অগ্রসর,
হীনতা জড়তা সবে কর কর দূর।

৯৪

সবাই উন্নতি পথে হয় অগ্রসর।
দীন হীন হয়ে হেন, আমরা থাকিব কেন?
পশ্চাতে পড়িয়া কেন রব নিরন্তর?

৯৫

যত্নে রত্ন মিলে! কেন হইব হতাশ।
আঘাত করিব দ্বারে, দেখি কে রোধিতে পারে,
যুঝিব যুঝিব সবে যতক্ষণ শ্বাস।

৯৬

অভাগী মাতার পুত্র উঠ সর্ব্বজন।
বল বুদ্ধি উপার্জ্জনে, রত থাক প্রাণপণে,
মন্ত্রের সাধন কিম্বা শরীর পতন।

৯৭

রে দুর্ব্বল বঙ্গবাসী হওরে সবল।
মুছ মুছ জননীর, প্রবল নয়ন নীর,
বাঙ্গালির পোড়া নাম কররে উজ্জ্বল

৯৮

দূর কর পরিহর বৃথা অভিমান
হৃদয় সুন্দর কর, কররে সাহসে ভর,
আপনি হীনতা ক্রমে করিবে প্রস্থান।

৯৯

নিয়ত কালের চক্র ঘুরিছে সংসার।
সকল কলঙ্ক যাবে, আবার দেখিতে পাবে,
বঙ্গের সুখের রবি উঠিবে আবার।

১০০

ভ্রাতৃ ভাবে মিল সবে করহে সাধনা।
দেখিবে আসিবে দিন, মোহ, জন্য হবে ক্ষীণ,
পূরিবে পূরিবে ভাব পূরিবে কামনা।

শ্রী শিবনাথ শর্ম্মণঃ।

বক্তৃতা।

(মেলার উদ্দেশে।)

মনোমোহন বসু কর্ত্তৃক। [১]

স্থির চিত্তে বিবেচনা করিলে এই বোধ হয়, আজ আমরা একটী অভিনব আনন্দবাজারে উপস্থিত হইয়াছি। সারল্য আর নির্ম্মৎসরতা আমাদের মূল ধন, তদ্বিনিময়ে ঐক্যনামা মহাবীজ ক্রয় করিতে আসিয়াছি। সেই বীজ স্বদেশ ক্ষেত্রে রোপিত হইয়া সমুচিত যত্নবারি এবং উপযুক্ত উৎসাহ্ তাপ প্রাপ্ত হইলেই একটী মনোহর বৃক্ষ উৎপাদন করিবেক। এত মনোহর হইবে, যে যখন জাতি গৌরব রূপ তাহার নব পত্রাবলীর মধ্যে অতি শুভ্র সৌভাগ্য পুষ্প বিকশিত হইবে, তখন তাহার শোভা ও সৌরভে ভারত ভূমি আমোদিত হইতে থাকিবে। তাহার ফলের নাম করিতে এক্ষণে সাহস হয় না, অপর দেশের লোকেরা তাহাকে "স্বাধীনতা" নাম দিয়া তাহা অমৃতাস্বাদ ভোগ করিয়া থাকে। আমরা সে ফল কখন দেখি নাই, কেবল জনশ্রুতিতে তাহার অনুপম গুণগ্রামের কথা মাত্র শ্রবণ করিয়াছি। কিন্তু আমাদিগের অবিচলিত অধ্যবসায় থাকিলে অন্ততঃ "স্বাবলম্বন" নামা মধুর ফলের আস্বাদনেও বঞ্চিত হইব না। ফলতঃ একতাই সেই মলিন সাধনের একমাত্র উপায় এবং অদ্যকার এই সমাবেশ রূপ অনুষ্ঠান যে সেই ঐক্যস্থাপনের অদ্বিতীয় সাধন, তাহাতে আর অনুমাত্র সন্দেহ নাই।

পুরাকালে এইরূপ মহা মেলার অনুষ্ঠান দ্বারাই গ্রীস দেশস্থ বিভিন্ন জাতির ঐক্য বন্ধন সাধিত হইয়াছিল। প্রসিদ্ধ ওলিম্পিক, পিথিয়ান, নিমিয়ান এবং ইস্থমিয়ান মেলা সমাজের নাম করিলে অদ্যাপি ভক্তির উদয় হয়। শারীরিক ও মানসিক উৎকর্ষ প্রদর্শনার্থেই সময়ে সময়ে সেই সেই মেলার রঙ্গ ভূমিতে সমস্ত গ্রীক জাতির গুণী ও গুণজ্ঞ—দর্শক ও প্রদর্শক গণের সমাবেশ হইত। বিচিত্র প্রদর্শন-ভূমি জনতায় পূর্ণ হইয়া উঠিত। প্রতিযোগিতার উৎসাহ এবং স্বদেশ বৎসলতার চিহ্ন সকলের মুখভঙ্গিতেই দীপ্তিমান থাকিত। এক দিকে চিত্রকর ও ভাস্করের শিল্পনৈপুণ্য প্রদর্শিত হইতেছে, অপরাংশে কবি ও পৌরাণিক বর্গ স্বীয় স্বীয় গাঁথা ও ঐতিহাসিক বর্ণনা পাঠ করিতেছেন, কোন স্থলে বা বাগ্মী মণ্ডলী অমৃতায়মানসালঙ্কার ও সদর্থ বাক্‌পটুতা প্রকাশ করিতেছেন, অন্যত্র মল্লযোদ্ধার মালসাট, শস্ত্রপাণির শস্ত্রবিলাস, সারথির রথচালনা-কৌশল এবং অশ্বারোহির অশ্বচালনা শিক্ষা প্রদর্শিত হইতেছে। রঙ্গভূমি আনন্দ কোলাহলে প্রতিধ্বনিত, এবং স্বজাতি-গৌরব, উৎসাহ

---

১. মনোমোহন বসুর বক্তৃতামালা (১২৮০) গ্রন্থে এই বক্তৃতাটি 'মেলা কি? মেলার উদ্দেশ্য কি?' নামে পুনর্মুদ্রিত হয়। সেখানে স্থানে স্থানে অতিরিক্ত অংশ সন্নিবেশিত হয়। তাহা যথাস্থানে পাদটীকায় উল্লেখ করা হইল।

বায়ু যোগে দিগন্ত ব্যাপ্ত হইতেছে। গুণের পুরস্কারক বিচারক মণ্ডলী নিরপেক্ষ ভাবে বিচার করিয়া পারিতোষিক বন্টন করিতেছেন। সে পারিতোষিক কি? স্বর্ণ নয়, রজত নয়, মণিমাণিক্যও নয়, লারেল নামক পত্রমুকুট অথবা এবম্বিধ অন্য কোন জয় চিহ্ন তাহাদিগের শিরে অর্পণ করিতেছেন, কিন্তু কোন গ্রীক তদপেক্ষা— আর কোন পুরস্কারকে আর কোন গৌরবকে উচ্চতর বলিয়া জানিত না।

কিন্তু তাহাদিগের এই মহদ্ব্যাপার কি এক দিনে সিদ্ধ হইয়া উঠিয়াছিল? তাহা নহে। তাহার মূল পত্তন সকল শুভকার্য্যের আদ্যাবস্থার ন্যায়— আমাদের এই চৈত্রমেলার ন্যায়— সামান্যাকারে আরব্ধ হইয়া অতি মহৎ কাণ্ডে পরিণত হইয়াছিল। তাহাও প্রথমে অল্প লোক দ্বারা অনুষ্ঠিত ও অল্প লোক দ্বারাই প্রতিপালিত হইয়াছিল। কাল সহকারে যেমন তাহার অপরিমেয় উৎকৃষ্ট ফলবত্তার বিষয় লোকের সুগোচর হইতে লাগিল, তেমনি ক্রমে ক্রমে তাহাতে সকলেই আসিয়া লিপ্ত হইতে আরম্ভ করিল। চতুর্দ্দিক হইতে প্রতিযোগী ও অনুরাগী আকর্ষিত হইতে লাগিল। দেশের সর্ব্ব বিভাগের ও সর্ব্ব শ্রেণীর লোকেই সর্ব্বান্তঃকরণে সেই শুভ ব্রতে ব্রতী হইয়া উঠিল। তখন সদ্‌গুণ, সৎশিক্ষা এবং স্বদেশানুরাগ বিষয়ে কে কাহাকে পরাজয় করিবে, পরস্পর এই জিগীষার বশবর্ত্তী হইয়া দেশের কতই শ্রীসম্পাদন করিয়া তুলিল।

আমরা এই ইতিহাস খণ্ডকে দৃষ্টান্তরূপে এস্থলে উপস্থিত করিলাম। ইহা কি আমাদিগের অনুকরণীয় অতি উপাদেয় আদর্শ নয়? আমরা কি চেষ্টা করিয়া ইহা সফল করিতে পারিব না? দেশ কাল অবস্থাভেদে যদিও তদ্রূপ অনুষ্ঠান ও তত্তুল্য ফলোৎপাদনে সমর্থ না হই, তথাপি আমাদিগের দেশের, আমাদিগের অবস্থার এবং আমাদিগের সময়ের উপযুক্ত উপায় অবলম্বনে ও উপকার সাধনে অবশ্যই কৃতকার্য্য হইব—কখনই নিরাশ হইব না।

বিশেষতঃ এ দেশে এ অনুষ্ঠান নূতন নহে। প্রকৃত ইতিহাস বিরহে বহু পূর্ব্বের কোন বিশেষ বিবরণ জানিতে আমরা বঞ্চিত আছি, তথাপি মহাভারতে বর্ণিত রাজচক্রবর্ত্তী ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞানুষ্ঠান বৃত্তান্ত এবং পুরাণোক্ত তদ্বৎ অন্যান্য যজ্ঞ বিবরণ পাঠে বিলক্ষণ জানা যায়, যে পূর্ব্বকালেও এই বহু বিস্তৃত ভারতভূমির পুণ্যবান লোকেরা সর্ব্ব জাতির একত্র সমাবেশ এবং সর্ব্ব দেশের দ্রব্যজাত প্রদর্শনের যে যে মহাফল, তাহার মর্ম্মজ্ঞ ছিলেন। যদিও তাহার উদ্দেশ্যের নাম স্বতন্ত্র ছিল, কিন্তু ফলদানে উভয়বিধ অনুষ্ঠানের কিছুমাত্র তারতম্য নাই। নানা দেশীয় শিল্পজ, খনিজ ও উদ্ভিজ পদার্থের প্রদর্শন দ্বারা এখানকার সমৃদ্ধ ইউরোপীয় সাম্রাজ্য মণ্ডলীতে যে অভীষ্ট সাধন হইতেছে, তখনও তাহাই হইত। নানা স্থানীয় গুণি জনের অধিষ্ঠান দ্বারা পাণ্ডিত্য কবিত্ব বাগ্মিতা কারুকার্য্য চিত্র নৈপুণ্য সঙ্গীত প্রভৃতি অশেষবিধ বিদ্যার প্রসঙ্গ এখনও যেরূপ, তখনও সেইরূপ বা কোন কোন বিষয়ে অপেক্ষাকৃত উৎকৃষ্টতর ছিল। শারীরিক বলবীর্য্যের তো কথাই নাই, আর্য্যাবর্ত্তে আর্য্য ধর্ম্মাক্রান্ত ক্ষত্রিয় জাতির অনুপম শৌর্য্য ও ধর্ম্মমূলক সাহসের কথা পাঠ করিয়া গর্ব্বিত না হয় এমন হিন্দু অদ্যাপি জন্ম

গ্রহণ করে নাই[১] এবং বিস্ময়াবিষ্ট না হয়, এমন কোন শূরবীর কোন জাতির মধ্যে অদ্যাপি অবতীর্ণ হয় নাই। সেই বল বীর্য্যের প্রদর্শন ও রহস্যাভিনয় যে সময়ে সময়ে অনুষ্ঠিত হইত, তাহার প্রমাণ বিরাট পর্ব্বে "শঙ্কা মেলার বর্ণনায়" স্পষ্টই দেখা যাইতেছে। কিন্তু সে কেবল মল্লযোদ্ধাদিগের নৈপুণ্য পরীক্ষার স্থল ছিল মাত্র।

তৎপরে অসীম প্রতাপান্বিত উজ্জয়িনীপতি বিক্রমাদিত্যের রাজ্যকালেও গুণজ্ঞতা ও গুণ প্রদর্শনের রীতি বিলক্ষণ প্রচলিত হইয়াছিল, কিন্তু সে প্রতিযোগিতা অধিকাংশ কেবল পাণ্ডিত্য ও কবিত্বেই আরব্ধ হইত, অন্য বিষয়ে তত উৎসাহ ছিল না, তথাপি তদ্দ্বারা ভারতের কি উপকার না হইয়াছে?

তৎপরবর্ত্তী অধুনাতন কালেও ঐরূপ শুভোদ্দেশে স্থানে স্থানে বিশেষতঃ বিবিধ পুণ্যতীর্থ স্থলে অসংখ্য মেলার সৃষ্টি হইয়াছে।[২] জগদ্বিখ্যাত হরিদ্বারের ও হরিহরছত্রের মেলার কথা সকলে শুনিয়াছেন। আমি এই শেষোক্ত মেলার বৃহদ্ব্যাপার স্বচক্ষে দেখিয়াছি। এই মেলা প্রতিবৎসর পৌষমাসের শেষে কয়েক দিবস পর্য্যন্ত হইয়া থাকে। পাটনার পরপার মায়াপুর নামক জনপদে প্রায় যোজন বিস্তৃত স্থানের মধ্যে যতগুলিন গ্রাম আছে, তত্তাবৎ লোকারণ্য ও একীভূত হইয়া যায়। অবধারিত দিনের বহুদিন পূর্ব্ব হইতে কুমারিকা অবধি হিমালয় পর্য্যন্ত এবং তদতিরিক্ত বহু বহু দেশ বিদেশের অধিবাসীরাও আগমন করিতে থাকে। রাজকর্ম্মচারী এবং অন্যবিধ বহুসংখ্যক ইউরোপীয় মহাশয়েরা আগ্রহ পূর্ব্বক তথায় উপস্থিত হন। তথায় নানা জাতীয় নানা ব্যবসায়ী নানা ধর্ম্মাক্রান্ত এবং নানা আকৃতি প্রকৃতির মনুষ্য, শত শত হস্তী, সহস্র সহস্য মনোহর অশ্ব, অসংখ্য গো মহিষাদি এবং বিভিন্ন দেশজাত বিভিন্ন প্রকার অমূল্য অপ্রাপ্য অপূর্ব্ব শোভনতম দ্রব্যরাশির একত্র সমাবেশ দেখিতে দেখিতে মন বিস্ময় রসে দ্রবীভূত হইয়া যায়। ভাগীরথীর গর্ভে কত প্রকার বিচিত্র বিচিত্র জলযান এবং স্থলে কত প্রকার শকটাদি যান বাহন লক্ষিত হইতে থাকে তাহা বলা যায় না! এককালে কোথায় বা নৃত্য গীত আমোদ কোলাহল, কোথায় বা ভোজবিদ্যা বিশারদ ক্রীড়কগণের অত্যাশ্চর্য্য নেত্ররঞ্জক ক্রীড়া, কোথায় বা মল্ল যোদ্ধৃগণের অদ্ভুত রণনৈপুণ্য, কোথায় বা ইউরোপীয় রীত্যনুসারে ঘোড় দৌড়, কোথায় বা ভণ্ডদলের ভণ্ডামি ইত্যাদি প্রতি পদে পদে পরিবর্ত্তনশীল নূতন নূতন রহস্য ব্যাপার দর্শনে দর্শকের আগমন-ব্যয় ও পরিশ্রম সার্থক বোধ হয়। আবার যখন এ সকল হইতে অবসৃত হইয়া তত্রত্য অধিষ্ঠিত দেবতা—যাঁহার উদ্দেশে এই মহামেলার অনুষ্ঠান—তাঁহার মন্দির সন্নিহিত হওয়া যায়, তখন-আর এক চমৎকার দৃশ্য। সহস্র সহস্র লোক—কি লক্ষ লক্ষ লোক বলিলেও অত্যুক্তি হয় না—কেননা গঙ্গাস্নান করিয়া দেব দর্শনে গমনশীল ব্যক্তিগণের আর্দ্রবস্ত্র নিঃসৃত জলদ্বারা পথ ঘাট এরূপ কর্দ্দমময় হইয়া উঠে, বোধ হয় যেন শ্রাবণ মাসের ধান্য ক্ষেত্রে

---

১. ফলতঃ তাহাকে মেলা আখ্যা দেওয়া কষ্ট-কল্পনা। তাহাকে বরং কবির মেলা ও পণ্ডিতের মেলা বলা যাইতে পারে।

২. দূরদর্শী শাস্ত্রকারেরা সময় বিশেষে তীর্থ বিশেষ দর্শনের বিশেষ ফলশ্রুতি বর্ণনা করিয়া প্রকারান্তরে মহা মহা মেলার সূত্রপাত করিয়া দিয়াছেন—লোকে পারত্রিক শুভ-কামনায় চতুর্দ্দিগ হইতে এককালে এক স্থানে সমবেত হয়, তাহাতেই বৃহৎ বৃহৎ মেলা হইয়া সমাজের ঐহিক মঙ্গলও সাধিত হইয়া উঠে।

আগমন করিয়াছি! সেই সময় একেবারে অঙ্গ বঙ্গ কলিঙ্গ সৌরাষ্ট্র মহারাষ্ট্র উৎকল দ্রাবিড় কাশী অযোধ্যা মথুরা বৃন্দাবন প্রভৃতি বিভিন্ন খণ্ডবাসী পণ্ডিত, যদি, ব্রহ্মচারী ও সন্ন্যাসীর বদন পরম্পরা বিনির্গত কত প্রকার স্তবপাঠ—কত প্রকার বেদধ্বনি—কত প্রকার ভক্তির উল্লাসবাক্য শ্রুতি গোচর হইতে থাকে তাহা নিতান্তই বর্ণনাতিরিক্ত—সে সমস্ত দর্শন শ্রবণে নাস্তিকের মনেও ভক্তির সঞ্চার না হইয়া যায় না।

শুনিয়াছি হরিদ্বারে মেলা এতদপেক্ষাও বৃহৎ—ইহা অপেক্ষাও অধিক সমারোহে সম্পন্ন হয়। ভারতবর্ষের প্রায় সকল প্রদেশেই এরূপ না হউক, মধ্যবিধ রূপ এবং সামান্য রূপ কত তীর্থ কত যে মেলা হইয়া থাকে, তাহার সংখ্যা করা যায় না। বারাণসী প্রভৃতি পুণ্য ভূমিতে মাসে মাসে—কথায় কথায় মেলার অনুষ্ঠান হইয়া থাকে।[১] কিন্তু সে সমস্ত মেলার প্রত্যেকটী এক এক ধর্ম্মাক্রান্ত এবং এক এক শ্রেণীস্থ লোকের নিজস্ব সম্পত্তি। তাহাতে সেই প্রকার লোকেই অনুরাগী। অপর যাহারা যায় তাহাদিগের ধনোপার্জ্জন ও কৌতুক দর্শন মাত্র অভিপ্রায় ও অধিকার। সেই সেই মেলা আড়ম্বর ও জনতায় অসামান্য ও উৎকৃষ্ট বটে, কিন্তু সুপ্রণালী ও সুব্যবস্থাতে অতি যৎসামান্য ও নিকৃষ্টবৎ বোধ হয়। তথায় বহুল প্রকার অসংখ্য লোকের সমাবেশ এবং বিবিধ পশ্বাদিও দ্রব্যজাতের সংগ্রহ হয় বটে, কিন্তু সকলি অব্যবস্থিত—সকলি গোলযোগ! তথায় এমন কোন সুযোগ্য অধ্যক্ষ, বিশারদ ব্যবস্থাপক এবং পারদর্শী পরিচারক নাই যে সেই পরম শুভদায়ক সমাবেশকে যথার্থই শুভদায়ক করিয়া তুলে। তথায় বিদ্যার প্রভুত্ব এবং মার্জ্জিত বুদ্ধির পরাক্রম কিছুই নাই। অনেকানেক বুধমণ্ডলী অধিষ্ঠিত হন বটে, কিন্তু তাঁহারা আপনাদিগের লৌকিক কল্যাণ সাধন ভিন্ন আর কিছুতেই হস্তক্ষেপ করেন না, অথবা কেই বা তাঁহাদিগকে নিয়োগ করে। সুতরাং সেখানে বিদ্যা বুদ্ধি অধ্যক্ষতা করিতে পাইলেন না, সেখানে সুবব্যস্থা ও সৎ ফলোৎপাদনের আশা করাও বৃথা!

অতএব হে স্বদেশহিতৈষি মহাশয়গণ! আমি বিনীত ভাবে জিজ্ঞাসা করি, আমাদের এমন একটী সমাবেশ ক্ষেত্রের অভাব হইতেছে কি না, যেখানে ঐ সকল দোষের প্রতিকার হইতে পারে? দেশের বর্ত্তমান অবস্থানুসারে এমন একটি সমাজ স্থাপনের আবশ্যকতা আছে কি না, যাহা আধুনিক সমুন্নত বিদ্যা বুদ্ধির সমাশ্রয়ে প্রতিষ্ঠিত হইয়া সমস্ত ভারত ভূমির মঙ্গল ভাণ্ডার স্বরূপ হইতে পারে?—বস্তুতঃ চতুর্দ্দিক্‌স্থ অসংখ্য প্রকার মেলার মধ্যে এমন একটি বিশেষ মেলার প্রয়োজন হইতেছে কি না, যাহা নির্ব্বিবাদে ভারতবর্ষস্থ সমস্ত শ্রেণীস্থ লোকের প্রীতিস্থল হইতে পারে—যেখানে ধর্ম্ম সংক্রান্ত মত ভেদ তিরোহিত হইয়া সকলেই সৌভ্রাত্র ও সৌহৃদ্য শৃঙ্খলে আবদ্ধ হইবেন—যেখানে

১। এই বঙ্গদেশেও হিন্দু যবন উভয় ধর্ম্মাক্রান্ত লোকের কত শত মেলা কত শত গ্রামে বৎসরে বৎসরে অনুষ্ঠিত হইতেছে। এক্ষণে প্রশ্ন উঠিতে পারে যে, অস্মদ্দেশে যখন এত প্রকারের এত মেলা বিদ্যমান আছে, তখন আবার অভিনব মেলার প্রয়োজন কি? পূর্ব্বাবধি যে সমস্ত মেলা রহিয়াছে, তত্তাবতের অধ্যক্ষগণ মেলার জন্য কিছুমাত্র ব্যয় করেন না, ব্যয় দূরে থাকুক বরং তাঁহাদের বিলক্ষণ আয় হয়। কিন্তু এই অভিনব মেলা যাহা এক্ষণে অনুষ্ঠিত হইতে চলিল, ইহাতে মেলাধ্যক্ষগণকে বিস্তর ব্যয় করিতে হয়, তথাপি তত লোকের জনতা হয় না। এ অবস্থায় তবে আর নূতন মেলার চেষ্টা পাওয়ার আবশ্যক কি? এই প্রশ্নের উত্তর এই যে, যে সকল মেলা আছে সে সমস্ত...

বৈষ্ণব, শাক্ত, শৈব, গাণপত্য, বুদ্ধ, জৈন, নাস্তিক, আস্তিক সকলেই আপনাপন মেলা ভাবিয়া নিঃসন্দিগ্ধ চিত্তে উৎসবের সমভাগী হইতে পারেন—যেখানে অন্যান্য মেলার অনুষ্ঠিত অথবা নব নব প্রকারে ক্রীড়া কৌতুক আমোদ আহ্লাদ বিদ্যা সাধ্য শিল্প সাহিত্য কৃষি ব্যায়াম ইত্যাদি অধিকতর সুশৃঙ্খলা ও সুনিয়মে প্রদর্শিত ও পুরস্কৃত হইতে পারে। যদি এমন মেলার অভাব থাকে—যদি এমন রুচিকর কোন একটী মহামেলার আবশ্যকতা প্রতিপাদিত হইয়া থাকে, তবে এই "চৈত্র মেলা" সেই অভাব দূরীকরণার্থে—সেই প্রয়োজন সাধনার্থেই প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ইহাতে অধিক আহ্লাদের বিষয় এই, ব্রিটিশ সাম্রাজ্য হওনাবধি এদেশে যত কিছু উত্তম বিষয়ের অনুষ্ঠান হইয়াছে, প্রায় রাজপুরুষগণ অথবা অপরাপর ইংরাজ মহাত্মারাই তাহার প্রথম উত্তেজক এবং প্রধান প্রবর্ত্তক। কিন্তু এই চৈত্রমেলা নিরবচ্ছিন্ন স্বজাতীয় অনুষ্ঠান, ইহাতে ইউরোপীয়দিগের নাম গন্ধ মাত্র নাই, এবং যে সকল দ্রব্য সামগ্রী প্রদর্শিত হইবে, তাহাও স্বদেশীয় ক্ষেত্র, স্বদেশীয় উদ্যান, স্বদেশীয় ভূগর্ভ, স্বদেশীয় শিল্প এবং স্বদেশীয় জনগণের হস্ত সম্ভূত। স্বজাতির উন্নতিসাধন, ঐক্য স্থাপন এবং স্বাবলম্বন অভ্যাসের চেষ্টা করাই এই সমাবেশের এক মাত্র পবিত্র উদ্দেশ্য। হিন্দুজাতি এই নামটী শুনিতে অতি প্রাচীন ও অতি উচ্চ। দুর্ভাগ্য ও কাল ধর্ম্ম বশতঃ সেই উচ্চ উচ্চ জাতি এখন অধোগতি প্রাপ্ত হইয়াছে। বহুদিনব্যাপী পরাধীনতা এবং অন্যান্য নানা কারণে হিন্দুজাতির মধ্যে অসংখ্য শ্রেণীভেদ, অসংখ্য মত ভেদ, সম্পূর্ণ আচার ভেদ সংঘটিত হইয়াছে। তাহাতেও বিশেষ হানি ছিলনা, কিন্তু স্বজাতীয় গৌরবেচ্ছা, সামাজিকতা এবং প্রকৃত সুখ-দুঃখানুভবশক্তি নিস্তেজ হওয়াতে কি নিদারুণ—কি শোচনীয় অবস্থা উপস্থিত হইয়াছে! যাহারা পূর্ব্বে এক পরিবারস্থ ব্যক্তিগণের ন্যায় সামাজিক কর্ত্তব্য বিষয়ে পরস্পরের স্নেহকারুণ্য গুণে সংবদ্ধ ছিল, তাহারা এখন বিভিন্ন দেশবাসী—দ্বীপ দ্বীপান্তরস্থ লোকের ন্যায় অপরিচিত ও শিথিল-সৌহার্দ্দ হইয়া গিয়াছে। সমাজের যতদুর বিশৃঙ্খল ঘটিবার তাহা ঘটিয়াছে। এই দুরবস্থা চাক্ষুষ করিয়া কোন চিন্তাশীল হিন্দু স্থির থাকিতে পারে? কোন সুশিক্ষিত স্বদেশবৎসল মন প্রতিবিধানে অগ্রসর না হইয়া স্বীয় ধর্ম্ম প্রবৃত্তির উত্তেজনা ও ধিক্কারে বধির থাকিতে পারে? যে সকল মহাশয়গণের এইরূপ উন্নত মন—যে সকল হিন্দু কুলোদ্ভব মহাত্মাগণ এইরূপ চিন্তাশীল, তাঁহারাই এই "চৈত্রমেলা" নামা হিন্দু সমাজ বন্ধনের অদ্বিতীয় উপায় উদ্ভাবন করিয়াছে।[১] তাঁহারা হিন্দুমাত্রেরি কৃতজ্ঞতাভাজন, তাঁহাদিগকে সদ্বিবেচনার উপর নির্ভর করিয়া তাঁহাদিগকে যাঁহার যাহা সাধ্য তদনুরূপ সাহায্য ও সহযোগিতা করা, হিন্দুমাত্রেরি অবশ্য কর্ত্তব্য। না করিলে যার পর নাই প্রত্যবায় ও ক্ষমার বহির্ভূত অপরাধ জন্মিবে, সন্দেহ নাই। তাঁহারা অতি সুবিবেচনা পূর্ব্বক অধ্যক্ষ সমাজকে ছয় ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। প্রতি বিভাগের উপর মেলাসম্বন্ধীয় স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র কার্য্যের ভার অর্পিত হইয়াছে।

১। তাঁহাদের মধ্যে সিমুলীয়া-বাসী গুণরাশি, নির্ম্মৎসর, অধ্যবসায়ী শ্রীযুক্ত বাবু নবগোপাল মিত্র মহাশয় সর্ব্বাগ্রগণ্য। সে সকল গুণদ্বারা বহুজনসাধ্য বৃহৎকাণ্ডের আবিষ্কর্ত্তা ও নিয়ন্তা হওয়া সম্ভব, তাঁহাতে সে সমস্ত গুণ সর্ব্বতোভাবে বিদ্যমান আছে। সেই মহদ্‌গুণাবলীর শৃঙ্খলে অন্যান্য স্বদেশ-হিতৈষী মহাশয়েরা আবদ্ধ রহিয়া কয়েকটী মধুমক্ষিকার ন্যায় অল্পে অল্পে ক্রমে ক্রমে স্বদেশের সৌভাগ্য মধুচক্র একখানি রচিত করিয়া তুলিয়াছেন। অতএব তাঁহারা...

অসম্বন্ধ হিন্দুসমাজ মধ্যে ঐক্য স্থাপন ও তাহাতে অনুরাগ উৎপাদন করিয়া দেওয়া এবং তাহার জীর্ণ সংস্কারের চেষ্টা করা প্রথম শ্রেণীর কার্য্য। তাহার বিশেষ তাৎপর্য্য পূর্ব্বক্ষণেই বলা গিয়াছে, সুতরাং পৌনরুক্তি নিষ্প্রয়োজন।

দ্বিতীয় শ্রেণীর কার্য্যও অতি গুরুতর; অর্থাৎ এক মেলার সময় হইতে অপর মেলার দিন পর্য্যন্ত সম্বৎসর মধ্যে হিন্দুসমাজের যে কিছু উন্নতি বা দুর্গতি হইয়াছে, বিশেষ পর্য্যবেক্ষণ ও অনুসন্ধান করিয়া মেলার দিবসে এই শ্রেণীর অধ্যক্ষগণ তাহা সর্ব্বসাধারণ সমক্ষে বিজ্ঞাপন করিবেন।

তৃতীয় শ্রেণীর অধ্যক্ষ মহাশয়েরা পবিত্র বিদ্যোৎসাহ কর্ম্মে নিয়োজিত হইয়াছেন। অর্থাৎ যে সমস্ত দেশস্থ মহাশয়েরা স্বজাতীয় ও স্বাবলম্বিত শিক্ষাদানে ব্রতী হইয়াছেন বা হইবেন, তাঁহাদিগকে সমুচিত উৎসাহ প্রদান করাই এই বিভাগের বিশেষ কার্য্য হইবেক।

চতুর্থ শ্রেণীর নাম "প্রদর্শন বিভাগ"। তাঁহারা মেলায় প্রদর্শিতব্য দ্রব্যজাত সমূহ সংগ্রহ করিবেন।

পঞ্চম, সঙ্গীত বিভাগ। যাহাতে মেলাস্থলে বিবিধ প্রকার সঙ্গীতজ্ঞ গুণীমণ্ডলীর গুণ প্রদর্শন ও সঙ্গীত সম্বন্ধ দেশে সুধারায় প্রবর্ত্ত না হয় এই শ্রেণীর তাহাই মুখ্য কর্ম্ম হইবেক।

ষষ্ঠ শ্রেণীস্থ অধ্যক্ষগণ মল্লযুদ্ধ প্রভৃতি শারীরিক বল কৌশল নিষ্পন্ন বিষয় প্রদর্শনে বিশেষ মনোযোগী হইবেন, এবং যথাসাধ্য পুরস্কারাদি দান পূর্ব্বক যাহাতে দেশমধ্যে ব্যায়াম শিক্ষার প্রারম্ভ হয়—যাহাতে "ভেতো বাঙ্গালী" আর "ভীরু বাঙ্গালী" বলিয়া অপর দেশের লোকেরা ঘৃণা ও বিদ্রূপ করিতে আর না পারে, তৎসাধন পক্ষে যত্নশীল হইবেন।

এই উৎকৃষ্ট শ্রেণী বিভাগ ও কর্ত্তব্য বিভাগ দেখিয়া কে না আমার সহিত তৎপ্রণেতা মহাশয়গণের প্রতি আন্তরিক বাধ্যতা স্বীকার ও অগণ্য ধন্যবাদ প্রদান করিবেন? কে না মুক্ত কণ্ঠে স্বীকার করিবেন, যে, এই অভিনব মেলার সংকল্প অতি পবিত্র, ইহার অভিপ্রায় অতি মহান্, ইহার উদ্দেশ্য অতি উচ্চ এবং ইহার আশা অতি সদাশা : সেই মঙ্গলাভিপ্রায়, সেই শুভ সংকল্প, সেই উচ্চ আশার কিয়দংশ সিদ্ধ করিয়া উঠিতে পারিলেও এই "চৈত্রমেলা" আমাদিগের পরম গৌরবের স্থল হইতে পারিবে। ইহার উৎকৃষ্ট ফলশ্রুতির কথা বাক্‌যন্ত্র অথবা লেখনী যন্ত্র দ্বারা কি ব্যক্ত করিব, ধ্যান করিয়া না দেখিলে তাহার প্রকৃত অবয়ব প্রত্যক্ষীভূত হইবার নহে। ইহা দ্বারা বিলুপ্ত প্রায় হিন্দু নামের পুনরুজ্জীবন এবং বিনষ্ট হিন্দু গৌরবের পুনরুত্থান হইতে পারিবেক। যবনদিগের নিদারুণ অধীনতারূপ লৌহ-নিগড়ে বহুকাল বদ্ধ থাকিয়া আমরা স্বচিন্তা ও স্বাবলম্বনকে হারাইয়াছি, ইহা দ্বারা তাহাদিগকেও পুনর্ব্বার প্রাপ্ত হইব। তাহাদিগকে পাইলে আপনাদিগের ভাল মন্দ আপনারা ভাবিতে এবং আপনাদিগের হিতানুষ্ঠান আপনারা করিতে পারিবেন। তখন আর অন্যের মুখাপেক্ষায় থাকিতে হইবে না—মুখের গ্রাস অন্যে আসিয়া তুলিয়া দিবে না—তুলিয়া দিয়া এমন স্তোতবাক্যেও ভুলাইতে পারিবে না, যে তোমাদিগকে অমৃত দিলাম; কিন্তু বাস্তবিক তাহা বিষ!

অতএব হে স্বদেশস্থ ভ্রাতৃগণ! হে জ্ঞান-বৃদ্ধ মান্যতম মহাশয়গণ! হে আর্য্যাবর্ত্তের আর্য্য ধর্ম্ম রক্ষক পূজ্যপাদ অধ্যাপক মণ্ডলি! হে সৎক্রিয়ান্বিত ধন-কুবের মহাশয়গণ! হে মহিমান্বিত ভূস্বামিবর্গ! হে কৃতবিদ্য নব্য সম্প্রদায়! আসুন আমাদের পরম হিতের জন্য, জননী জন্ম ভূমির

জন্য, সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ ও সর্ব্ব জ্যেষ্ঠ সংস্কৃত ভাষার জন্য, শারীরিক বলাধান জন্য, মনের ঔৎকর্ষ জন্য, শিল্পবিজ্ঞান জন্য, সুমধুর গান্ধর্ব্ব বিদ্যার জন্য, কৃষি-কার্য্যের কুশল জন্য দেশের মঙ্গলের জন্য, আসুন আমরা সকলে একত্র মিলিত হই! নিদেন সম্বৎসরে এক দিনের জন্যও মিলিত হই! এক দিনের মিলনে যদি শুভ হয়, তবে কেন আলস্য করি! এক দিনের মিলনে যদি অজ্ঞাত পূর্ব্ব অশ্রুত পূর্ব্ব অপূর্ব্ব সুখাস্বাদনে সমর্থ হই, তবে আর তিলার্দ্ধ ঔদাস্য করা নয়—তবে সকলেরি একাগ্র চিত্ত হওয়া আবশ্যক—তবে অন্যান্য সহস্র কর্ম্মকেও উপেক্ষা করা উচিত—তবে এই মঙ্গল তরুকে বদ্ধমূল ও বর্দ্ধনশীল করিতে যত্ন পাওয়া সকলেরই কর্ত্তব্য! আজ ইহাকে অতি ক্ষুদ্র দেখাইতেছে বলিয়া অনাদর করা নির্ব্বুদ্ধির কর্ম্ম, আপনাদিগের দ্বারা লালিত পালিত হইলে ইহাই তখন মহামহীরুহ হইয়া উঠিবে! যে শিল্পী, যে কৃষক, যে উদ্যান পালক, যে যন্ত্রী, য়ে গায়ক, যে পাইক, যে পলওয়ানকে আজ অনুরোধ করিয়া ডাকিয়া আনিতে হইল, এবং যে সকল দ্রব্য সামগ্রী লোকের বাটী বাটী গিয়া সংগ্রহ করিয়া আনিতে হইল; যখন দেখিবেন সেই সকল লোক ও সেই সমূহ দ্রব্য সম্ভার আপনা হইতেই আসিতেছে—যখন দেখিবেন ঢাকা ও শান্তিপুরের তন্তুবায়গণ, কাশী ও কাশ্মীরের কারুগণ, জয়পুর ও লক্ষ্ণৌয়ের ভাস্করগণ, চণ্ডালগড় ও কুমারটুলির কুমারগণ, পাটনার কৃষকগণ, অথবা সংক্ষেপে বলিতে গেলে উত্তর ও দক্ষিণের—পূর্ব্ব ও পশ্চিমের সমব্যবসায়ী, সমশিল্পী এবং সমবিদ্য গুণীগণ এই চৈত্রমেলার রঙ্গ-ভূমিতে আপনা হইতে আসিয়া পরস্পর প্রতিযোগিতা-যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছে—যখন দেখিবেন তাহারা এই মেলার প্রদত্ত প্রতিষ্ঠা ও পুরস্কারকে অমূল্য ও অতুল্য গৌরবান্বিত জ্ঞান করিতেছে—যখন দেখিবেন এই মেলাকে স্বজাতীয় গৌরব-ভূমি বলিয়া সকলের প্রত্যয় জন্মিয়াছে, তখনই জানিবেন এই নব-রোপিত বৃক্ষের ফল লাভ হইল! সেই শুভকাল আসা পর্য্যন্ত অবিশ্রান্ত পরিশ্রম করিতে হইবেক—ধৈর্য্য ধারণ পূর্ব্বক সেই শুভ দিনের প্রতীক্ষা করিতে হইবেক। এক দিনে কিছুই হয় না। প্রকৃতির নিয়মানুসারে বৃহদ্ব্যাপার মাত্রেই অল্পে অল্পে ক্রমে ক্রমে পরিবর্দ্ধিত হইয়া থাকে। সেই অখণ্ডনীয় নিয়মানুসারে ইহারও বয়োবৃদ্ধি সহকারে শ্রীবৃদ্ধি হইবে। সেই শ্রীবৃদ্ধি আপনাদিগের উপরেই নির্ভর করিতেছে। আপনারা স্বীয় স্বীয় কর্ত্তব্য ভার উপযুক্ত রূপে বহন করিতে পারিলেই এই ক্ষুদ্র মেলা জগতের একটী মহামেলা নাম পাইতে পারে। তখন ইহার গুণ গরিমা শ্রবণে লোকে বিস্ময় জনক গ্রীক মেলাকে বিস্মৃত হইতে পারে। অতএব পুনশ্চ বলি, আসুন, আমরা মিলিত হই। জননী জন্মভূমি অধিকতর আপনাদের আদেশ করিতেছেন, তাঁহার দুঃখ বিমোচনে অগ্রসর হউন! তাঁহার প্রথমাবস্থার কীর্ত্তিকুশল সন্তানগণের বিয়োগ দুঃখে তিনি জর্জ্জরিত হইয়া আছেন। অন্ততঃ আপনারা এখন সেই দুঃখানলে কথঞ্চিৎ সান্ত্বনা জল অর্পণ করুন! যে হিন্দুর মনে কণামাত্রও দয়াবৃত্তির সঞ্চার আছে, তিনি কখন নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিবেন না। পূর্ব্বে স্বদেশ-বাৎসল্য ধর্ম্ম হিন্দুজাতির প্রাণাধিক প্রিয় পদার্থ ছিল, এখন দুর্ভাগ্যক্রমে অনৈক্য দুর্গের অজ্ঞানতার অন্ধকূপে অবরুদ্ধ আছে, তাহার সেই বন্ধন দশা বিমুক্ত করিতে চেষ্টা করুন! চেষ্টা করিলে কখনই ব্যর্থ হইবে না।

"সাধিলেই সিদ্ধ" ইটী প্রসিদ্ধ প্রাচীন বাক্য। যিনি আত্ম সাহায্য করেন, তিনি দৈবানুগ্রহের পাত্র। যিনি আত্ম কর্ত্তব্য বিস্মৃত, ঈশ্বরও তাঁহাকে বিস্মৃত হন। আমাদিগের ঐকান্তিক যত্ন, অকপট

অনুরাগ, সমুচিত উৎসাহ, এবং অবিচলিত অধ্যবসায় দেখিলে সেই দয়ার সাগর সর্ব্বমঙ্গলাকর জগদীশ্বর অবশ্যই অনুকূল হইবেন। এই মহদনুষ্ঠান দ্বারা আমরা যে যে অমৃত-ফল লাভের আশা করিতেছি, তাহা অতি দুঃসাধ্য ও দুরূহ হইলেও ঈশ্বরানুকম্পায় সাধ্য ও সহজ হইবে, সন্দেহ কি? সেই ভগবদেচ্ছায় পর্ব্বত রেণু হইতেছে, রেণুকণাও পর্ব্বত হইয়া উঠিতেছে। এই মহা নীতি সর্ব্বদা হৃদয়ে জাগরূক রাখিয়া, আসুন আমরা তাঁহার প্রতি কায়মনোবাক্যে নির্ভর করিয়া তাঁহার পবিত্র নামোচ্চারণ পূর্ব্বক এই শুভ কার্য্যে প্রবৃত্ত হই। এরূপে প্রবৃত্ত হইলেই সুমধুর দুন্দুভি নিনাদের সহিত সেই মহোচ্চ স্থান হইতে এই প্রবোধ বাক্য শুনিতে পাইবেন, যে,

"স্বস্তি স্বস্তি স্বস্তি।"

সংস্কৃত কবিতা

চৈত্র সংসদ্বর্ণিকা

সারদা শারদাম্ভোদবর্ণা বর্ণাত্মিকা স্তু নঃ।
বদনে বদনেনেন্দুতুল্যাঽতুল্যা গুণেঃ সদা॥১॥

গাম্ভীর্য্যেণ যুতা সদাশয়বতী মাধুর্য্য ভাবানিতো
শুদ্ধ্যা দুগ্ধনিভা বিদগ্ধ-হৃদয়ানন্দপ্রদা সদ্রসা।
কালুষ্যেণ বিবর্জিতা দ্বিজবরৈঃ সংবেতিতা বক্রগা বাণী
শারদবাহিণীর জয়তাৎ শশ্বৎ কবীনাং ভুবি॥২॥

নানালঙ্কৃতিশালিনী গুণগণগ্রামৈক বাস্তব্যভূরৌ
দার্য্যাদিযুতা সতাং বশকরী ভাবপ্রকর্ষানিতা।
চাতুর্য্যেণ সুসঙ্গতা রসবতী হৃৎস্থানবিদ্যোতিণী
লোকে কোমলকামিনীব কবিতা মোদায় বিদ্যোততে॥৩॥

আত্মভাবপরকীয় বোধনে হেতবো বিবিধরূপমাগতাঃ।
ঈশ্বরেণ জগতাং হিতৈষিণা সাধু বর্ণনিচয়া বিতেনিরে॥৪॥
তৈরেব বর্ণৈর্নিখিলানি শাস্ত্রাণ্যনুশ্রিতানীহ সহস্রশোঽপি।
সংলাপনণঞ্চ ব্যবহার-মার্গাস্তৈরেব বর্ণৈর্নিযতা জনেষু॥৫॥

শাস্ত্রেষু লোকে বিবিধঃ প্রকারো বিদ্বত্ত মৈঃ কল্পিতভূরিভাবঃ।
আলস্যদোষাদিহ লোপমাপ ক্বচিচ্চ কস্যাপি সুবিস্তরোঽস্তি॥৬॥

অধ্যাত্মদর্শনমথেহ পদার্থবিদ্যা জ্যোতির্গতিস্থিতি বিবোধনমঙ্গবিদ্যা।
কালপ্রমাণমথ গীতি-বিধান-শাস্ত্রং হস্ত্যশ্ব শিক্ষণ বিধানমনঙ্গবিদ্যা ॥৭ ॥

যন্ত্রাদিলক্ষণপরাণি তথেন্দ্রজাল-জ্ঞানৈকসাধনমথো পশুলক্ষণঞ্চ।
কাব্যানি নাটকযুতানি তথেতিবৃত্তং বাণিজ্যকর্ষণবিধায়ক শাস্ত্রজাতম্ ॥৮ ॥

উদ্ভিদ্য শাস্ত্রমথবাস্তু রসায়নাদি সঙ্গামকৌশল চিকিৎসন শিল্পবিদ্যাঃ।
নীতিঃ কলাঙ্কগণিতানিচ ভূরিভেদান্যন্যানি লোকবিদিতানি বভুবুরাদৌ ॥৯ ॥

আসীদসীম গুণধামনি বিক্রমার্কে ভূপেঽত্র ভূমিবলয়ে হখিল শাস্ত্র চর্চ্চা। স্বর্গং গতেহ এ নৃপতৌ কৃশতামবাপ্তা দেশান্তরং গতবতী শরণার্থিনীব ॥১০ ॥

ভ্রামং ভ্রামমনেক দেশনিবহং শান্তিং ন লব্ধা ক্যচিৎ শ্রান্তা খেদব-শান্নিতান্তবিমনা বৈরাগ্যমালম্ব্য সা। শেষে নির্বৃতি-লিপ্সয়াজলনিধেঃ পারং গতা সজ্জনৈস্তত্রত্যৈস্তু সমাদৃতা চিরদিনং তত্রৈব মোদান্বিতা ॥১১ ॥

সাত্রত্যালোকনিবহেষু চিরং রতাপি সম্মাননাবিরহমেত্য ভৃশং বিরক্তা। লোকালসত্ববশতো নৃপতেরনস্থা দোষেণ চ ক্রমবশাদিহ লোপমাপ ॥১২ ॥

ইংলণ্ডভূপতিবরৈরনুমান্য যত্নাদ্দেশান্তরাৎ পুনরিহাদ্য সমাহৃতেয়ম্। সম্মাননাদিভিরসাবনুমোদিতা চেদস্মদ্বিরাগমপহায়রতা পুনঃস্যাৎ ॥১৩ ॥

লুপ্তপ্রায়েষু শাস্ত্রেষু পুনস্তেযাং চিচীষয়া। ইংলণ্ডীয়ৈনৃপলরৈঃ প্রোৎসাহঃ ক্রিয়তে নৃণাম ॥১৪ ॥

বিদ্যা বুদ্ধিবিবর্দ্ধনায় যদি নো যত্নান্বিতো ভূমিপা লোকানাং হিতসাধনায়চ তথা প্রোৎসাহযেযুর্নবা। প্রোৎসাহেন বিবর্জিতা বততদা বিদ্যা-বিরক্তা জনাস্তস্মাৎ সর্ব্বসমুন্নতেরনুগুণো রাজপ্রয়াসো ধ্রুবম্ ॥১৫ ॥

নৃপবররৈনুমোদিত সৎপথে যদিজনাঃ সুরতাঃ সুখিনস্তদা
অথ বিরোধি পথং সমনুশ্রিতাঃ সততমেব পরং পরিতাপিনঃ ॥১৬ ॥

মেঘা ইবাপঃ সদ্বিদ্যাঃ সমাহৃত্যান্য দেশতঃ। বর্ষান্তি ভারতেবর্ষে ভূপা লোকবিবৃদ্ধয়ে ॥১৭ ॥

তেনানুরঞ্জিতা ভূপে সততং ভক্তিশালিনঃ। মোদন্তে সজ্জনাস্তস্য শুভাশংসনতৎপরাঃ ॥১৮ ॥

অখণ্ডভূগুলমণ্ডনায়িতৈ র্গৌরিস্তকৈ র্লণ্ডনতঃ সমাগতৈঃ। সামাজিকৈ র্বিজ্ঞবরৈঃ সভাজিতৈঃ সভাজিতৈবাদ্য সমস্তভূভূতাম্ ॥১৯ ॥

তৈ রাজবর্যৈ রণুমোদিতা বয়ং বিদ্যাবিবৃদ্ধ্যৈ সততং যতামহে। যত্নস্য সাফল্যবিরোধনস্তু ক্রিয়াসু নৈপুণ্য নিদর্শনেন ॥২০ ॥

দৃষ্টে কৌশলতৎপরে নরবরে লোক স্তথৈবাত্মনো নৈপুণ্যাদিবিধিৎসয়া সুভৃশয়া শশ্বদ্ভবত্যুৎসুকাঃ। তেনেযং প্রতিবর্ষমত্র পরমা চৈত্রে সমাপ্তে সতা বিদ্বদ্ভির্বিহিতা স্বদেশকুশলাকাঙ্ক্ষান্বিতৈর্মানবৈঃ ॥২১ ॥

চৈত্রান্তে মৈত্রবৃন্দে র্ব্বিরচিত মিলনৈ রেকদেশে সুরম্যা দেশস্যা-স্যোন্নতীনামুপজননমভিপ্রেত্য সংসৎ কৃতেয়ম্। এতন্নীবৃজ্জনানাং বিবিধ-গুণচয়ে যত্নবত্ত্বং যথা স্যান্নানাশাস্ত্রাদি শিক্ষাবিবিধজনগণাচার দৃষ্টেশ্চ তোষঃ ॥২২॥

অশেষগুণ গুম্ফিতা সুমনসাং গণৈর্ভূষিতা বুধালিপরিষেবিতা সুরভিরদ্য বিদ্যোততে। বসন্তসমরোদ্ভবা স্রগিব সংসদেষা চিরং সতাং হৃশ্বদয়বাসিনী সতত মোদসন্ধায়িনী॥২৩॥

কার্য্যস্য বৈচিত্র্য বিলোকনেন বিধাতরীশেহস্তি যথানুরাগঃ। প্রোৎসাহকে ভূপবরে গুণানাং বিলোকনেনৈব তথাস্ত্ত রাগঃ॥২৪॥

নানাবিদ্যাসুনৈপুণ্যং পুণ্যসঞ্চয় সঞ্চিতম্। সাম্রাজ্য সুখ-সন্তান-প্রখ্যং মানসরঞ্জনম্॥২৫॥

সর্ব্বে স্বার্থপরায়ণা ভুরি নরা দৃশ্যন্ত এবাধুনা কেচিৎ স্বানুগতোপকর-করণাৎ লোকে মহত্ত্বং গতাঃ। যে দেশস্য হিতায় সন্তত সদুদ্যোগং সদা তন্বতে সর্ব্বেষামুপকারিণশ্চ মনুজা স্তে কেঽপি লোকোত্তরাঃ॥২৬॥

এতৎপ্রচারণ বিধৌ সততং রতা যে তে মানবা ভুবি পরং সুখিনঃ সদা স্যুঃ। আশাস্মহে চিরদিনং জগদীশ এষা-মাকাঙ্ক্ষিতার্থ পরিপূরণ-কৃত্তথাস্ত্ত॥২৭॥

চৈত্রসংসদ্বর্ণিকেয়ং শ্রীতারানাথ শর্ম্মণা
তারাশঙ্খে র্ব্বিরচিতা শ্লোকৈ রস্ত সতাং মুদে॥

কল্পান্তোত্থশ্বসনতরলোল্লোলমালাকরালে নাব্যারোপ্য প্রলয়জলধৌ সর্ব্ববীজৌষধীভিঃ। যোপাদ্বেদান্ ভুবনহিতকৃৎ শ্রাদ্ধদেবঞ্চ দেবঃ সানুক্রোশো দিশতু মহতাং মঙ্গলং মৎস্য মূর্ত্তিঃ।

ক্ষীরাম্ভোধৌ মথিগিরিবরে মজ্জতি প্রাজ্যভারে ভূরিশ্রান্তান হতপরিকরান্ বীক্ষ্য দেবাসুরাদীন্। বিভ্রৎ কৌর্ম্মং বপুরতিবৃহদেয়াদধত্তং গিরীন্দ্রং পৃষ্ঠে শ্বাসপ্রবলপবনো দ্বেল্লিতাব্ধিঃ স পায়াৎ।

প্রণয়ধলধিপাতোৎ ক্ষিপ্তবার্ব্বারিবিন্দু স্তিমিতপটশরীরৈর্ঘোজনো লোকসংস্থৈ তত উদহরদুর্ব্বীং দন্তলগ্নাং নিমগ্নাং হতবলবদরাতিঃ পাও স স্তব্ধ রোমাঃ॥ প্রখরতরনখাগ্রোৎখাতদৈত্যেন্দ্রবক্ষস্থল-বিগলদদভ্রাস্রান্তলোলায়িতাঙ্গঃ। অশনিচপলজিহ্বোব্যাত্তবক্ত্রোতিভীষ্মাদ্রুতকনকনিভাক্ষঃ পাতু লোকান্নৃসিংহঃ।

অথখলূৎক্ষিপ্ত ভগবৎ পাদাঙ্গুষ্ঠ প্রখর নখর নির্ভিন্নাণ্ডকটাহন্নিঃস্যন্দমান নিদান নীরকিরেণাতিবলন্তী বিষ্ণোঃ পদাদতিরয়েণ সুমেরুশিখরাদিকমাপ্লাব্য মহোন্নতমহিকাচলাতিদূরতর দরীবিদারণেন ভুবা বতীর্য্য স্বশরীরভস্মাপ্লাবনেন কপিলকোপানল পরিদগ্ধসগরসন্ততীঃ সন্তার্য্য সহসাগরেণ সুরধুনী সমগংস্ত॥

প্রত্যাদিৎসুঃ প্রদাতৃং হৃতমসুরগণৈ রাজ্য মৃদ্ধং মঘোণে ভূত্বা খর্ব্বো বলিং স্মচ্ছলযতিদিতিজংয়ঃ সপায়াদুপেন্দ্রঃ। যস্যো দণ্ডং পদাব্জ প্রখর নখশিখাভিন্ন বিধ্যগুরন্ধ্রাদশ্রান্তং কারণাম্ভঃ প্রসরতি বিমলং গঙ্গয়া সঙ্গমেত্য।

সপ্তাকূপারাকাঞ্চী ধরধরণি বধূধৌত কৌষেয়কীর্ত্তি র্জ্বালামালাবলীচাম্বরতলপবনোদ্ধুতদাবপ্রতাপঃ। নম্রক্ষৌণীশমৌলিস্ফুরদমলমণিদ্যোতিবিদ্যোতিতারির্ধর্ম্মিষ্ঠানাং বরিষ্ঠঃ ক্ষিতিপতিরভবৎ

পাণ্ডু পুত্রোমহাত্মা। সম্বর্ত্তোদীর্ণবাতক্ষুভিতজলনিধির্ধানগম্ভীরঘোষোদঞ্চদগাম্ভীবচাপচ্যুত-নিশিতশরব্রাতবিদ্রাবিতারিঃ। যুদ্ধেযেনাভ্যতোষি ত্রিভুবনজয়িনা ব্যাধরূপী গিরীশঃ কৃষ্ণঃ শ্রীকৃষ্ণ সূতো মলমতিরভবৎ পাণ্ডুপুত্রঃ প্রতাপী॥

শ্রীমতা রামতারণ শিরোমণিনা পঠিতং।

পূর্ব্বং যে জনকাদয়ো নৃপবরাজাতাস্তদানীং নরাঃ সর্ব্বে ধর্ম্মপরায়ণাঃ পরসুখস্যান্বেষকাস্তে সদা রাজানোপি নচৈহিকেম্বভিমতাবিদ্যোন্নতিস্তৎপরা সর্ব্বং বিক্রমভূপতৌ পরগতে শাস্ত্রঞ্চ ণাকং গতা॥১॥ প্রাপ্তে বিক্রমনন্দনে নৃপপদং শাস্ত্রস্য নিন্দান্বিতা যজ্ঞদ্যাবিফলাপরে কিমপিনোকর্ত্তাপিনোকশ্চন। ইত্যেবং মতিমন্তু এবচনরাভাজেন রাজ্ঞাতদা শাস্ত্রাণাং বহুশো বুধৈরতি শয়াদ্মত্মাৎকৃতঃ সংগ্রহঃ॥২॥ তৎপশ্চাদপিবেদ মুখ্যসকলং দিল্লীশনষ্টীকৃতং শাস্ত্রং তেন বিবাদ এব বহুধা শাস্ত্রস্য জাতোধুনা। ব্যাসোক্তেযুততঃ পুরাণনিচয়েস্বেকার্থতানেক্ষতেশাস্ত্রাণামধুনা সমুন্নতিরিয়ং রাজ্ঞাং সুজাতাযথা।।৩।। নষ্টীভূতং যদবধি কিয়ৎ শাস্ত্র মুর্ব্বীশ্বরেন্দ্রাত্তাবদ্বিদ্যাধনিনিনগতা গর্ব্বমেক্ষ্যেব্যা। বিদ্যাবাসোভবতিহতদায় ত্রলক্ষ্যান দৃষ্টি লক্ষ্মী যুক্তং জন মুপগতং তজহাবন্যগাচ॥৪॥ দেশে রাজ্ঞা মহত্যা বহুতর সুজনাভ্যর্থিতা সংস্থিতা সাবিদ্যাতাং দ্রষ্টু কামোভরত নরবম্ব্রেজ্যে রাজ্যেশ্বরস্থ ধর্ম্মস্তত্রৈ বয়াতেস্তমপিচ পুনর্দ্দ্রষ্টু কামাতি গর্ব্বা যাতাতত্রৈব সংস্থাপরিহৃতরি পুতা পূর্ব্বরাজ্যেশলক্ষ্মীঃ॥৫॥ বিদ্যানুগাং স্থিরতরাং সুসমীক্ষ্য লক্ষ্মীং বিদ্মাপুনর্নৃপবরস্য বিহায় বশং। অন্যেষ বস্থিতবতী মনুগাঞ্চ লক্ষ্মীং রাজ্ঞীবিধায় মহতী পরতৃপ্তিমাপ্তা॥৬॥ নৈশ্বর্য্যং নাপিসৌয্যং নচজন বরতায়াং বিনা সাল্য-দেশং জাতাতত্রা দৃতাসীদ্যদি সুকৃতিবশাদাগতাশঙ্কিতাচ। তদ্রক্ষায়াং প্রযত্নেমতি রিহকৃতিভির্দ্দীয়তাং প্রার্থয়েহং নোচে দ্গোপাল এতদনু মিত শুভবাক পালকত্বাদিভঙ্গ॥৭॥

শ্রীমতা ভবশঙ্কর বিদ্যারত্নেন পঠিতং।

এই সমস্ত কবিতা পাঠের পর সঙ্গীত আরম্ভ হইল

রাগিণী সিন্দুড়া—তাল ধামাল।

উঠ উঠ সকলে হে ভারত সন্তান।
স্বদেশের হিত তরে কর প্রাণ পণ॥
দেখ ভেবে জগতের সব জাতি,
সাধিতে দেশ উন্নতি করিছে যতন॥

ভারত ভূমির দশা, ঘোর অন্ধকার নিশা,
উৎসাহ অনল তায় করহে জ্বলন॥

আপন কাজের তরে, আশ্রয় দেবে না পরে,
নিজ যতনতে তাহা করহে সাধন ॥২ ॥

রাগিণী বাহার—তাল জৎ।

লজ্জায় ভারত যশ গাইব কি করে।
লুটিতেছে পরে এই রত্নের আকরে॥
সাধিলে রতন পাই, তাহাতে যতন নাই।
হারাই আমোদে মাতি অবহেলা করে॥
দেশান্তর জনগণ, ভুঞ্জে ভারতের ধন,
এ দেশের ধন হায় বিদেশীর তরে॥
আমরা সকলে হেথা, হেলা করি নিজ মাতা,
মায়ের কোলের ধন নিয়ে যায় পরে॥

রাগিণী সিন্ধু ভৈরবী—তাল একতালা।

এ দেশের দুঃখে কার না সরে চোখের জল।
নিদ্রায় নিঝুম তবু আমরা সকল॥
উঠ জাগ সকলেতে, সজীব কর ভারতে।
ভাই ভাই মিলে সবে হও এক দল॥
ভাই ভাই ঠাঁই ঠাঁই, কত কাল রবে ভাই।
বিনা মিল কোন কাজ হয় কি সফল॥

রাগিণী পরজ—তাল একতালা।

ছাড় হে অসার অলস, প্রস্তুত হও লভিতে যশ।
সাধন কর ভারতের, উন্নতি জনমাঝে॥
নিরখি দেখ কাল বিকল, পূর্ব্ব বিভব সকল বিফল।
অঙ্গ ভঙ্গ জন্ম-ভুমি, নতশির হয় লাজে॥
যাহে দুখ ভার যায়, ঐক্যতায় সে উপায়।
ত্যজ ত্যজ ঔদাস্য ভাব, রত হও নিজ কায়ে॥
মিলনে হয় হীন সবল, মিলিলে অতি লঘু তৃণ দল।
পায় লৌহ শৃঙ্খল বল, বান্ধে গজ রাজে?

পূর্ব্ব বৎসর অপেক্ষা এবার চৈত্র মেলায় অধিকতর সমারোহ হয়। উদ্যান প্রবেশ দ্বারে নহবৎ বসিয়াছিল তথা হইতে মেলার স্থান প্রায় ২৫ বিঘা দূর হইবে। এ পর্য্যন্ত রাস্তার উভয় পার্শ্বে নব পল্লবাবৃত অর্দ্ধচন্দ্রাকার বেড়া দেওয়া হয়; উদ্যানের স্থানে স্থানে এই কএকটি কবিতা সন্নিবেশিত হইয়াছিল।

মানিলাম বঙ্গবাসি, বুদ্ধিতে চতুর।
সকল বিষয়ে তাহা নহেত প্রচুর॥
করহে বিজ্ঞান চর্চ্চা; জ্ঞানের নয়ন।
খুলিবে; হৃদয়দ্বার হবে উদ্ঘাটন॥
কারু কর্ম্মে নানা জাতি কিবা শোভা পায়।
সে বিষয়ে অজ্ঞ বলে মরি যে লজ্জায়॥
চেষ্টার অসাধ্য, কার্য্য কি আছে এমন।
শিখিব শিখিব তাহা করিলে যতন॥
পরিহর দ্বেষ ভাব ধর হে বিনয়।
পরস্পরে পরস্পরে হও হে সদয়॥
একতা বিহনে কভু হবে না মঙ্গল।
ফলিবে বিরোধ বৃক্ষে বিষময় ফল॥
দুর্ব্বল বাঙ্গালি মোরা ঘৃণিত সবার।
না জানি কিরূপে দিব প্রতিশোধ তার॥
ঈশ্বর যদ্যপি দিন দেখান কখন।
হইবে হইবে বঙ্গ ভারত ভূষণ॥

মেলা স্থলে একটি দীর্ঘ হোগলার চালা প্রস্তুত হইয়াছিল। এই চালার মধ্যে এতদ্দেশীয় স্ত্রীলোকগণের সূচীনির্ম্মিত শিল্পজপদার্থসকল প্রদর্শিত হয়। ঐ স্থানে নানা প্রকার আসন, জুতা, থলিয়া, সরপোস প্রভৃতি রমণীয় পদার্থ সকল সজ্জিত ছিল। ঐ সমুদায়ের মধ্যে স্ত্রীলোকের কৃত কতকগুলি কাজ অতি চমৎকার ছিল। এই চালার পূর্ব্ব দিকের চালায় কতকগুলি অলঙ্কার ও হস্তিদন্তের পুত্তলিকা প্রদর্শিত হয়। উক্ত চালার সম্মুখেই আর এক চালা ছিল। ইহার মধ্যে আলিপুরের জেলের কয়েদিদিগের কৃত কতকগুলি উৎকৃষ্ট তোয়ালে, ঝাড়ন প্রভৃতি প্রদর্শিত হয়। এগুলি দেখিতে যেমন সুন্দর তেমনি শক্ত। এই চালার পূর্ব্বদিকে আর এক চালায় কতকগুলি ফল ও শাক প্রদর্শিত হয়।

বৈঠকখানা বাটীটি পূর্ব্বোক্ত চালা সকলের মধ্যস্থলে অবস্থিত। গৃহপ্রবেশের দ্বারে এতদ্দেশীয় শিল্পীগণকর্ত্তৃক পারিস-কর্দ্দমে নির্ম্মিত অভিষেক-বেশধারিণী ইংলণ্ডেশ্বরীর প্রতিমূর্ত্তি সন্নিহিত ছিল। এই প্রতিমূর্ত্তির পার্শ্বে নবদ্বীপের কুমারদিগের দ্বারা নির্ম্মিত কতকগুলি উত্তম পুত্তলিকা প্রদর্শিত হয়। প্রত্যেকের অঙ্গ সৌষ্ঠব এবং যেখানকার যে শিরা ও যে উচ্চতা জীব শরীরে বিদ্যমান থাকে

তাহা ঐ পুত্তলিকাগুলিতে লক্ষিত হইয়াছিল। প্রাচীন কালের গ্রীক প্রতিমূর্ত্তিগুলিকে আদর্শ করিয়া ঐ সমুদায় নির্ম্মিত হয়। আর এক গৃহে এদেশীয় শিল্পিগণের কৃত কতকগুলি চিত্র ছিল। জয়পুরের প্রতিকৃতি; আলেকজাণ্ডারের সহিত ডেরায়সের পরিবারগণের সাক্ষাৎকার ও আয়ান ঘোষকে দর্শন করিয়া কৃষ্ণের কালীমূর্ত্তি ধারণ; এই পটগুলি এবং কলিকাতার শিল্পবিদ্যালয়ের কতকগুলি ছাত্র প্রকৃতিকে আদর্শ করিয়া যে কতকগুলি চিত্র করিয়াছেন, এস্থলে তাহাও সংগৃহীত হইয়াছিল। আর এক গৃহে পুরাণসংক্রান্ত কথকতা হইয়াছিল। ঐ বৈঠকখানার সম্মুখের গৃহে অধ্যাপকদিগের শাস্ত্রীয় আলাপাদি হয়। পূর্ব্বদিকের গৃহে কতকগুলি সব আসিষ্টান্ট সর্জ্জন অনেক পরিশ্রম স্বীকার করিয়া রসায়নবিদ্যাসংক্রান্ত বিষয় সকল প্রদর্শন করেন।

বৈঠকখানার দক্ষিণ-পূর্ব্ব, দক্ষিণ-পশ্চিম ও উত্তর-পশ্চিমে তিনটি বাটী আছে। এই তিনটি বাটীতে ঝামাপুকুর, জোড়াসাঁকো ও শ্যামপুকুরের শকের সমবেত বাদ্য বাদিত হইয়াছিল। মেলার এদেশীয় মল্লদিগের কৌশল প্রদর্শিত হয়। এই মল্লেরা যে সকল কৌশল প্রদর্শন করে, তাহা ভারতবর্ষীয়দিগেরই সৃষ্ট; এই নিমিত্ত আমরা অন্য কাহারও নিকটে ঋণী নহি। প্রথমতঃ লাঠি খেলা; পরে লাঠিতে ভর দিয়া লম্ফ দিয়া পতিত হওয়া; তৎপরে লাঠি খেলা; পরে লাঠিতে ভর দিয়া লম্ফ দিয়া পতিত হওয়া; তৎপরে কুস্তি করা হয়। দর্শকগণ বিশেষতঃ ইউরোপীয়গণ ঢেঁকি ঘুরান দেখিয়া আশ্চর্য্য বোধ করিয়াছিলেন। এক স্কন্ধ হইতে অন্য স্কন্ধে ঢেঁকি লইয়া তাহা ক্রমাগত ঘূর্ণিত করা হয়। কিন্তু পশ্চাল্লিখিত কয়েকটি কৌশলদর্শনে সকলে অধিকতর তৃপ্তিলাভ করেন। একজন মল্ল এক ঢেঁকিতে বস্ত্র বাঁধিয়া তাহা দন্ত দ্বারা ধারণ পূর্ব্বক মস্তক ঘুরাইয়া পশ্চাতে নিক্ষেপ করে। আর একজন শয়ন করিলে প্রথমতঃ তাহার বক্ষে এবং তাহার পৃষ্ঠের উপর চারিখানি ইঁট রাখা হয়। একজন মল্ল এক ঢেঁকির মোনা লইয়া এক আঘাতে ইটগুলি চূর্ণ করে। আর একজন শবের ন্যায় স্পন্দহীন হইয়া শয়ন করিলে তাহাকে মৃত্তিকার মধ্যে প্রায় দুই মিনিট পর্য্যন্ত সমাহিত রাখা হইয়াছিল।

ইউরোপীয় প্রণালী অনুসারে কতকগুলি যুবক ব্যায়াম প্রদর্শন করেন। তন্মধ্যে একজন এই ব্যায়াম উদ্দেশে একটি কবিতা পাঠ করেন। তাহার সার অংশ নিম্নে উদ্ধৃত করা গেল।

বিদ্যা শিক্ষা সঙ্গে সঙ্গে শিখিলে ব্যায়াম।
সুস্থ চিত্তে সুস্থ দেহে, পাইবে আরাম॥
কেন বঙ্গবাসীগণ এমন দুর্ব্বল
নীচেদের কায় শ্রম, তাই এমন॥
অন্য সব জাতি শ্রমে, সদাই আদরে॥
তাই তারা নানা মতে সুখ ভোগ করে॥

পরে একজন যুবক অশ্বারোহণ পূর্ব্বক বেড়া লঙ্ঘন করিয়া যশোলাভ করিয়াছিলেন। তৎপরে নৌকায় বাচ খেলা হয়; পরিশেষে বেলা ৬টার সময় মেলা ভঙ্গ হয়।

১৭৮৯ শকের চৈত্রমেলার সাহায্যকারিদিগের নাম

শ্রীযুক্ত রাজা কমলকৃষ্ণ বাহাদুর	...	২৫
” তিনকড়ি দাস	...	২
” ভোলানাথ দত্ত	...	২
” দেবনারায়ণ বসাক	...	২
” কালীপ্রসন্ন ঘোষ	...	৫০
” জীবনকৃষ্ণ ঘোষ	...	৪
” দুর্গাচরণ লাহা	...	২৫
” ব্রজলাল চক্রবর্ত্তী	...	১
” নীলকমল বন্দ্যোপাধ্যায়	...	১০
” নন্দলাল মৈত্র	...	১
” গিরিশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	...	৫
” ভোলানাথ পাল	...	১
” বেণীমাধব বসু	...	১০
” নীলমণি চট্টোপাধ্যায়	...	১
” রাজেন্দ্র মল্লিক (রায় বাহাদুর)	...	৫০
” তারাচরণ গুহ	...	২৫
” বিহারীলাল ভট্টাচার্য্য	...	৫
” যদুনাথ দে	...	২
” দেবেন্দ্রদেব দাস	...	১
” মহেন্দ্রলাল সোম	...	২
” বৈকুণ্ঠনাথ নন্দী	...	১
” দিগম্বর মিত্র	...	২৫
” প্যারীচরণ সরকার	...	২৫
” নন্দলাল পাল	...	৫
” কাশীশ্বর মিত্র	...	২
” গোপাললাল ঠাকুর	...	৫০
” শ্যামলাল পাল	...	৫
” শম্ভুনাথ মল্লিক	...	২৫
” কালীচরণ রায়	...	৫
” নবগোপাল মিত্র	...	১০
” কুমারকৃষ্ণ মিত্র	...	২
” ঘনশ্যাম ভট্টাচার্য্য	...	১

জের

শ্রীযুক্ত	রামেশ্বর বসু	...	২
”	দিননাথ ঘোষ	...	৫
”	অন্নদাপ্রসাদ ঘোষ	...	২
”	পঞ্চানন মুখোপাধ্যায়	...	১০
”	জয়গোপাল সেন	...	১০
”	অভয়াদাস বসু	...	২
”	নবীনচন্দ্র দেব	...	৫
”	লক্ষ্মীনারায়ণ মিত্র	...	৩
”	সারদাপ্রসাদ ঘোষ	...	২
”	নীলমাধব মিত্র (শ্যামপুকুর)	...	৫
”	দ্বারকানাথ বিশ্বাস	...	২৫
”	রমানাথ ঠাকুর	...	৫০
”	গোপালচন্দ্র মল্লিক	...	১
”	ঈশানচন্দ্র বসু	....	২৫
”	নীলমণি মিত্র	...	২
”	কালীদাস শীল	...	২
”	মহেন্দ্রলাল দে	...	৫
”	অমরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়	...	১৬
”	যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর	...	৫০
”	দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর	...	৪
”	আশুতোষ ধর	...	২
”	অক্ষয়কুমার ধর	...	১
”	ভোলানাথ মিত্র	...	৫
”	তুলসীদাস আঢ্য	...	১
”	রমানাথ লাহা	...	৫
”	রাজা কালীকুমার মল্লিকরায়	...	৫
”	কালীকৃষ্ণ ঘোষ	...	৪
”	নবীনকৃষ্ণ ঘোষ	...	৪
”	শ্রীনাথ ঘোষ	...	৪
”	রামচন্দ্র মিত্র	...	২
”	অক্ষয়কুমার মজুমদার	...	২
”	চণ্ডীলাল সিংহ	...	১০
”	দুর্গাদাস কর	...	২

জের

শ্রীযুক্ত	গোপাললাল মিত্র	...	২
”	গোপালচন্দ্র চক্রবর্ত্তী	...	২
”	অমৃতকৃষ্ণ বসু	...	২
”	খেলৎচন্দ্র ঘোষ	...	১০
”	অনুকূলচন্দ্র মুখোপাধ্যায়	...	১০
”	মধুসূদন সরকার	...	৫
”	জগচ্চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	...	৫
”	অতীন্দ্রমোহন ঠাকুর	...	১০
”	সাতকড়ি পাল	...	২
”	কৃষ্ণদয়াল রায়	...	১
”	প্রসাদদাস মল্লিক	...	৫
”	মাধবচন্দ্র রুদ্র	...	৫
”	নবীনচন্দ্র বড়াল	...	২
”	ঈশ্বরচন্দ্র ঘোষাল	...	২
”	রামগোপাল মিত্র	...	৩
”	তারকনাথ দত্ত (হাটখোলা)	...	৫
”	হেমচন্দ্র দত্ত	...	৪
”	একজন বন্ধু	...	২
”	বেণীমাধব সেন	...	২০
”	বৃন্দাবনচন্দ্র বসু	...	১০
”	যাদবচন্দ্র মুখোপাধ্যায়	...	১
”	রাজকৃষ্ণ হালদার	...	২
”	হরিমোহন নন্দী	...	১
”	গিরীশচন্দ্র ঘোষ	...	৫
”	অভয়াচরণ মল্লিক	...	১০
”	জয়গোপাল মিত্র	...	২
”	নীলকমল দাস	...	৫
”	বিহারীলাল ধর	...	৫
”	শশিপদ বন্দ্যোপাধ্যায়	...	২
”	শ্রীনাথ রায়	...	১৫
”	যাদবচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	...	২
”	কানাইলাল দে	...	২
”	নীলকমল মুখোপাধ্যায়	...	২৫

জের

শ্রীযুক্ত	সাতকড়ি দত্ত	...	২
”	উপেন্দ্রনাথ সরকার	...	১
”	গিরীশচন্দ্র দেব	...	২
”	আনন্দচন্দ্র দাস	...	২
”	ঈশানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	...	১৬
”	নীলমাধব মিত্র	...	১
”	শ্যামচাঁদ মিত্র	...	৫
”	ভোলানাথ লাহিড়ি	...	৫
”	ঘনশ্যাম মুখোপাধ্যায়	...	২
”	বনমালী সেন	...	১
”	শ্যামাচরণ সরকার	...	৫
”	চন্দ্রশেখর গুপ্ত	...	৪
”	তারকনাথ দত্ত (সিমুলিয়া)	...	৫
”	ক্ষেত্রমোহন ঘোষ	...	৪
”	নগেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ	...	১০
”	দেবীচরণ পাল	...	২
”	হরনাথ ঠাকুর	...	১
”	অতুলচন্দ্র মুখোপাধ্যায়	...	৬
”	তারাবল্লভ চট্টোপাধ্যায়	...	২
”	গোবিন্দচন্দ্র ধর	...	১
”	মতিচাঁদ চট্টোপাধ্যায়	...	৫
”	হেমচন্দ্র চক্রবর্ত্তী	...	১
”	পঞ্চানন মিত্র	...	২
”	বিহারীলাল চট্টোপাধ্যায়	...	২
”	রাজকৃষ্ণ আঢ্য	...	১
”	দ্বারকানাথ বসাক	...	১
”	ক্ষেত্রমোহন মিত্র	...	১
”	যাদবচন্দ্র রায়	...	১
”	শ্রীনাথ দাস	...	১০
”	হরপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়	...	১
”	উমাচরণ দাস	...	১
”	শ্যামাচরণ মুখোপাধ্যায়	...	১
”	অবিনাশচন্দ্র ঘোষ	...	৪

জের

শ্রীযুক্ত	বলাইচাঁদ সিংহ	...	৫
”	ধর্ম্মদাস হালদার	...	২৫
”	দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর (পাতুরিয়াঘাটা)	...	১
”	রাজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	...	৫
”	কন্নলাল বর্ম্মা	...	১
”	কালীচরণ বর্ম্মা	...	১
”	ব্রজসুন্দর মিত্র	...	১০
”	শ্যামলাল দত্ত	...	৬
”	গিরীশচন্দ্র ঘোষ	...	১
”	গণেন্দ্রনাথ ঠাকুর	...	১০০
”	তারিণীচরণ চট্টোপাধ্যায়	...	১
”	প্রসাদদাস দত্ত	...	৫
”	যজ্ঞেশপ্রকাশ গঙ্গোপাধ্যায়	...	১০
”	মুরলীধর সেন	...	৮
”	শ্রীনাথ দাস	...	১
”	লক্ষ্মীনাথ ঘোষ	...	১
”	কালীকৃষ্ণ বসু	...	১০
”	অম্বিকাচরণ মুখোপাধ্যায়	...	১
”	গিরিশচন্দ্র ঘোষ	...	২
”	রাধিকাপ্রসাদ দত্ত	...	৫
”	ক্ষেত্রমোহন মজুমদার	...	২
”	চন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	...	২
”	পূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়	...	১
”	গোবিন্দচন্দ্র কর	...	১
”	পূর্ণচন্দ্র ঘোষ	...	২
”	গিরিশচন্দ্র ঘোষ (ভবানীপুর)	...	
”	কানাইলাল চন্দ্র	...	১
”	সিংহদাস রায়	...	১
”	রাখালদাস মিত্র	...	২
”	গোবর্দ্ধন ঘোষ	...	
”	কৈলাসচন্দ্র দে	...	২
”	মথুরামোহন মজুমদার	...	১
”	রামনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়	...	১

জের

শ্রীযুক্ত	শ্রীনাথ রুদ্র	...	১
”	কানাইলাল গঙ্গোপাধ্যায়	...	১
”	বিনোদবিহারী নাগ	...	১
”	মতিলাল মুখোপাধ্যায়	...	১
”	বেণীকুমার চক্রবর্ত্তী	...	১
”	নীলমণি মল্লিক	...	১
”	মতিলাল মিত্র	...	১
”	প্রেমচাঁদ বসু	...	৪
”	গোপালচন্দ্র ঘোষ (শ্যামপুকুর)	...	১
”	গোপালচন্দ্র ঘোষ (সিমুলিয়া)	...	২
”	ঈশানচন্দ্র সেন	...	১০
”	উমেশচন্দ্র ঘোষ	...	৫
”	রামহরি দাস	...	৫
”	হরিমোহন পাল	...	১
”	মনোহর দাস	...	২
”	ডি এন বসু	...	২
”	শিবচন্দ্র নিয়োগী	...	৫
”	হরমোহন চট্টোপাধ্যায়	...	২
”	তারিণীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়	...	৫
”	প্রিয়নাথ দত্ত	...	১
”	রমানাথ পালিত	...	১
”	বিশ্বম্ভর চট্টোপাধ্যায়	...	১
”	যতীন্দ্রলাল চট্টোপাধ্যায়	...	১
”	মহিমাচন্দ্র পাল	...	৫
”	চন্দ্রমোহন দাস	...	২
”	তারাবিলাস মিত্র	...	৫
”	শ্রীপতি মুখোপাধ্যায়	...	২
”	দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর	...	১০০
”	উমাপ্রসাদ ঘোষ	...	২
”	অন্নদাপ্রসাদ ঘোষ	...	২
”	কাশীনাথ দত্ত	...	৪
”	নীলমাধব মুখোপাধ্যায়	...	৫
”	যদুনাথ মুখোপাধ্যায়	...	২

জের

শ্রীযুক্ত	তুলসীদাস মল্লিক	...	৫
”	বিজয়নাথ মুখোপাধ্যায়	...	১
”	ব্রজনাথ কাটমা	...	২
”	ত্রিগুণাচরণ বসু	...	১
”	মথুরামোহন কুণ্ডু	...	৫
”	উপেন্দ্রচন্দ্র বসু	...	৫
”	রাজেন্দ্রলাল সেট	...	২
”	কুমার সুরেন্দ্রকৃষ্ণ বাহাদুরের নিকট হইতে কয়েকজন সাহায্যকারির দান প্রাপ্ত	...	২২
			১৩৮৯
	বাঁশ ও দরমা বিক্রয়	...	৩৫
	কেমিকেল এক্‌স্‌পেরিমেন্টের দরুণ ঔষধ বিক্রয়		৯
			১৪৩৩

খরচ

টাকা আদায়ের জন্য সরকারদিগের কমিশন ও কর্ম্মচারিদিগের বেতন	...	১৬৯ ॥১০
নহবত্ গেট ও বাউয়ার নির্ম্মাণের ব্যয়	...	৬০
পণ্ডিতদিগের বিদায় ও গাড়ি ভাড়া, গায়ক ও বাদ্যকরদিগের পুরস্কার, ব্যায়াম প্রদর্শনকারিদের পুরস্কারের জন্য পুস্তক ক্রয়; মালীদিগের পুরস্কার ও পাইকদিগের পুরস্কার	...	৩০৫।৵
নহবৎ বাদ্যকরের বেতন	...	৮
সমবেত বাদ্যকরদিগের গাড়িভাড়া	...	৩২
সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন দিবার ব্যয়	...	২১
বোটের ভাড়া	...	৩৪
পুলিশ প্রহরীদিগের পুরস্কার	...	৩৬
রসিদ ও ডাকের টিকিট ক্রয়	...	১
টিকিট ছাপিবার জন্য কাগজ ক্রয়	...	৫ ॥০
চালাঘর সাজানোর জন্য কাপড়ে ভাড়া	...	৪৭ ॥০
কেদেরার ভাড়া	...	১০
বাগান পরিষ্কার ও মেরামতি	...	১৩৪ ।/০

নানাপ্রকার কার্য্যের জন্য গাড়ি ও পালকি ভাড়া	...	৮০/৫
বিবিধ বিষয়ে ব্যয়	...	২৪ ‍॥/০
বাগানের ঘর তৈয়ারি ও সাজানোর ব্যয়	...	৩০৩/০
গরুরগাড়ি ভাড়া ও মুটে ভাড়া	...	৩৫ ।০
কেমিকেল একস্‌পেরিমেন্টের জন্য ব্যয়	...	৩৪ ৵ ১৫
পীরখাঁ বাজীওয়ালা	...	১৫
টেলিগ্রাফ সংক্রান্ত ব্যয়	...	৮
বিবিধ দ্রব্যাদি ক্রয়	...	১৯ ।০
তাম্বুর ভাড়া	...	১২
পাখা ও মেজের ভাড়া	...	১২ ॥০
মেলার পুস্তক ছাপিবার জন্য কাগজ ক্রয়	...	১৬
		১৪২৪ ৵ ১০

আয়	...	১৪৩৩
ব্যয়	...	১৪২৪ ৵ ১৩
		৮ ৵ ১০

নবগোপাল মিত্র
সহকারী সম্পাদক

তৃতীয় অধিবেশন

দ্বিতীয় অধিবেশনের ঠিক এক বৎসর পরে ১৭৯০ শকে বাংলা ১২৭৫ সনের ৩০ চৈত্র তারিখে হিন্দুমেলার যে তৃতীয় অধিবেশন হয় তাহার কার্যবিবরণ এইখানে পুনর্মুদ্রিত হইল।[১]

তৃতীয় অধিবেশনে ঈশ্বরচন্দ্র ঘোষাল সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। এই বৎসরের মেলার বহুবিধ দ্রব্যাদি প্রদর্শিত হইয়াছিল।

এই অধিবেশনে নিম্নলিখিত গানগুলি গীত হয়।—

মিলে সব ভারত সন্তান[২]। সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর
সতত রত হও যতনে।
লজ্জায় ভারত যশ গাইব কি করে[২]। গণেন্দ্রনাথ ঠাকুর
হের আজ কি সুখের মেলা।
কবে উদিবে সৌভাগ্য ভানু ভারতবরষে।
উঠ উঠ সকলে হে ভারত সন্তান[২]।
এ দেশের দুখে কার না সরে চোখের জল[২]।
ছাড় হে অসার অলস, প্রস্তুত হও লভিতে যশ[২]।
উঠ ভারত কুমার সবে, ঘুমালে আর বল কি হবে।
বিলম্ব আর করো না, বিলম্ব কেন করিয়ে কর কাল হরণ।
আর কত দিন, হয়ে মানহীন, রহিবে ভারতবাসি।

ইহা ভিন্ন পরিশিষ্টে 'পুরষ্কৃত রচনাবলী'[৩], মনোমোহন বসু প্রদত্ত 'হিন্দুমেলার উদ্দেশ্য বিষয়ক বক্তৃতা'[৪] এবং '১৭৯০ শকের হিন্দুমেলার আয় ব্যয় বিবরণ' মুদ্রিত হয়।

১। কার্যবিবরণটি এক কপি বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ্ গ্রন্থাগারে আছে। জাতীয় গ্রন্থাগারেও এক কপি আছে। পৃষ্ঠা সংখ্যা ১১ + পরিশিষ্ট ১০৮ + /০ – ১ নং, ডিমাই সাইজ।

২। এই গানকয়টি পূর্ব অধিবেশনেও গীত হয়। দ্বিতীয় বর্ষের কার্যবিবরণে স্থান পাওয়ায় বর্তমান কার্যবিবরণ পুনর্মুদ্রণকালে এই গান কয়টির প্রথম ছত্র মাত্র উদ্ধৃত হইল।

৩। নীতিবিষয়ক উদ্ভট শ্লোক। কৈলাসচন্দ্র শর্মা
ভারত মেরুন্নতি বিষয়িণী সংস্কৃত রচনা।
রামায়ণের মর্ম ও তদন্তর্গত নীতি। রজনীকান্ত গুপ্ত
মহাভারতের মর্ম ও তদন্তর্গত নীতি। জানকীনাথ দত্ত
ক্ষত্রিয় জাতির দেশপ্রিয়তা ও সাহসিকতা (কবিতা)।

দ্রব বিজ্ঞান।

দৃষ্টি বিজ্ঞান।

তাড়িত বিজ্ঞান। উদয়চন্দ্র বসু

সঙ্গীত বিষয়ক প্রবন্ধ। গঙ্গাধর চট্টোপাধ্যায়

গুরু পাঠশালার উৎকর্ষবিধান। উমেশচন্দ্র চক্রবর্তী

৪। মনোমোহন বসু, বক্তৃতামালা, ‘তৃতীয় বার্ষিক চৈত্রমেলায় মেলার কর্তব্য-বিষয়ক বক্তৃতা’, পৃ ১৪-২৭

তৃতীয় বর্ষের কার্যবিবরণ

তৃতীয় অধিবেশন

১৭৯০ শক

৩০ শে চৈত্র সংক্রান্তি দিবসে হিন্দুমেলার তৃতীয় অধিবেশন হয়। শ্রীযুক্ত বাবু ঈশ্বরচন্দ্র ঘোষাল সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়া সভার কার্য্য আরম্ভ করেন। পরে উদ্বোধন স্বরূপ সংস্কৃত শ্লোক পঠিত হইলে পুরস্কৃত এবং অন্যান্য রচনাবলী রচয়িতাগণ দ্বারা পঠিত হইল। মধ্যে মধ্যে সঙ্গীত ও সমবেত বাদ্য হইয়াছিল।

মেলার বহুসংখ্যক দ্রব্যাদি প্রদর্শিত হইয়াছিল। নিম্নে তাহার প্রকার-ভেদগত নামোল্লিখিত হইতেছে।

শিল্প

১। স্ত্রীলোকদিগের সূচিনির্ম্মিত পশমের ও পুঁতির কার্য্য।
২। ছাঁচ ও খয়েরের গঠন।
৩। জামা, চাপকান্, রুমাল, পেশোয়াজ, উড়নী, সাটী, ইত্যাদি।
৪। কুম্ভকারদিগের নির্ম্মিত নানাবিধ ফল।
৫। নদীয়ার বাজার।
৬। নানাপ্রকার পুতুল।
৭। চিত্র।
৮। বারাণসী কাপড়।
৯। চীনদেশীয় নানাপ্রকার রেশমী কাপড়।
১০। ঢাকাই স্বর্ণকারদিগের নানাপ্রকার রূপা ও সোনার গঠন।
১১। নানাবিধ বাদ্যযন্ত্র।
১২। নানাবিধ অস্ত্রশস্ত্র।
১৩। ফোয়ারা।
১৪। ভাস্করীর প্রতিমূর্ত্তি।

উদ্ভিজ্জাদি

ফল। ফুল। মুল।
চারা। শস্য। বীজ।

কৃষি ও শিল্পকরণ যন্ত্রাদি

লাঙ্গল।

চরখা।

তাঁত।

যে সকল কৌতুকাবহ ও প্রয়োজনোপযোগী ক্রিয়া প্রদর্শন হইয়াছিল, তাহা এই-

রাসায়নিক ক্রিয়া

কুস্তী।

অশ্বচালন।

পাইকের খেলা।

বাঁশ-বাজী।

বেদের বাজী।

ভেল্‌কী।

নিম্নলিখিত গানগুলি গীত হইয়াছিল।

রাগিণী খাম্বাজ—তাল আড়াঠেকা।

মিলে সবে ভারত সন্তান,

রাগিণী খাম্বাজ—তাল ঝাঁপতাল।

সতত রত হও যতনে, দেশহিত সাধনে
এক মত ভাব ধরি, একতানে।
অতুল বলমিলন হয়, সফল হয় মনন চয়,
বিমল সুখ সলিল বয়, বিদ্যমানে॥
কি ছিল গুণ কি হল বল, কি হল সব বিভব বল,
ধিক জনম ধন বিফল হীন মানে।
বিনয় করি বচন ধর্, খল অলস গরল হর,
যশ কুসুম চয়ন কর, পুলক প্রাণে॥২॥

রাগিণী বাহার—তাল জৎ।

লজ্জায় ভারত যশ গাইব কি করে।

রাগিণী দেশ—তাল তেওট।

হের আজ কি সুখের মেলা।
এই মেলা আনন্দেরি মেলা।
স্বজাতীয় মেলা দরশন মেলা মেলা মহা মেলা।
সব মনে মেলা অদ্ভুত মেলা গুণি গণ গুণ মেলা॥
স্বদেশেরি হিত সাধিলে প্রীত কেন কর অবহেলা॥
নিরাশ তরঙ্গে ভাব কি আতঙ্গে পাবে ভরসা ভেলা॥
থাকিয়ে নীরব ফল বা কি হবে যতন কর এই বেলা।

রাগিণী মুলতান—তাল একতাল

কবে উদিবে সৌভাগ্য ভানু ভারতবরষে।
পোহাইবে দুঃখ নিশা প্রভাত পরশে॥
সভ্যতা সরোজ লতা, প্রাপ্ত হবে প্রবলতা,
প্রস্ফুটিবে সুখাম্বুজ, মানস সরসে।
উন্নতি মরাল কুলে, ভ্রমিবে সলিলে কূলে,
প্রকৃতি প্রমোদ ভুলে, হাসিবে হরিয়ে॥
উৎসাহেরি উপবনে, একতার সুপবনে,
কামনা কুসুম কলি ফুটিবে সরসে;—
দেশ-হিতাকাঙ্ক্ষি জনে, অলি সম সদাক্ষণে.
মাতিবে মোহিত হোয়ে মধুময় রসে॥

রাগিণী সিন্দুরা—তাল ধামাল।

উঠ উঠ সকলে হে ভারত সন্তান।

রাগিণী সিন্ধু ভৈরবী—তাল একতালা।

এ দেশের দুখে কার না সরে চোখের জল

রাগিণী বরজ—তাল একতালা।

ছাড় হে অসার অলস্য, প্রস্তুত হও লভিতে যশ।

রাগিণী দেশ—তাল জৎ।

উঠ ভারতকুমার সবে, ঘুমালে আর বল কি হবে।
একতার সে তার কি মনে নাই, কি ছিলে আহা একি হলে ভাই,
যাবে হে শোকেরি তম রাশি জাগো কতেক ভারতবাসি,
আর এ ঘুমে লোকে কি কবে॥
যবে সৌভাগ্যের সূর্য্য উদিবে, দুঃখ কুমুদী নয়ন মুদিবে,
সুখ সরসিজ দলে ফুটিবে, পুনঃ সবে,
একতার রবে হে গৌরবে॥

রাগিণী দেশ খাম্বাজ—তাল একতাল।

বিলম্ব আর করোনা, বিলম্ব কেন করিয়ে কর কাল হরণ
না লভি সুখ সার।
সকলে মিলি করি সুযতন, উন্নত কর বিনত বদন,
পর পর গলে চারুরতন নির্ম্মল যশোহার।
জনম ভূমি ছিন্ন ভিন্ন, ক্রমশ নিরখি মলিন শীর্ণ,
কেবল দুখ সলিলপূর্ণ তোষয় মন তার।
হইবে কত বিগতমান, অবিরত হও যতনবান,
কেন বধির জন সমান, বহিছ দেহ ভার॥

রাগিণী খাম্বাজ—তাল একতাল।

আর কত দিন, হয়ে মান হীন, রহিবে ভারতবাসি।
কর দেশের হিত সাধনা, হবে অশেষ সুখ ঘটনা,
ভেবনা ভেবনা হরিবে ভাবনা রবে না
যাতনা রাশি।
জনম ভূমির বিষণ্ন শরীর, হেরে আঁখি নীরে ভাসি,
থাকিতে সন্তান মায়ের অপমান, এ দুখ কাহারে ভাসি।
ধিক জীবনে কি কাষ, বদন দেখাতে না হয় লাজ,
গর্ব্ব করিয়ে সভ্য সমাজ, কহে কত উপহাসি॥

যে সকল রচনা পুরস্কৃত হইয়াছিল, তাহা পরিশিষ্টে দৃষ্ট হইবে।
রচয়িতাদিগের নাম ও পুরস্কার স্বরূপ অর্থসংখ্যা পরপৃষ্ঠায় লিখিত হইতেছে।

শ্রীকৈলাসচন্দ্র শর্ম্মা	২৫৲
শ্রীতারাকুমার চক্রবর্ত্তী	৫০
শ্রীরজনীকান্ত গুপ্ত	১০
শ্রীঅনুকূলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	১৬
শ্রীজানকীনাথ দত্ত	২০
শ্রীউদয়চন্দ্র বসু	১০০
শ্রীগঙ্গাধর চট্টোপাধ্যায়	৫০
শ্রীউমেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী	২৫

স্ত্রী-শিল্পজাত অনেকগুলি দ্রব্য উপস্থিত হইয়াছিল। যে সকল দ্রব্য সর্বোৎকৃষ্ট বলিয়া স্থির হয়, তাহার নির্ম্মাত্রীদিগকে হিন্দুমেলার নামাঙ্কিত এক একটী রৌপ্য-মুদ্রা পারিতোষিক স্বরূপ প্রদত্ত হয়। তাঁহাদের পরিচয় নিম্নে নির্দ্দেশ করা যাইতেছে।

মৃত	বাবু	আশুতোষ দেবের পরিবার	১
শ্রীযুক্ত	বাবু	প্রিয়নাথ দত্তের পরিবার	১
”	”	রাজেন্দ্র মিত্রের পরিবার	১
”	”	সারদাপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায়ের পরিবার	১
”	”	দীননাথ বসুর পরিবার	১
”	”	নীলকমল মিত্রের পরিবার	১
”	”	মণিমোহন মল্লিকের পরিবার	১
”	”	ক্ষেত্রমোহন চট্টোপাধ্যায়ের পরিবার	১
”	”	হরিবল্লভ বসুর পরিবার	১
”	”	প্রসন্নকুমার মিত্রের পরিবার	১
শ্রীমতী		সতী দেবী	১
কোন্নগর		বালিকাবিদ্যালয়	১

নদীয়ার একজন কুম্ভকারকে মৃত্তিকানির্ম্মিত দ্রব্যের জন্য এক রৌপ্য-মুদ্রা প্রদত্ত হইয়াছিল। এতদ্ভিন্ন সুরপুরা বাদ্যযন্ত্রের নিমিত্ত একটী রৌপ্য-মুদ্রা * প্রদত্ত হয়।

ব্যায়াম-নৈপুণ্যের নিমিত্ত নিম্নলিখিত ব্যায়ামবিদ্যালয়ে এক একটী ঐরূপ রৌপ্য-মুদ্রা প্রদত্ত হয়।

শ্যামবাজার—ব্যায়ামবিদ্যালয়		১
শ্যামপুকুর	”	১ *
বাহিরসিমুলিয়া	”	১

* গচ্ছিত আছে।

শ্রীযুক্ত বাবু অম্বিকাচরণ গুহ অশ্বচালন-নৈপুণ্যের নিমিত্ত সাধারণের নিকট যথেষ্ট প্রশংসা লাভ করেন।

শ্যামপুকুর, ঝামাপুকুর ও জোড়াসাঁকোর সমবেত বাদ্যকারিগণ উপস্থিত হইয়াছিলেন, মধ্যে মধ্যে সঙ্গীত ও সমবেত বাদ্য হইয়াছিল। তাঁহারা সাধারণের নিকট বিশেষ যশোলাভ করেন।

শ্রীযুক্ত রায় রাজেন্দ্র মল্লিক রায় বাহাদুর যে মৃত্তিকানির্ম্মিত ফল সকল প্রদর্শন করেন, তজ্জন্য তিনি পুরস্কার অভিলাষ করেন না। তিনি সাধারণের নিকট ধন্যবাদ প্রাপ্ত হয়েন।

শ্রীযুক্ত নিতাইচাঁদ যে স্ত্রীলোকদিগের সূচিনির্ম্মিত কার্য্যের উৎসাহ নিমিত্ত রৌপ্যমুদ্রা প্রদান করেন, তন্নিমিত্ত তিনি সাধারণের নিকট বিশেষ ধন্যবাদ প্রাপ্ত হইয়াছেন।

উদ্যানপালক মালিগণ যে সকল দ্রব্য প্রদর্শন করিয়াছিল, তজ্জন্য ২৯৭ টাকা পুরস্কার প্রাপ্ত হয়।

পরিশিষ্ট

পুরস্কৃত রচনাবলী

নীতিবিষয়ক উদ্ভটশ্লোক।

বাঞ্ছা সজ্জনসঙ্গমে পরগুণে প্রীতির্গুরৌ নম্রতা
বিদ্যায়াং ব্যসনং স্বযোষিতি রতির্লোকাপবাদাদ্ভয়ম্।
ভক্তিশ্চক্রিণি শক্তিরাত্মদমনে সংসর্গমুক্তিঃ খলে
এতে যত্র বসন্তি নির্ম্মল গুণাস্তেভ্যো নরেভ্যো নমঃ॥ ১
সনোপুমান্ যোনগুণৈরলঙ্কৃতঃ ন তে গুণাঃ যে জনয়ন্তি নো যশঃ।
ন তদ্যশো যত্র বুধৈর্ন গীয়তে, নতে বুধাঃ সৎসু ন যেঽনুরাগিণঃ॥ ২
নীতির্ভূমি ভুজাং নতির্গুণবতাং হ্রীরঙ্গনানাং ধৃতি-র্দম্পত্যোঃ
শিশবো গৃহস্য কবিতা বুদ্ধেঃ প্রসাদো গিরাম্।
লাবণ্যং বপুষঃ স্মৃতিঃ সুমনসাং শান্তির্দ্বিজস্য ক্ষমা
শক্তস্য দ্রবিণং গৃহাশ্রমবতাং স্বাস্থ্যং সতাং মণ্ডনম্॥ ৩
দাক্ষিণ্যং স্বজনে দয়া পরিজনে শাঠ্যং সদা দুর্জ্জনে
প্রীতিঃ সাধুজনে ক্ষমা গুরুজনে নারীজনে ধূর্ত্ততা।
শৌর্য্যং শত্রুজনে স্ময়ঃ খলজনে বিদ্বজ্জনে চার্জ্জবম্
যেত্বেবং পুরুষাঃ কলাসু কুশলা স্তেম্বেব লোকঃ স্থিতঃ॥ ৪
ধর্ম্মঃ প্রাগেব চিন্ত্যঃ সচিবমতি গতির্ভাবনীয়া সদৈব
জ্ঞেয়ং লোকানুবৃত্তং বরচরনয়নৈর্ম্মণ্ডলং বীক্ষণীয়ম্।
প্রচ্ছাদ্যৌ রাগ রোষৌ মৃদুপরুষগুণৌ যোজনীযৌচ কালে
আত্মা যত্নেন রক্ষ্যোরণশিরসি পুনঃ সোপি নাপেক্ষণীয়ঃ॥ ৫
উৎখাতান্ প্রতিরোপয়ন্ কুসুমিতাংশ্চিন্বন্ শিশূন্ বর্দ্ধয়ন্
প্রোত্তুঙ্গান্ নময়ন্ নতান্ সমুদয়ন্ বিশ্লেষয়ন্ সংহতান্।
তীব্রান্ কণ্টকিনো বহির্নিয়ময়ন্ ম্লানান্ মুহুঃ সেচয়ন্
মালাকার ইব প্রয়োগনিপুণোরাজা চিরং নন্দতু॥ ৬
কার্পণ্যেন যশঃ ক্রুধা গুণচয়ো দম্ভেন সত্যং ক্ষুধা
মর্য্যাদা ব্যসনৈর্ধনানি বিপদা স্থৈর্য্যং প্রসাদৈর্দ্বিজঃ।
পৈশুন্যেন কুলং মদেন বিনয়ো দুশ্চেষ্টয়া পৌরুষং
দারিদ্রেণ জনাদরো মমতয়া চাত্মপ্রকাশো হতঃ॥ ৭

মূর্খোশান্তস্তপস্বী ক্ষিতিপতিরলসো মৎসরো ধর্ম্মশীলো
দুঃস্থোমানী গৃহস্থঃ প্রভুরতিকৃপণঃ শাস্ত্রবিদ্ধর্ম্মহীনঃ।
আজ্ঞাহীনো নরেন্দ্রোঽশুচিরপি সততং যঃ পরান্নোপভোগী
বৃদ্ধোরোগী দরিদ্রঃ সচ যুবতিপতির্ধিগ্‌বিড়ম্ব প্রকারম্॥ ৮
বিদ্বান্ সংসদি পাক্ষিকঃ পরবশো মানী দরিদ্রোগৃহী
বিত্তাঢ্যঃ কৃপণঃ সুখী পরবশোবৃদ্ধো নতীর্থাশ্রিতঃ।
রাজা দুঃসচিবপ্রিয়ঃ কুলভবো মূর্খঃ পুমান্ স্ত্রীজিতো
বেদান্তী হতসৎক্রিয়ঃ কিমপরং হাস্যাস্পদং ভূতলে॥ ৯
দুর্মন্ত্রিণং কমুপযান্তি নৃপং ন দোষাঃ সন্তাপয়ন্তি কমপথ্যভুজং ন রোগাঃ।
কংশ্রীর্ন দর্পয়তি কং ন নিহন্তি মৃত্যুঃ কংস্ত্রীকৃতা ন বিষয়া ননু তাপয়ন্তি॥ ১০
অবলা যত্র প্রবলা মন্ত্রী যত্র নিরক্ষরঃ।
অন্ধকস্কন্ধলগ্নস্য বিঘ্ন স্তস্য পদে পদে॥ ১১
লোভোপ্যস্তি গুণেন কিং পিশুনতা যস্যাস্তি কিংপাতকৈঃ
সৌজন্যং যদি পরৈং সুমহিমা যদ্যস্তি কিং মণ্ডনৈঃ।
সত্যং চেত্তপসা চ কিং শুচিমনো যদ্যস্তি তীর্থন কিং
সদ্বিদ্যা যদি কিং ধনৈপযশো যদ্যস্তি কিং মৃত্যুনা॥ ১২
দানং দরিদ্রস্য প্রভোশ্চ শান্তির্যুনাংতপো জ্ঞানবতাঞ্চ মৌনম্।
ইচ্ছা নিবৃত্তিশ্চ সুখাসিতানাং দয়াচ ভূতেষু দিব্য নয়ন্তি॥ ১৩
বরং দরিদ্রমন্যায় সম্ভাবাদ্বিভবাদপি।
কৃশতানুমতা দেহে স্থূলতা নতু শোথজা॥ ১৪
ঘৃষ্টং ঘৃষ্টং ত্যজতি ন পুনশ্চন্দনঞ্চারুগন্ধং
দগ্ধং দগ্ধং ত্যজতি ন পুনঃ কাঞ্চনং কান্তমূর্তিম্।
ছিন্নং ছিন্নং ত্যজতি ন পুনঃ স্বাদুতামিক্ষুদণ্ডং
প্রাণান্তেঽপি প্রকৃতিবিকৃতির্জায়তে নোত্তমানাম্॥ ১৫
জাতঃ সূর্যকুলে পিতা দশরথঃ ক্ষৌণীভুজামগ্রণীঃ
সীতা সত্যপরায়ণা প্রণয়িনী যস্যানুজোলক্ষ্মণঃ।
দোর্দণ্ডেন সমো নচাস্তি ভুবনে প্রত্যক্ষবিষ্ণুঃ স্বয়ম্।
রামো যেন বিড়ম্বতোপি বিধিনা চান্যে পরে কা কথা॥ ১৬
কাব্যে ভব্যতমেপি বিজ্ঞনিবহৈরাস্বাদ্যমানে মুহু-
র্দোষান্বেষণমেব মৎসরযুষাং নৈসর্গিকো দুর্গ্রহঃ।
কাসা রেপি বিকাশিপঙ্কজচয়ে খেলন্মরালে পুনঃ
ক্রৌঞ্চশ্চঞ্চুপুটেন কুঞ্চিতবপুঃশম্বুকমন্বেষতে॥ ১৭
গুণ দোষৌ বুধো গৃহ্নন্নিন্দু ক্ষেড়াবিবেশ্বরঃ।
শিরসা শ্লাঘাতে পূর্ব্বং পরং কণ্ঠে নিয়চ্ছতি॥ ১৮

গুণায়ন্তে দোষাঃ সুজনবদনে দুর্জ্জনমুখে / গুণা দোষায়ন্তে ব্যভিচরতি
নৈবং ক্বচিদপি। যতো জীমূতোয়ং লবণজলধের্বারি মধুরং /
ফণী পীত্বা ক্ষীরং বমতি গরলং দুঃসহতরং॥ ১৯
পূর্ণোপি গুণযুক্তোঽপি কুম্ভঃ কূপে নিমজ্জতি।
তস্য ভারসহো নস্যাদ্ গুণস্য গ্রাহকো যদি॥ ২০
আরোপ্যতেঽশ্মা শৈলাগ্রে কৃচ্ছ্রেণ মহতা যথা
নিপাত্যতে সুখেনাধস্তথাত্মা গুণদোষয়োঃ॥ ২১
উদয়তি যদি ভানুঃ পশ্চিমে দিগ্বিভাগে / বিকসতি যদি
পদ্মং পর্ব্বতানাং শিখাগ্রে। প্রচলিত যদি মেরুঃ শীততাং
যাতি বহ্নি / র্নচলতি খলু বাক্যং সজ্জনানাং কদাচিৎ॥ ২২
প্রথমবয়সি দত্তং তোয়মল্পং স্মরন্তঃ / শিরসি
নিহিতভারান্নারিকেলা বহন্তঃ / সলিলমমৃতকল্পং
দদ্যুরাজীবনান্তং / নহি কৃতমুপকারং সাধবো
বিস্মরন্তি॥ ২৩
সাধ্বীস্ত্রীণাং দয়িত বিরহে মানিনাং মানভঙ্গে
সল্লোকানামপি জনরবে নিগ্রহে পণ্ডিতানাম্।
অন্যোদ্রেকে কুটিলমনসাং নির্গুণানাং বিদেশে
ভৃত্যাভাবে ভবতি মরণং কিঞ্চ সম্ভাবিতানাম্॥ ২৪
গিরৌ কলাপী গগনে পয়োদা লক্ষান্তরের্কশ্চ জলেষু পদ্মাঃ॥
ইন্দুর্দ্বিলক্ষে কুমুদস্য বন্ধু র্যো যস্য মিত্রং নহিতস্য দূরম্॥ ২৫
উৎকৃষ্ট মধ্যমনিকৃষ্ট জনেষু মৈত্রী / যদ্বচ্ছিলাসু সিকতাসু
জলেষু রেখা। বৈরং ক্রমাদধম মধ্যম সজ্জনেষু /
যদ্বচ্ছিলাসু সিকতাসু জলেষু রেখা॥ ২৬
বেদং বেদ ন কোঽপি ভূধরদরীলীনা মুনীনাং গিরঃ
স্বচ্ছং ম্লেচ্ছমতং জনাস্তদনুগাঃ কা নাম ধর্ম্ম্যাঃ ক্রিয়াঃ।
মদ্যং হৃদ্যমতীব বারবনিতাঃ সেব্যা নগুর্ব্বাদয়ঃ
কিং কার্য্যং পরিশিষ্টমস্তি ভবতো জানামি নাহং কালে॥ ২৭
কিন্তেন হেমগিরিণা রজতাদ্রিণা বা যত্র স্থিতা হি তরবস্তরবস্ত এব।
বন্ধামহে মলয়মেব যদাশ্রয়েণ শাকোট নিম্বকুট জান্যপি চন্দনানি॥ ২৮
সিংহক্ষুণ্ণ করীন্দ্রকুম্ভগলিতং রক্তাক্ত মুক্তাফলম্ / কান্তারে বদরী
ধিয়া দ্রুতমগাদভিল্লস্য পত্নীমুদা। পাণিভ্যামগৃহ্য
শুক্লকঠিনং তদ্বীক্ষ্যদূরে জহা বস্থানে পততামতীব
মহতামেতাদৃশীসস্যাদ্গতিঃ॥ ২৯
ছেদশ্চন্দন চূতচম্পকবনে রক্ষা চ শাকোটকে

হিংসা হংস কোকিল কুলে কাকেষু নিত্যাদরঃ
মাতঙ্গেন খরক্রয়ঃ সমতুলা কর্পূর কার্পাসয়ো
রেষা যত্র বিচারণা গুণিগণে দেশায় তস্মৈ নমঃ॥ ৩১
ব্যোম্নৈকান্তবিহারিণোপি বিহগাঃ সংপ্রাপ্নুবন্ত্যাপদং
বধ্যন্তে নিপুণৈরগাধসলিলাম্মৎস্যাঃ সমুদ্রাদপি।
দুর্নীতে হি বিধৌ কিমস্তি চরিতং কঃ স্থানলাভে
গুণঃ কালোহি ব্যসনপ্রসারিত করো গৃহ্লাতি দূবাদপি॥ ৩২
বিদ্যা শিক্ষণদায়িনাসতিতরাং রাজ্ঞাং প্রতাপং সতাং
সত্যং স্বল্পধনস্য সঞ্চিতিরসদ্বৃত্তস্য বাগাড়ম্বরঃ।
সাচারস্য মনোদমঃ পরিণতের্বিদ্যা কুলসৈকতা
সৰ্ব্বেষাং ধনমুন্নতের্গুণচয়ঃ শান্তের্বিবেকোবলম্॥ ৩৩
গুরুজনপরিচর্য্যা ধৈর্য্য গাম্ভীর্য্যলজ্জা গৃহকরণনিবেশঃ
স্বামিনি প্রেমভক্তিঃ। ইতি কুলরমণীনাং বর্ত্ম জানন্তি
সৰ্ব্বা রিপুকরণপরাস্তা যান্তি মার্গানতীতাঃ॥ ৩৪
রূপং রূপবিবর্জ্জিতস্য ভবতো ধ্যানেন যদ্বর্ণিতং স্তুত্যা
নির্ব্বচনীয়তাহখলিগুরো দূরীকৃতা যন্ময়া। ব্যাপিত্বঞ্চ
বিনাশিতং ভগবতো যত্তীর্থযাত্রাদিনা ক্ষন্তব্যং জগদীশ
তদ্বিকলতাদোষত্রয়ং মৎকৃতম্॥ ৩৫

শ্রীকৈলাসচন্দ্র শৰ্ম্মা
হেয়ার স্কুল, কলিকাতা।

ভারতভূমেরুন্নতিবিষয়িণী সংস্কৃত রচনা
(বিদ্যা।)

পূৰ্ব্বৈঃ সুরিভিরত্র ভারতমহোদ্যানে চিরং রোপিতা
বিদ্যামূলবতী মহোন্নতিলতা জ্ঞানপ্রসূনোজ্জ্বলা।
তস্যাঃ সেবিতুমস্তিচেৎ সুখফলং বাঞ্ছা হৃদি ভ্রাতরঃ
তন্মূলংমিয়তং প্রযত্নসলিলৈঃ সিঞ্চন্তুসৰ্ব্বে তদা॥

পুরা কিল সকলধরাতলললামভূতেয়ং ভারতভূমিঃ প্রসবভূর্মিরশেষ বিদ্যানাংসুগৃহীত-নামভির্যশঃশশাঙ্ক ধবলীকৃতদিঙ্মণ্ডলৈরপক্ষপাতিভিরপি গুণপক্ষপাতিভির্ম্মহারাজাধিরাজিভি-রাজিভির্ব্বরাজিতা প্রত্যাদেশাহশেষদেশানামাসীৎ, পুপোষচ কামপ্যলোকসাধারণীমভিখ্যাং, তদাহি-জন্মভূমিরস্মাকমালোকেনেব দর্শ নৈকহেতুনাম গৌতমেন ভাস্করেণেব সকললোকতমোহারিণা

ভাস্কারাচার্য্যেণ মহেশ্বরেণ কুমারসম্ভবকারিণা কালিদাসেন রামচন্দ্রেণেব মহাবীর চরিতবিশ্রুতকীর্ত্তিনা ভবভূতিনা রত্নাকরেণেব রত্নাবলীং জনয়তা শ্রীহর্ষেণ অমরনাথে নেবামরকোষাধিকারিণামরসিংহেন এবমমরনগরীবা-পরৈর্ব্বিবিধবিবুধনিবহৈঃপরিবৃতা, সমারুরোহকামপ্যনুপমেয়মুভ্যুদয়পদবীং।

অথ গচ্ছতা কালেনাস্মাকমতীবভাগ্যদোষবশাদতিদুর্দ্দান্তচেষ্টিতর্যবনভূপতিভিঃ পুণ্যভূমিরিয়স্মাকং ভারতভূমিরধিকৃতা। ততোহতিদুর্ব্বৃত্তৈস্তৈর্জ্জলদাবলীবোৎপাতবাতৈঃ সুদূরমপসারিতাস্যা সকল সৌভাগ্য-সন্ততিঃ। এবমস্তমুপাগতভারতসৌভাগ্যদিবাকরে কুতোঽপ্যাগত্যদৌর্ভাগ্যবিভাবরী নিখিলভারতজন-সুখালোকমেকপদেবিলোপমনয়ৎ। ততঃ প্রভৃতি-নিবিড়দুঃখতমোভিগ্রস্তাঃ সমস্তদিশোনিখিলবিদ্যাক-মলিন্যশ্চাশরণাঃ সঞ্জাতাঃ।

কালেনাবসিতা সাস্মাকং চিরদৌর্ভাগ্যরজনী। সাম্প্রতমস্মৎপুণ্য পরম্পরয়া ভারতাম্বরে প্রতাপভানুরিংলণ্ডীয়ানামুলুকানিবকুতোঽপ্যসার্য্য তান্ যবনরাজহত কানুন্মীলয়ন্ প্রজাচয়হৃদয়কমলা-নিবিস্তারয়ন্ দিশিদিশি সুখকিরণানি সমুদিতঃ। অধুনেয়ঃ ভারতভূমির্যবনহস্তমুক্তা শশিকলেব রাহুবদনবিবরবিনির্গতা কৌমুদীব জলধরনিকরোপরোধশূন্যা দিনকরপ্রভেব নিবিড়কুজ্ঝটিকাজাল-বহির্গতা পুনঃশোভাতিশয়ং পুষ্ণাতি। বিদ্যাপি রাজপুরুষগণানুরাগেণ নলিনীবদিবাকরকরেণ পুনরুজ্জৃম্ভতে।

কিন্ত্বধুনা ব্যাকরণকাব্যাদিশাস্ত্রেষু প্রায়শোজনানামনুরাগবশার্দ্দৃশ্যন্তে তান্যেব শাস্ত্রাণি প্রচরদ্রূপাণি। প্রকৃতকল্যাণমূলান্যধ্যাত্ম দর্শনবিজ্ঞানজ্যোতিরাদীন্যন্যানি চ শাস্ত্রান্যোদ্ভিদ্যকৃষিবাণিজ্যরসায়নশিল্পাদীনি বিলুপ্ত-প্রায়ান্যেব লোকানুরাগবিরহাৎ। ন খলুকস্যচিদপি দেশস্য সমুন্নতির্ব্বিজ্ঞানাদিশাস্ত্রাণাং বহুলসমালোচনমন্তরেণ সম্ভাব্যতে। যদ্যনুসন্ধীয়ন্তে কারণানি সকলমহোদয়শালিজনপদানামভ্যুদয়স্য তদাবিজ্ঞানাদিসমালোচনমেব কারণত্বেনোপলভ্যতে।

তদিদানীমিদমর্থয়ে ভবতো বিদ্যাবৃদ্ধি কর্ম্মনি নিযুক্তান্ রাজপুরুষান্ যদেতান্যপি শাস্ত্রাণি বিজ্ঞানকৃষিবাণিজ্যাদীনি সর্ব্বেষ্বেব বিদ্যালয়েষু পাঠয়িতুমাজ্ঞাপয়ন্তু ভবন্তঃ, তথা সত্যচিরেনৈব ভবিষ্যতি ভারতবর্ষীয়াণাং বিবৃতদ্বারমনন্তসৌভাগ্যং।

নিরবধিরভ্যুদয়ো ন খলু জাতিবিশেষং ব্যক্তিবিশেষং বয়োবিশেষং সময়বিশেষন্বা সমপেক্ষতে, তত্রসুশিক্ষিতানাং সর্ব্বজাতীয়ানাং সর্ব্বাবস্থানাং সর্ব্ববিধানামেব জনানাং সর্ব্বদৈবাবলম্বনীয়ঃ প্রযত্নঃ।

দেশোন্নতিরধুনা যথাস্মাসুমধ্যে কৃতবিদ্যানাং প্রযত্নসাপেক্ষা তিষ্ঠতি ভবিষ্যৎসময়েঽপি সা তথাস্মাকং কৃতবিদ্যবালকবালিকানামপেক্ষিস্যতে যত্নং। অতত্রবাস্মদ্দেশীয়বালকবালিকানাং যেন সর্ব্বাংশে সুশিক্ষাভবতি স্বদেশহিতমাধিৎসুভিঃ পরিণামদর্শিভিরাদৌতথৈব সর্ব্বথা যতনীয়ং।

যাবদ্ভারতবর্ষীয়াঃ সর্ব্বে সততমৈকমত্যং ধর্ম্মাচারাদিষু, নির্ভীকতা ন্যায়ানুষ্ঠানে, দৃঢ়তাসৎকার্য্যেষু সুনিয়মোগৃহাশনবসনাদিষু অনুরাগো বলাধানকরে ব্যায়মাদাবিত্যেতানি চান্যানি চ করণীয়ানি নাবলম্বন্তে তাবৎ সূদূরপরাহতা তেষাং মঙ্গলাশা বিফলা চ সকলশিক্ষা।

অহো! কোঽপিমহিমাতস্য জ্ঞান-তরোর্যস্য বিবেক-বিটপেষু জায়ন্তেঽনন্তসুকৃতফলানি। ধন্যাস্তে যে তেষাং ফলানাং পরমানন্দরসমহর্নিশ মাস্বাদয়ন্তো বিগলিতসকলদুঃখামোদন্তে। অয়ে! ভারতবাসিনো ভ্রাতরঃ!

যদিবাঞ্ছন্তি ভবন্তো জন্মভূমেরতিদৌর্ভাগ্যমলিনিমান মপনে তুং দুর্লভমানবজন্মগরিমানঞ্চ সংরক্ষিতুং তদা বিমলহৃদয়োদ্যানেষু কেবলমবিরল প্রযত্ন-সলিলধারয়া তমেকং জ্ঞান-পাদপং

সংবৰ্দ্ধ্য তস্য পরমকল্যাণচ্ছায়ায়াং নিষণ্ণাত্মানঃ। সততমতিসুভগসৌভাগ্যসমীরণং সেবমানা বিস্মৃতসংসারক্লেশাতপাঃ কমপ্যচিন্তনীয়ামননুভূতপূৰ্ব্বাং শান্তিরসমাধুরীমনুভবন্তু ভবন্ত।

ভারতভূমেরুন্নতিবিষয়িণী সংস্কৃত রচনা

(ভাষা)

কাঠিন্যাভিধদুর্গদুর্গমমহাবিদ্যাপুরীবিদ্যতে
শান্তিঃকাপিচ কোঽপি তত্র পরমানন্দশ্চিরং রাজতে
তন্মধ্যে যদি গন্তুমস্তি ভবতামিচ্ছা নিতান্তং তদা
ভাষাজ্ঞানবিশালরম্যসুগমদ্বারং সদা সেব্যতাম্॥

স্বদেশোন্নতিবিধৌ জনানাং ভাষাশাজ্ঞানঞ্চান্যতমো হেতুঃ। ভাষাজ্ঞান-সহচরঃ হি শাস্ত্রজ্ঞানং; অতএব সমীচীনভাষাজ্ঞানমন্তরেণ ন খলুকস্মিংশ্চিদপি শাস্ত্রে প্রবেশ এব সম্ভাব্যতে কুতএব ব্যুৎপত্তিঃ। শাস্ত্রজ্ঞানবিহীনানাঞ্চ স্বদেশোন্নতিচিকীর্ষানৈতি কদাচিদপি সফলতাং, যতস্তেষামনবগতশাস্ত্রার্থানি হৃদয়ানি স্বতএব মলিনীভবন্তি বহুলকুসংস্কারাদিদোষৈঃ, তাদৃশ দোষসঙ্কুলেষু হৃদয়েষু চ শশধর-কিরণানীব পঙ্কিলজলেষু রত্নচয়মরীচয় ইবানধিগতশাণেষু মণিষু প্রতিফলন্তি নোপদেশা নীতয়শ্চ।

অস্মদ্দেশেঽধুনা যাঃ কাশ্চিদ্ভাষা প্রচরদ্রূপা দৃশ্যন্তে সংস্কৃতভাষা প্রায়শস্তাসাং সৰ্ব্বসায়েব প্রসূতিঃ। অতএব প্রচলিতাসু বঙ্গীয়াদিকাসু ভাষাসু ব্যুৎপত্তিকামৈৰ্দ্দেশহিতৈষুভিঃ সৰ্ব্বপ্রযত্নে-নাস্মাকমতিপ্রাচীনা সৰ্ব্বাবয়বসম্পন্না সংস্কৃত ভাষাবশ্যমেবাভ্যসনীয়া।

ইমাংখলু সংস্কৃতভাষাং পীযূষকুম্ভমিব ক্ষীরোদধির্ম্মন্দারমিব নন্দনবনী গঙ্গামিব হিমালয়ো-ঽস্মজ্জন্মভূমিরেব প্রথমংসূতবতী। যৎপ্রসবেণ ভারতজননী রত্নগর্ভেতি বিশ্রূয়তে জগতি। ন জানে ভাষায়া মস্যামস্তি কিমপিবশীকরণমন্ত্রং যেনেয় মতিবিশালজলনিধিজলমপ্যতীত্য বিদেশীয়ানামপি মনাংসি তথা মোহিতবতী যথা তে জাতিভাষাগৌরবমাপিবিস্মৃত্যামন্যমনসো ভাষামিমাং পঠন্তি কামপ্যনুভবন্তি চানন্দরসবিহ্বলামবস্থাং।

পুরাকিল সংস্কৃতভাষা সমস্তভারতবর্ষে লৌকিকব্যবহারেষ্বপি প্রচলিতা বভূব। যবনরাজাধিকারে পুনরিয়ং রাজবশতাপন্নপ্রজানামনাদরপরিভূতা প্রায়শো বিলোপমবাপ। অধুনাতু কতিপয়ানামিংলণ্ডীয়-সামাজিকানাং যত্নাতিশয়েন পুনস্তৎপ্রতিষ্ঠায়াঃ সূত্রপাতো লক্ষ্যতে। সাম্প্রতমস্মিন্ রমণীয়েঽবসরে বিলুপ্তপ্রায়েয়ং সংস্কৃতভাষা যথাপূৰ্ব্ববদুৎকর্ষপদবীমধিরোহেৎ যথাচ পূৰ্ব্ববন্মনোহরকলেবরধারিণী সকলসামাজিকানাং মনাংস্যানন্দরসসরসীসু নিমজ্জয়েৎ বিদ্যানুরাগিমহোদয়ৈৰ্ব্বিবিধবিষয়গোচরয়া রচনয়াসমালোচনেনান্যবিধৈশ্চ বহুভিরুপায়ৈঃ সৰ্ব্বথা তথৈব প্রযতনীয়মিতি।

অয়ি! সংস্কৃতভাষাজননি। বিমুঞ্চনিদ্রাং সাম্প্রতমবসিতপ্রায়াতে চিরদৌর্ভাগ্যবিভাবরী। পশ্য! রাজপুরুষগণোৎসাহকিরণৈৰ্ব্বিকাসরন্ সহৃদয়হৃদয়কমলান্যুদয়তি ভারতাম্বরতলে পুনস্তে সৌভাগ্যভানুঃ; শ্রূয়ন্তেঽধুনা সকল বিদ্যালয়োদ্যানেষু বালকবিহঙ্গমোচ্চারিতাঃ শ্রবণসুভগঃ স্তবগুণগীতয়ঃ বিকির্য্যন্তেচ দিশি দিশি পণ্ডিত কুসুমজন্মানঃ সদ্‌গুণমধুরমকরন্দাঃ

সদুপদেশবিমলানিলৈঃ। দেবি! পরমানন্দসন্দোহময়ি! সাম্প্রতমস্মিন্নতিরমণীয়ে মুহূর্ত্তে সকৃদুন্মীলয়তে তদেব নয়নং যেনাবলোকিতা ত্বয়া বাল্মীকিকালিদাসভবভূতিপ্রভৃতয়ঃ, অদ্য ত্বৎপুত্রাঃ পীযূষরসতিরস্কারি পীত্বা পীত্বা তব কাব্য-পয়োধররসমিহ ভূলোকেঽপি কামপ্যনুভবন্ত স্বর্লোকসুলভাং দশাং।

ভারতভূমেরুন্নতিবিষয়িণী সংস্কৃত রচনা

(কৃষিঃ)

যেয়ং ভারতভূমিরুর্ব্বরতয়া জিত্ব সমস্তং জগৎ
সূতেদুর্লভশস্যরত্নমখিলং স্বল্পে প্রয়াসে কৃতে।
স্বাধীনং কৃষিকর্ম্ম গৌরবকরং তস্যাবিহায়াধুনা
রে রে ভারতবাসিনঃ পরবশা হা ধিক্! কথংজীবথ॥

লোকোত্তরেণোর্ব্বরতাগুণেনৈব রত্নপ্রসবেতি ভারতভূমের্নাম। যেন গুণেনেয়ং কৃষিবিদ্যানভিজ্ঞা-নামপি কতিপয়ানাং স্বল্পবুদ্ধি কৃষকাণামতিসামান্যপ্রয়াসে নৈবানন্তং সশ্যরত্নং সূতে। যদিপুনরত্র লোকসংস্থিতিকরে স্বাধীনে কৃষিকর্ম্মণি বিদ্যাবন্তঃ কৃতধিয়োঽধুনা প্রযত্নম বলম্বন্তে তদা ন জানেঽস্মাকং জন্মভূমিরচিরেনৈব কামপ্যচিন্তনীয়ামলোকসাধারণীমুন্নতিসরণীমনুসরেৎ অসংশয়ঞ্চ দুর্ভিক্ষ দারিদ্র্যাদিকমপি ন প্রভেদস্যাঃ সকলরত্নৈকভূমিরিতি ভুবনোজ্জ্বলং নাম দূষয়িন্নতুং। কিন্ত্বস্মদ্ভাগ্যদোষাৎ কেচিদনভিজ্ঞা নিকৃষ্টজনাএব তস্মিন্নতিগুরুতরে কৃষিকর্ম্মণি নিযুক্তাঃ কৃতবিদ্যাস্তু মৃত্যুমিব দ্বিতীয়ং, পরভৃত্যভাবমেব গৌরবমিতিমন্যমানা নিঘৃণা ইব কাপুরুষাইব কালং নয়ন্তি। অহো! ধিগস্মাকং বিদ্যার্জ্জনং যস্যৈবম্বিধঃ পরিণামঃ।

ক্বয়ং বহুকুসংস্কারোপহতচিত্তবৃত্তয়ঃ ক্বচাস্মাকং নিখিলগুণভূময়ঃ পূর্ব্বপুরুষাঃ। বয়মধুনা নিজনিয়মচারাদি দোষৈস্তেভ্যোহীনতরাঃ কেচিদ্ভিন্নজাতীয়া ইব সঞ্জাতাঃ। নাসীদ্বেম্বিধ নীচতাস্মাকং মহাত্মনাং পূর্ব্বপুরুষাণাং, কৃষি-কর্ম্মাদিষু তেষামেব সর্ব্বথাযত্নাতিশয়েনেয়ং ভারতভূমির্জনানামসীমসুখ-সৌভাগ্যানি সূতবতী আসীত্তেষাং পরমশ্লাঘাকরেঽস্মিন্ কৃষিকর্ম্মণ্যে তাদৃশোঽনুরাগোযত্তে নিতান্ত-বিশ্বাসপদেষ্বপি করণীয়েষ্বপরান্ নিযোজ্য স্বয়মেব কৃষিং নির্ব্বাহয়ন্তিস্ম [১]।

ভারতবর্ষেঽস্মিন বহবোদৃশ্যন্তে দেবমাতৃকাঃ প্রদেশাঃ। কৃষিকর্ম্মণি তদ্দেশবাসিনঃ কৃষকাশ্চাতকাইব তৃষ্ণাতুরা জলদজলমেবাপেক্ষন্তে। এবং দৈববলম্বমানানাং তেষাং জনপদেষ্ব বৃষ্টিজনিতশস্যনাশেন প্রায়েণ প্রতিবর্ষমেব শ্রূয়তে হৃদয়বিদারী দুর্ভিক্ষকৃতহাহারবঃ। এবম্বিধেষু দেশেষু যথাকালং সলিল-সেচনায় ক্ষেত্রেষু খাতকূপাদিকান্যবশ্যমেব করণীয়ানি। এবং কৃত্বে ন খলু তেষাং দৈবনিরপেক্ষাণা মাপতেয়ু স্তথাবিধাবিপদঃ প্রাণযাত্রাচ সর্ব্বেষাং নদীমাতৃকদেশবাসিনামিব বিনায়াসেনৈব ভবেৎ। তথাবিধখাতকূপাদি খননক্রিয়াপি ন কেবলং কতিপয়ানামল্পবুদ্ধি কৃষকাণাং চেষ্টয়া সম্ভবতি, সাহি তদ্দেশবাসিনাং ভূমধ্যিকারিণামন্যেষাঞ্চ স্বদেশহিতব্রতদীক্ষিত সুশিক্ষিত জনানামপেক্ষতে যত্নং।

---

১. "পিতুরন্তঃপুরে দদ্যান্মাতুর্দ্দদ্যান্মহানসে।
গোষু চাত্মসমংদদ্যাৎ স্বয়মেব কৃষিং ব্রজে॥"

ভারতভূমেরুন্নতিবিষয়িণী সংস্কৃত রচনা

(বাণিজ্যং)

সৌভাগ্যং যদি গৌরবং যদি পরাং খ্যাতিং সমৃদ্ধিং যদি
প্রাধান্যং যদি চান জাতসুলভং লব্ধু মতির্জায়তে।
লক্ষ্মীবন্ধনদামবৎ সুখসরঃ সোপানসন্তাবৎ বাণিজ্যং
পরমঙ্গভারতজনাঃ সর্ব্বাত্মনা সেব্যতাম্॥

অহো! কোঽপ্যচিন্তনীয়ো মহিমা বাণিজ্যস্য! যৎপ্রসাদাদিংলগুদেশীয়াঃ কামপ্যতিনীচতমাং তমোময়ীমবস্থাং বিহায়াচিরেণৈবাভ্যুদয়মহাগিরিশিখরে পদমাদধীনাঃ সাম্প্রতমধঃকৃতসকলকুসংস্কারাম্বুদাঃ কল্যাণরবেঃ পরমসুখালোকমহরহঃ সেবন্তে, যৎপ্রসাদাত্তেষাং ভস্মীকৃতসকলবিপক্ষকুল- শলভো দিশি দিশি প্রসরত্য তিদুঃসহঃপ্রতাপবহ্নিঃ, যৎপ্রসাদাদতি বিশালেয়ং ভারতভূমি স্তেষাং দিগ্‌দিগন্তব্যাপিনা সমতিক্রান্তদুস্তরসাগরগিরিকাননেন মহতা বিজয়রবেণাপুরি, যৎপ্রাসাদাচ্চতেষাং সৌভাগ্যলক্ষ্মীভুবনবিজয়িনীতি বিশ্রুতা জগতি। যদা বিপুলসমৃদ্ধিপদমিদং বাণিজ্যং ভারতবাসি- নামুপজীব্যমাসীত্তদেয়ং ভারতভূমিরপি সর্ব্বেষামনন্তসুখৈকস্থানং বভূব। সাম্প্রতং যদিদমাপতিত- মনন্তদৌর্ভাগ্যং ভারতবাসিনাং, তত্তেষাং সকলসৌভাগ্যৈকনিদানে বাণিজ্যে বীতরাগিতয়ৈব। তদস্মিন্ যাবৎসর্ব্বসাধারণজনগণানাং ন জায়তেঽনুরাগ স্তাবৎ সুদূরপরাহতৈব ভারতভূমেঃ সৌভাগ্যলক্ষ্মীঃ, যাবচ্চাস্মদ্দেশীয় সুশিক্ষিতাজনা দারুণদৌর্ভাগ্যবারণদমনাঙ্কুশমিবেদং বাণিজ্য মনাদরকটাক্ষেণেক্ষমাণাঃ পরভৃত্যভাবেনৈব কথমপ্যতি কৃচ্ছ্রেণ জীবনযাপনমেব সকল শিক্ষাফলর্মিত্যামনন্তি তাবদ্বিড়ম্বনৈবাস্ম- জ্জন্মভূমেরভ্যুদয়াশা। ভো ভো! ভারতবর্ষীয়াঃ! নিখিলসৌভাগ্যদ্বারমিদং বাণিজ্যং সুচিরমযত্নকপাটনি- বদ্ধংকৃত্বা স্বচ্ছন্দমতিদুর্গতিশয্যাশয়ানানাং মনসিভবতাং ভবতি ন কি মহোধিক্কারঃ? ভবতামেব পুরাতননিয়মাচারশাস্ত্রাদীনামনুসরণেন বিদেশীয়াঃ সর্ব্বে ক্রমেণাসীমামুন্নতিং লভন্তে, ভবন্তস্তু সততমালস্যকুসংস্কারাদিদোষবশীকৃতমানসাঃ সরিৎপ্রবাহাইব গিরিশিখরসম্ভবাঃ প্রতিদিনমধোগতিমেব লব্ধুমারভন্তে। কদা বাণিজ্যাদিকল্যাণকর্ম্মানুসরণক্রমেণ বিদিতাখিল সভ্যজাতিব্যবহারাণাং ভবতাং জ্ঞানবিমলীকৃতেভ্যো মানসেভ্যস্তমাংসীব দিনকরকরভাসুরেভ্যা দিঙ্‌মণ্ডলেভ্যো জাতিভ্রংশকারী জলধিযাত্রা ধর্ম্মলোপকরী বিজাতিবিদ্যা বৈধব্যকরী কামিনীজন- শিক্ষেত্যাদিকুসংস্কারশতান্যপযাস্যন্তি কদা বা প্রণয়-জল-মরুস্থলীব বহুবিবাহ রীতিরুন্নতি-লতা কুঠারইব বাল্যপরিণয়ঃ পাপ-হুতাশন- হবিরিব বিধবোদ্বাহ-নিবারণমেতে চান্যেচাতিহেয়তমা দেশাচারা দূরীভবিষ্যন্তি ভবতাং হৃদয়েভ্যঃ।

ভারতভূমেরুন্নতিবিষয়িণী সংস্কৃত রচনা

(রাজনিয়মঃ)

সর্ব্বান্ সোদরবৎসমীক্ষ্য চ করানুৎসার্য্য পীড়াকরান্
সর্ব্বেভ্যোনিজজাতিতুল্যবিভূতাং দত্বাখিলেকর্ম্মণি।

হং হো! ভারতবাসিনামহরহঃ কল্যাণকার্য্যেরতা
ইংলণ্ডীয় দয়ালুরাজপুরুষা! কীৰ্ত্তিশ্চিরং রক্ষত॥

প্রজাপালনকর্ম্মণি নিযুক্তানাং রাজপুরুষাণাম পক্ষপাতিনিয়মৈঃ সর্ব্বথা প্রজানুরঞ্জনমেব পরমোধর্ম্মঃ। যদদ্যাপি সর্ব্বে সকল ভুবনতলবিশ্রুতযশসঃ শ্রীরামচন্দ্রস্য নামশ্রবণমাত্রেণৈবা-পূর্ব্বভক্তিরসবিহ্বলীকৃতমানসাঃ কামপি হর্ষর্জ্জরাং দশামনুভবন্তি তত্তস্যৈব রঘুবংশাবতংসস্য রাজকুলকেশরিণঃ প্রজারঞ্জনানুরাগাদেব। যদদ্যাপি সর্ব্বে পবিত্রকীৰ্ত্তেরাকবরনৃপবরস্যাধিকারকালং স্মরন্তঃ সপদি সঞ্জাতপুরকাঃ কৃতজ্ঞতারসাদ্রীকৃতহৃদয়াশ্চ মুঞ্চতি নয়নসলিলমজস্রং, তত্তস্যৈবরাজ্ঞো যবনকুলপ্রদীপস্য রাজনিয়মেম্বপক্ষপাতিতয়ৈব। অতএবানুরক্তাসু প্রজাসুরাজ্যমপগতসকলবিঘ্নান্ধকার মুদিতসৌভাগ্যদিনকরশ্চালৌকিকসুখৈকভবনং সঞ্জায়তে, জাগৰ্ত্তিচাক্ষয়কালংব্যাপ্য রাজ্ঞঃকল্পান্তস্থায়িনী কীর্ত্তিঃ।

হং হো! ভারতভূমেঃ শাসনকর্ম্মণি নিযুক্তা রাজপুরুষাঃ! জেতৃজাতিসুলভামবজ্ঞাং বিহায় ভবন্তঃ স্বজাতিনির্ব্বিশেষেণ সর্ব্বেম্বেব প্রধানপদেষু ভারতবাসিনামধিকারমাজ্ঞাপরন্তু, ব্যবহারন্তু চ তান্ প্রতি তথা যথাত্মন স্তে বিজিতানিতি ন জানন্তি, ভবন্তু সহায়াস্তেষাং সর্ব্বদা সকলকল্যাণবর্দ্ধণে দদন্তু চ তেভ্যঃ স্বাধীনতাং শরীররক্ষাসাধনেষু শস্ত্রব্যবহারাদিষু; অন্যথা ভারতবাসিনঃ সর্ব্বে ভবদ্বিধসভ্যতমজাতীয়ানামধিকারে নিবসন্তোঽপি সার্গলমখিলোন্নতিদ্বারং জ্ঞাস্যন্তি, দূষয়িষ্যতি চ ভবতামকলঙ্কযশঃশশাঙ্কং তেষাং চিরদৌর্ভাগ্যকলঙ্ক ইতি।

ভারতভূমেরুন্নতিবিষয়িণী সংস্কৃত রচনা

(উপসংহার)

অয়ি মাতর্ভারতভূমি। ত্বংপুরাধর্ম্মেণ বিদ্যয়া নিয়মেনাচারেণ সমৃদ্ধ্যা প্রভাবেন গৌরবেণ চ ধরণ্যাং প্রাধান্যমনন্যসুলভমযাসীঃ, সাম্প্রতং ক্ষীণপুণ্যানাং মন্দভাগ্যানামমীষাং তব পুত্রাণাং দোষেণোপস্থিতোঽয়মহহ। তে কোপ্যরিচিতপূর্ব্বো বিষমো দশাবিপর্য্যাসঃ!

মাতর্ভারতভূমি! সর্ব্বসুকৃতস্যাভূঃ প্রসূতিঃ পুরা
ত্বমামাখিললোকবিশ্রুতাভূদ্বিদ্যাযশোভিস্তদা।
যাতা স্তে দিবসা স্তথা সুখময়াঃ স্মৃত্বাম্ব! তান্ সাম্প্রতম্,
হাহা! কস্য ন মানসং বদ মহাশোকাম্বুধৌমজ্জতি?॥১॥
হা! মাতঃ ক্বগতা মহারথরঘুশ্রীরামকর্ণাদয়ো-
র্যৈর্ব্বীর প্রসবেতি কীর্ত্তিরজনি ত্রৈলোক্যমধ্যেতব।
তেষাং যানধুনা বিভর্ষি তনয়ান্ দূরেঽস্বহো! বীরতা
বেপন্তে গুরুভাতিপাণ্ডুবদনাঃ সংগ্রামনাম্নৈব তে॥২॥
মাতঃ! কুত্র গতা যুধিষ্ঠিরহরিশ্চন্দ্রাদয়ো ধার্ম্মিকা
যেষামাছুরগণ্যপুণ্যচরিতৈস্ত্বাং পুণ্যভূমিং ভুবি।

যে পুত্রা স্তব সাম্প্রতং জননি! কিং পাপং ন কুৰ্ব্বন্তি তে
হা হা হন্ত! ন কস্য দীর্য্যতিমনো দৃষ্টা তবেমাং দশাম্॥৩॥
পুত্রৈঃ পাণিনি গৌতম প্রভৃতিভিস্তে পূর্ব্বজাতৈঃপুরা
বিদ্যাভূমিরিতি প্রসিদ্ধিরজনি ত্রৈলোক্যমধ্যেতব।
মাত স্তে তদনন্তমক্ষয়মহো! লোকোত্তরং গৌরবম্
নানাদোষপরায়ণৈস্তবসুতৈ র্হা হা ধুনা হারিতম্॥৪॥
সাবিত্রী জনকাত্মজাদিরমণীরত্নানি জাতানি তে
গর্ভে যৎসুচরিত্র কির্ত্তনরবেণাপূরি বিশ্বম্ভরা।
যাতা স্তা গুণভূষিতা দুহিতর স্তে কন্যকাঃ সাম্প্রতম্
ঘোরাজ্ঞানবশা নয়ন্তি দিবসানালস্যনিদ্রাদিভিঃ॥৫॥
মাতঃ! সূতবতী ত্বমেব হি পুরা বাল্মীকিপারাশরৌ
যদ্রামায়ণভারতামৃতরসেনাদ্যাপি মুগ্ধং জগৎ।
নো জানে ত্বয়ি সাম্প্রতং নিপতিতঃ কোবাভিশাপো মহান্
যেনৈকোঽপি মহাকবির্জননি তে গর্ভে ন সঞ্জায়তে॥৬॥
রত্নানামিব কৌস্তুভং জলধিনা মাতঃ কবীনাংত্বয়া
যংলব্ধাভুবি কালিদাসমখিলেঽনন্তং যশঃসঞ্চিতম্
হা হা! তাদৃশ পুত্ররত্ন মখিলক্ষৌণী মহাভূষণম্
ত্যক্তাদ্যাপি করাল কালবদনে মাতঃ কথং জীবসি॥৭॥
ত্বগ্দর্ভে ভবভূতি রক্ষয়যশাশ্চন্দ্রঃ সুধাব্ধৌ যথা
জাতো যস্য মনোজ্ঞকাব্যকিরণৈরালোকিতংক্ষ্মাতলম্।
কালে হন্ত! কৃতান্তরাহুবদনং তস্মিন কবীন্দৌগতে
সম্প্রাপ্তং মলিনং কবিত্ব কুমুদং হা! শৌচনীয়াং দশাম্॥৮॥

পরাধীনাম্ মগ্নানতি-বিপুলদুঃখাম্বুধিজলে
বলক্ষীণান্ হীনান্ সকলসুখসৌভাগ্যনিচয়ৈঃ।
কৃপাসিন্ধো! নাথ! ত্রিভুবনগুরো! ভারতজনান্
সকৃদ্দীনানেতান্ প্রতি বিতর কারুণ্যকণিকাম্॥

হিন্দুমেলার উদ্দেশ্য বিষয়ক বক্তৃতা

হে সভাস্থ সম্ভ্রান্ত মহাশয়গণ!

সম্বৎসরের পর আমরা অদ্য আবার পুনশ্চ মিলিত হইলাম, অতএব কি আনন্দ! সম্বৎসরের পর অদ্য আবার "চৈত্রমেলা" দ্বিগুণ উৎসাহে—দ্বিগুণ সমারোহে অনুষ্ঠিত হইল, অতএব কি সৌভাগ্য! যেমন এক ঋতুর বর্ষণদ্বারা বসুমতীকে সকল ঋতুতেই সরস রাখে, তেমনি এই একদিনের সমাবেশ দ্বারা আমাদিগের মনকে সম্বৎসরকাল সুপ্রসন্ন রাখিতেছে! বসুমতীর আকর্ষিত সেই রস যেমন অদৃশ্যভাবে ফল মূল শস্যোৎপাদনের কারণ হয়, তেমনি এই মেলারূপ সমাবেশটি অজ্ঞতাভাবে আমাদিগকে উন্নতিপ্রসবের ক্ষমতা দান করিতেছে। কুজ্ঝটিকার পর নবোদিত অরুণকে দেখিয়াই যেমন মাধ্যাহ্নিক মার্ত্তণ্ডের প্রখর দীপ্তি অনুভব করিতে পারা যায়, তেমনি হিন্দুসমাজের বহু বিশৃঙ্খলার পর এই মেলার আবির্ভাব দেখিয়াই ইহার ভবিষ্যৎ প্রভাব অনুভূত হইতেছে! বীরসিংহ পুরুষের বাল্যাবস্থার লক্ষণ দর্শনেই যেমন দুরদর্শীলোকে তাহার ভাবিজীবনকে নখদর্পণের ন্যায় দেখিতে পান, তেমনি এই মেলার আদ্যাবস্থার সুলক্ষণসমূহ ঈক্ষণ করিয়াই ইহার ভবিষ্যৎ মাহাত্মের সুস্পষ্ট পরিচয় পাওয়া যাইতেছে।

ভাবিয়া দেখুন, জন্মবৎসরে ইহা কিরূপ ছিল? পরবৎসর কিরূপ সম্বর্দ্ধিত হইয়াছে? এবং এ বৎসরে কি পরিমাণেই বা উন্নত হইতে পারিয়াছে? জন্মদিনে কেবল কতিপয় বান্ধব ও প্রতিবেশীমাত্র উৎসাহী ছিলেন, অর্থাৎ নিজবাটীর লোক ও নিজ কুটুম্ব বই নয়, কিন্তু দ্বিতীয় উৎসবে গ্রামস্থ এবং অদ্য এই তৃতীয় বার্ষিক উৎসবে চাকলাস্থ লোক আকর্ষিত হইয়াছেন, এরূপ উপমা অনায়াসে খাটিতে পারে। দেশহিতৈষী সম্প্রদায়ের এইরূপ সদুৎসাহ, সদাগ্রহ এবং সৎসঙ্কল্প দৃষ্টি করিয়া কাহার অন্তঃকরণ না আপনা হইতেই সুখতরঙ্গে মগ্ন এবং আশাগগনে উত্থিত হয়? আমরা যে এ প্রকারে একত্রিত হইব, এরূপ স্বজাতীয় অনুষ্ঠান দ্বারা স্বজাতির বিলুপ্ত নাম, বিনষ্ট গৌরব এবং বিপর্য্যস্ত একতার পুনরুদ্ধারে যত্নশীল হইব, তাহা কিছুদিন পূর্ব্বে কাহার মনে ছিল? অতএব আজ যে কি সুখের দিন এবং এই মেলা যে হিন্দুজাতির কত আরাধ্য বস্তু, তাহা বাক্যেও নয়, লেখনীতেও নয়, কিছুতেই প্রকাশ করিবার নয়, ধ্যান ভিন্ন হৃদ্বোধ হইবার উপায় নাই।

কিন্তু এখনও ইহার অতি তরুণাবস্থা,—বলিষ্ঠ ও দ্রঢ়িষ্ঠ করিতে এখনও বিস্তর আয়াস, অনেক সময় লাগিবেক। এখনও দেশের সকল লোকে ইহার যে কি মঙ্গলগর্ভ তাৎপর্য্য, তাহার মর্ম্মজ্ঞ হয়েন নাই, ইহার যে কি অনুপম গুণ, তাহার গুণজ্ঞ হইতে পারেন নাই। তাহা দূরে থাকুক, এখনও সকলে ইহার নামও শ্রবণ করেন নাই। যাঁহারা শুনিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে অনেকে ইহার উদ্দেশ্যও জানিতে পারেন নাই। যাঁহারা কতক জানিয়াছেন, তাঁহাদের অনেকে আবার ইহাকে সামান্য কৌতুক ও আমোদের স্থান বলিয়াই জানিয়াছেন, দেশের মঙ্গলভূমি বলিয়া বুঝিতে পারেন নাই। যাঁহার

কতক বুঝিয়াছেন, তাঁহারা এখনও ইহার প্রতি এবং ইহার স্থায়িত্বের প্রতি সম্পূর্ণ বিশ্বাস করেন নাই। যাঁহারা বিশ্বাস করিয়াছেন, তাঁহাদের অধিকাংশই এখনও ইহাকে সেইরূপ প্রেমচক্ষে দেখেন নাই, যেরূপ প্রেমদৃষ্টি ভিন্ন কোনপ্রকার শুভব্রতে সর্ব্বান্তঃকরণে ব্রতী হওয়া অসম্ভব! অতএব এই মেলা "মহামেলা" নাম পাইতে এবং যথার্থ জাতীয় মেলা রূপে গণ্য হইতে এখনও কত দিনের, কত যত্নের, কত অর্থের, কত উৎসাহের, কত উপদেশের অপেক্ষা করিতেছে, তাহা সংখ্যা করা যায় না। যখন দেখিবেন শারদীয় মহাসপ্তমীর ন্যায় এই মেলার দিনকে সকল হিন্দু মহামহোৎসবের দিন মনে করিতেছে; যখন দেখিবেন দুর্গোৎসবের জন্য লোকে যেমন নব নব বসন ভূষণ ক্রয় করিতে মহাব্যস্ত ও ঋণগ্রস্তও হইয়া থাকে, তেমনি এই মেলায় আসিবার জন্য—ইহার অনুষ্ঠানভাগী হইবার জন্য সকল নগরে—সমুদায় গ্রামে, প্রত্যেক ঘরে, সকলেই মেলার বহুদিন পূর্ব্বাবধি মহাব্যস্ত হইতেছে এবং অন্তঃপুরচারিণীরাও স্বামী পুত্র ভাই বন্ধু প্রভৃতি আত্মীয়গণকে পাঠাইবার জন্য সমুৎসুকা হইতেছে; যখন দেখিবেন, যাহার যেরূপ সাধ্য যাহার যেরূপ বিদ্যা, যাহার যেরূপ ঐশ্বর্য্য, যাহার যে কিছু গুণপণা, সে এই সমাজস্থলে আসিয়া তাহা প্রকাশ করিতেছে; যখন দেখিবেন অবস্থার তারতম্য রহিত হইয়া ছোট বড় সকলেই উৎসবের সমভাগী হইতেছে; যখন দেখিবেন, এই মেলার নিষ্পাদিত বিচার এবং ইহার প্রদত্ত পুরস্কারকে গুণিগণ, শিল্পীগণ ও কৃষকগণ প্রভৃতি প্রদর্শকমণ্ডলী শিরোধার্য্য করিতেছে। যখন দেখিবেন, আপাততঃ যাঁহারা ইহাকে ঈষৎ বক্রদৃষ্টিতে অথবা সম্পূর্ণ সন্দেহ-দৃষ্টিতে দর্শন করিতেছেন, তাহারাও আসিয়া মিলিত হইয়াছেন, তখনই জানিবেন, এই মেলা যথার্থ "জাতীয় মেলা" নাম পাইবার যোগ্য হইয়াছে—তখনই জানিবেন এই সমাবেশক্ষেত্র যথার্থই স্বজাতীয় গৌরব-ভূমি হইয়া উঠিয়াছে! কিন্তু কি কি উপায়ে ও কি ক রূপ কৌশল অবলম্বন করিলে এই শুভানুষ্ঠান সেই উন্নতির উচ্চ শিখরে অধিরোহণ করিতে সমর্থ হইবে, তাহার আলোচনা অতি কর্ত্তব্য।

প্রকৃতির অচ্ছেদ্য নিয়মানুসারে সকল বিষয়েরই ক্রমশঃ উন্নতি হইয়া থাকে। এক দিনে কিছুই হয় না। এবং সেই পর পর উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে যখন যেরূপ অবস্থা, তখন তদুপযুক্ত উপায়াদিই উদ্ভাবিত হইতে পারে। বর্ত্তমান অবস্থানুসারে এই মেলাদ্বারা বৈজ্ঞানিক, দার্শনিক এবং রাজকীয় উন্নতি সম্ভবে না, সুতরাং তদালোচনাও বৃথা। বর্ত্তমান অবস্থানুসারে ইহ দ্বারা শিল্প, কৃষি এবং উদ্যান বিষয়ক উন্নতি সম্ভবে। দৈহিক ও সামাজিক উন্নতিও কিয়দংশে সম্ভবপর হয়। এবং সাহিত্য, কবিত্ব ও বাগ্মীত্ব বিষয়েও অনেক উৎসাহ হইতে পারে। ইহার প্রত্যেক বিষয়ের পৃথক্ পৃথক্ সমালোচনা করাই আবশ্যক, কিন্তু প্রস্তাবের প্রাচুর্য্যভয় তাহার বিশেষ প্রতিবন্ধক। এক দিনের অধিবেশনে তাহার সূক্ষ্মানুসন্ধান কেবল বৈরক্তিরই কারণ হইবেক, সুতরাং প্রধান ২ কয়েকটী বিষয়ে সাধারণ্যে কিঞ্চিৎ বলিয়াই ক্ষান্ত হইব। ইহাতে যে ক্ষোভ থাকিল, তাহা ঈশ্বরানুগ্রহে পরবৎসর নিবারিত হইতে পারিবে।

প্রথম। প্রদর্শনের সামগ্রী।

মেলাস্থলে প্রদর্শয়িতব্য দ্রব্য সম্বন্ধে বক্তব্য এই, যখন জাতিসাধারণের উন্নতি প্রার্থনীয়, তখন স্বজাতীয় শিল্পীগণের হস্তসম্ভূত ও যন্ত্রসম্ভূত দ্রব্যাদি প্রদর্শন করাই সর্ব্বাগ্রে উচিত। আমাদের

রমণীগণ বিলাতি আদর্শানুবর্ত্তিনী হইয়া যে সকল সূচিকর্ম্ম ও সামান্য ২ কারুকার্য্য প্রস্তুত করিতেছেন এবং যে সকল ইউরোপীয় প্রতিরূপ চিত্র করিতে শিখিয়াছেন, তাহার অভিনয় দ্বারা সম্যক্ ফল লাভের সম্ভাবনা নাই। ব্যবহার পক্ষে সেই সকল শিল্পকর্ম্মের উপযোগিতা অতি অল্প, না সংসারের কাজে লাগে, না সমাজের উপকারে আইসে। তাহার প্রচুরতর সংগ্রহ দ্বারা তৎপ্রতি প্রচুরতর উৎসাহ দেওয়াই হয়; তদ্দ্বারা পাকতঃ দেশের পূর্ব্বতন শিল্পকার্য্যকে সম্পূর্ণ অনাদর করা হইয়া উঠে। আমাদের সংসারের শৃঙ্খলা চিন্তা করিলে বিলক্ষণ বোধ হইবে, যে অতি অল্প সংখ্যক ধনীলোকের ভবন ভিন্ন আর সকল ঘরেই পুরন্ধ্রী গৃহিণীগণকে সংসারের তাবৎকর্ম্ম সমাধা করিতে হয়। সেই সব নিত্য কর্ম্ম ব্যতীত "বারমাসে তের পার্ব্বণও" আছে। তেরটী কেন, চার তেরং বায়ান্নটী বলিলেও বলা যায়। এই সমুদায় ক্রিয়াকলাপের সমুদায় আয়োজন তাঁহাদিগকে স্বহস্তে করিতে হয়। জ্ঞাতিকুটুম্বের ভূরি ভোজের দিন, অন্য জাতীয়ের ন্যায় ভোজ্যদ্রব্য, ভোজ্যবিক্রেতার দোকান হইতেও আইসে না, ভৃত্যবর্গ দ্বারাও প্রস্তুত হইতে পারে না। দশজনকে খাওয়াইতেও যেমন, দশ সহস্রকে খাওয়াইতেও সেইরূপ। একটী জামাই বাটীতে আইলে পল্লীগ্রাম-বাসিরা প্রায় কোন দ্রব্যই ক্রয় করেন না। পুরস্ত্রীবর্গ আহ্লাদপূর্ব্বক ক্ষীরের ছাঁচ, চন্দ্রপুলি, ক্ষীরেলা, সরভাজা, ছানা, মাখন, পায়েস, পিষ্ঠক প্রভৃতি অমৃতাস্বাদ চর্ব্ব্য চূষ্য লেহ্য পেয় প্রস্তুত করিতে দেন; যাহা পাইলে সর্ব্বদেশীয় সম্ভোক্তা মাত্রেই দুর্ল্লভ জ্ঞানে ভোজনে তৃপ্তি পাইতে পারে। অনতিপূর্ব্বকালের রমণীরা নিত্য গৃহকর্ম্ম সমাপন করিয়া যে অবকাশ পাইতেন, সে সময় কড়ির আন্‌লা, দড়ির শিকা, রেশমের শিকা, সিন্দুরচুপড়ি বুনা, সূতা কাটা, সেলাই ফোড়াই অথবা ছাঁচকাটা প্রভৃতি দৃশ্যমনোরম অথচ ব্যবহারক্ষম দ্রব্যাদি নির্ম্মাণে নিযুক্তা থাকিতেন। এখনও ইহার অনেক দ্রব্য অনেকের ঘরে—বিশেষতঃ পল্লীগ্রামে—প্রস্তুত হইয়া থাকে। তদ্দ্বারা আমরা বহুমূল্য সেগুণ ও মেহাগ্নি কাষ্ঠাধার প্রভৃতির ব্যয় হইতে বহুলাংশে আসান পাই। যাঁহাদিগকে এত কাজ করিবার আছে, তাহাদিগকে তাহা হইতে নিরস্ত করিয়া আলস্যজনক বিফল কার্‌পেটের কাজে বেশী উৎসাহ দেওয়া কোন মতেই শ্রেয়ঃ নহে। যদি সূচিকর্ম্ম শিখাইতেই হয়, তবে স্বামী পুত্রের ব্যবহারযোগ্য বস্ত্রাদি প্রস্তুত করিবার শিক্ষা দেওয়াই কর্ত্তব্য। সেই সঙ্গে অল্প পরিমাণে বিলাতি কাজ থাকে থাকুক, হানিও নাই। নচেৎ সুদ্ধ বিলাতি অনুকরণের পক্ষপাতী হইয়া মহোপকারী প্রাচীন আদর্শকে পরিত্যাগ করাতে অপকার ভিন্ন কোন উপকার দেখিতে পাই না। সুদ্ধ অনুকরণ দ্বারা কোন জাতির উন্নতি হয়ও নাই, হইবেও না। বিশেষ যাহারদিগের পূর্ব্বসমাজ ও পূর্ব্বসভ্যতার অনিবার্য্য পরাক্রম অদ্যাপি দেদীপ্যমান আছে, তাহাদের মধ্যে বিপরীত ভাবাপন্ন অপর দেশীয় সভ্যতার প্রচলন শুভও নয় সুসাধ্যও নয়, সুসিদ্ধ হইবারও নয়। বরং পূর্ব্বকার সেই সকল শিল্পাদির সংশোধন ও উন্নতি করিবার চেষ্টা করা উচিত। এবং যদি বিদেশীয় এমন কোন কারুকার্য্য থাকে, যাহা আমাদের সংসারের পক্ষে বিশেষ উপযোগী এবং সুষমা ও রুচি বর্দ্ধক তবে তন্মাত্রকেই গ্রহণ করা যাইতে পারে। সুদ্ধ স্ত্রীশিল্প কেন? সাধারণ শিল্প সম্বন্ধেও এই কথা খাটিতে পারে। ফলতঃ সকল বিষয়েই এই সিদ্ধান্তটী স্মরণ রাখিতে হইবে যে, ইউরোপীয়দের স্বাবলম্বন ও উদ্যোগটী আমাদের অনুকরণীয় বটে, কিন্তু, কার্য্যসাধন-প্রণালী ও ঘরসংসারের রীতি-নীতি গৃহীতব্য নহে। এই মীমাংসাকে সম্মুখে রাখিয়া এই মেলার প্রদর্শন-গৃহ সজ্জিত করা উচিত। বিশেষতঃ যখন স্বদেশীয় লোক ও স্বদেশীয় উদ্যোগ

দ্বারা স্বদেশের শ্রীবৃদ্ধি সাধনোদ্দেশেই ইহা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, তখন অগ্রে স্বদেশীয় শিল্পবিদ্যার সংস্কার, উত্থান ও নবযৌবন সম্পন্ন করিবার চেষ্টা করাই অত্যাবশ্যক হইতেছে। এ বৎসর পুরস্কারের সুগম উপায় অবধারিত হইয়া অতি উত্তমই হইয়াছে। কিন্তু যাহা হইয়াছে, তাহা যথেষ্ট হয় নাই, আরো অধিক প্রয়োজন। এমন অর্থ সংগ্রহ করিতে হইবে, যদ্দ্বারা রাজধানীর সন্নিকট স্থান হইতে আরম্ভ করিয়া, সমস্ত বঙ্গদেশ তৎপরে ক্রমে ক্রমে অঙ্গ, কলিঙ্গ, সৌরাষ্ট্র, মহারাষ্ট্র, কাশী, কাশ্মীর, পঞ্জাব, অযোধ্যা প্রভৃতি সমস্ত প্রদেশের শিল্পী, কৃষক ও উদ্যানপালক যথোপযুক্ত রূপে পুরষ্কৃত হইতে পারে। সেই পুরস্কারের আকর্ষণে বিবিধ জনপদজাত, অথবা বন পর্বত আকর সাগর সম্ভূত ভারতের অতুল্য অমূল্য শিল্পজাত ও প্রাকৃত বস্তু সকল এক স্থানে প্রদর্শিত হইয়া প্রতিযোগিতা বৃত্তির উত্তেজনা করিয়া দিতে পারে। এত সুদীর্ঘ আশা করা, এক্ষণে দুরাশাবৎ বোধ হইতেছে, কিন্তু সাধনার অসাধ্য কিছুই নাই। যদিও সমুদায় সুসিদ্ধ হওয়ার কাল এখনও দূরবর্ত্তী তথাপি এক্ষণে যে সকল দ্রব্যাদি সহজ-প্রাপ্য এবং যাহা প্রদর্শন দ্বারা আশু উপকার ও ভবিষ্যতের উৎসাহ জন্মিতে পারে, তাহাতে বিশেষ মনোযোগী হওয়া কর্ত্তব্য। দৃষ্টান্ত স্বরূপ, গালিচা দুলিচা মশারি চাদর প্রভৃতি তন্তুকার্য্য, কামার, কুমার, ছুতার, স্বর্ণকার কংসকার প্রভৃতি কারুকার্য্য, শিল্প ও কৃষিকর্ম্মের যন্ত্রাদি এবং বিবিধ ফলমূল শস্য প্রভৃতি আহার্য্য ও ব্যবহার্য্য সামগ্রী সমূহের নাম করা যাইতে পারে। তৎসঙ্গে সুসেব্য গন্ধদ্রব্য ও সুশ্রাব্য গান্ধর্ব্ব বিদ্যার যন্ত্রাদির জন্যও অনুরোধ করা যাইতে পারে। এই সকলের মধ্যে যদিও কতক কতক সংগৃহীত ও প্রদর্শিত হইতেছে, কিন্তু অবশিষ্ট সামগ্রীরও নির্ব্বাচন, প্রদর্শন এবং তজ্জন্য পারিতোষিক অর্পণ, নিতান্তই প্রয়োজন।

২য়। শারীরিক বল বিধান।

শারীরিক বলবীর্য্যের ঔৎকর্ষ বিধান জন্য এক্ষণে যেরূপ উপায় অবলম্বন করা হইয়াছে, তাহা প্রশংসনীয়। কিন্তু সেই উপায় ও কৌশলকে আরো প্রসারিত করা আবশ্যক। অপেক্ষাকৃত সমধিক পারিতোষিক বন্টন করিতে হইবেক। সেই প্রলোভন দ্বারাই হউক, অথবা নানা প্রদেশের ভূস্বামী ও ধনীবর্গকে অনুরোধ করিয়াই হউক, অধিক সংখ্যক ও উচ্চতররূপে শিক্ষিত মল্লযোদ্ধা, অস্ত্রচালক ও পাইক প্রভৃতি নিমন্ত্রণ করিতে হইবেক। যাহাতে স্থানে ২ ব্যায়ামশিক্ষার পাঠালয় স্থাপিত হইয়া উঠে, এবং যাহাতে দেশের লোকে অঙ্গচালনা ও শারীরিক বলবৃদ্ধির উপকার জ্ঞান লাভ করিতে পারে, তাহার উপায় করাও কর্ত্তব্য। মেলা দ্বারা এইরূপে আনুকূল্য ও উৎসাহ প্রদত্ত হইলে কিয়দ্বৎসরের মধ্যেই দেখিতে পাইবেন, বঙ্গবাসী লোকে ভীরুস্বভাব পরিত্যাগ করিয়া সাহসী হইয়া উঠিবে, সুতরাং "ভেতো বাঙ্গালি" বলিয়া যে ঘৃণাবাচক উপাধিটী আছে তাহা ক্রমে অবসৃত হইয়া যাইবে।

৩য়। সামাজিক উন্নতি।

"সামাজিক উন্নতি" বলাতে সামাজিক নিয়মাদি পরিবর্ত্তন অথবা নূতন প্রথা প্রচলন দ্বারা সমাজের উন্নতি সাধন করা এ মেলার উদ্দেশ্যও নহে—সাধ্যায়ত্তও নহে। সমাজবন্ধন দৃঢ় করা এবং সামাজিকতার নষ্টোদ্ধার করাই সার অভিপ্রায়। সামান্যতঃ লোকে সামাজিকতার যে অর্থ গ্রহণ

করিয়া থাকেন, সে পক্ষে মেলাকর্ত্তৃক কিছুই হইতে পারে না। অর্থাৎ সৎক্রিয়াদি উপলক্ষে কাহারো বাটীতে সামাজিক লোকে আহার করিলে, কর্ম্মকর্ত্তা তাঁহাদিগকে মর্য্যাদাস্বরূপ যাহা দান করেন, বঙ্গীয় সমাজে তাহাই সামাজিকতা নামে প্রসিদ্ধ আছে। মেলা দ্বারা সে সামাজিকতার কোন সাহায্য হইতে পারিবেক না। সামাজিকতার যে অন্য একটী মহোচ্চ বুৎপত্তি আছে, দুর্ভাগ্যক্রমে আধুনিক হিন্দুজাতি যাহা ভুলিয়া গিয়াছেন, সেই ব্যুৎপত্তিবোধক সামাজিকতাই লক্ষ্য। তাহাকে পাইবার জন্যই এত প্রয়াস। সে সামাজিকতার অভাবে কোন জাতি, জাতি-পদবাচ্যই হইতে পারে না—সে সামাজিকতার অভাবে স্বাতন্ত্র্য আর অনৈক্য, যথেচ্ছাচার আর পরতন্ত্রতা, ইহারাই সমাজরাজ্যের অধিপতি হইয়া সমাজকে উচ্ছৃঙ্খলতার হস্তে সমর্পণ করিয়াছে। অতএব সেই সামাজিকতাকে উদ্ধার করা যে কতদূর আবশ্যক হইয়াছে তাহা বলা যায় না। সে সামাজিকতার অন্য নাম জাতিধর্ম্ম। সেই স্বজাতিধর্ম্ম আমাদিগের অজ্ঞানতারূপ অন্ধকার-কারাগারে পরবশ্যতা শৃঙ্খলে আবদ্ধ আছে, তাহাকে মুক্ত করা সর্ব্বপ্রযত্নে বিধেয়। কিন্তু তাহা করিতে গেলে অগ্রে আত্ম-নির্ভর নামা শাণিত অস্ত্র দ্বারা পরবশ্যতারূপ শৃঙ্খলকে ছেদন করিতে হইবে। সেই আত্মনির্ভর লাভ করিবার জন্য এইরূপ সমাবেশ যে অদ্বিতীয় উপায়, তাহা প্রকাশ করিয়া বলা বাহুল্য। স্বজাতীয় সকল শ্রেণীস্থ লোকের একত্র অধিবেশন, পরস্পর সৎসম্ভাষণ, পরস্পরের মনোগত ভাব বিনিময়, গত সম্বৎসর মধ্যে সমাজের কি বা উন্নতি আর কি বা অনুন্নতি হইয়াছে তদালোচনা পূর্ব্বক উন্নতিকে উৎসাহ দেওয়া আর অনুন্নতিকে নিরুৎসাহ করা এবং স্বজাতীয়ের প্রতি স্বজাতীয়ের অনুরাগ বর্দ্ধন ও স্বজাতীয় শিল্প-সাহিত্যাদির প্রতি সমুচিত আস্থা জন্মাইয়া দেওয়া যখন মেলার কার্য্য হইল, তখন এই মেলা যে স্বাবলম্বনরূপ অমূল্য নিধির আকরস্থল হইবে, তাহাতে অণুমাত্র সন্দেহ নাই। কিন্তু সেই অধিবেশন, সেই সম্ভাষণ, সেই ভাববিনিময়, সেইসব আলোচনা যদি সুদ্ধ মৌখিক বক্তৃতাতেই পর্য্যবসিত হয়,—যদি তাহাতে আন্তরিক অনুরাগের প্রতিবিম্ব প্রতিফলিত না হয়, যদি তত্তাবতকে কার্য্যে পরিণত করিবার প্রতিজ্ঞা না জন্মে, যদি সকলেই সাধ্যানুসারে সযত্ন না হন, এবং যদি রঙ্গভূমি হইতে বহির্গত হইয়াই নাটকের অভিনেতার ন্যায় সজ্জা পরিত্যাগ করেন, তবে ইহার মহদুদ্দেশ্য সফল না হইয়া বরং বিফল হইবার কথা! তাহা হইলে প্রকৃত সঙ্কল্পের অঙ্গহানি হইয়া এই মেলা কেবল কৌতুকাবহ মেলা হইয়া উঠিবে, দেশ-বিদেশীয়ের চক্ষে বাঙ্গালির চরিত্র হাস্যাস্পদ হইয়া উঠিবে, ভবিষ্যতে বাঙ্গালির অনুষ্ঠিত কোন বিষয়েই লোকের বিশ্বাস ও আস্থা থাকিবে না। কিন্তু ভরসা আছে, অধুনা কৃতবিদ্য দেশহিতৈষী মণ্ডলীর চিত্ত-ভূমিতে স্বদেশানুরাগ ও স্বজাতি-বাৎসল্য বদ্ধমূল হইতেছে, তাঁহারা কখন এরূপ সর্ব্বনাশক দোষের অধীন হইবেন না—তাঁহারা কখনই এমন দুরপনেয় কলঙ্কাগ্নিতে স্বেচ্ছাপূর্ব্বক ঝম্পদান করিবেন না—তাঁহারা কখনই হাস্য ও কৌতুকের হস্তে স্বোপার্জ্জিত সম্পত্তিকে অর্পণ করিবেন না। তাঁহাদের অবিচলিত অধ্যবসায়-কুঠারে বিঘ্ন-কন্টক অবশ্যই ছেদিত হইয়া মনোরথ তরু মুঞ্জরিত ও ফলিত হইবে, সন্দেহ মাত্র নাই।

আমরা এই মেলার উদ্যোগী মহাশয়দিগের মনোগত অভিপ্রায় বিলক্ষণ জ্ঞাত আছি। যে ২ উপায়দ্বারা এরূপ অনুষ্ঠান ও ইহার উদ্দেশ্য সুসিদ্ধ হইতে পারে, তাহা তাঁহারা সম্যক্ উপলব্ধি করিয়াছেন। কেবল বর্ত্তমান অবস্থার প্রতিবন্ধকতা বশতঃ ইচ্ছাসত্ত্বেও এককালে সকল সুসংযোগ করিয়া তুলিতে পারিতেছেন না। সকলই অর্থ-ব্যয়-সাধ্য। এবং কোন কোন বিষয় সময়-সাপেক্ষ।

ইতিপূর্ব্বে যে সকল প্রকরণের আলোচনা করা হইল এবং বাহুল্য ভয়ে যে সকলের নামমাত্র উল্লেখ করা গিয়াছে, তত্তাবৎ সুচারুরূপে সংযোটন ও সম্পাদন করা, কত ব্যয়ের কর্ম্ম, তাহা সহৃদয় মাত্রেই বুঝিতে পারিবেন। কিন্তু এই প্রচুর অর্থ কোথা হইতে আসিবে? কে দিবে? অবশ্যই আমাদিগকে দিতে হইবে। অবস্থানুসারে প্রত্যেক হিন্দুরই কর্ত্তব্য, সাধারণভার বহন জন্য আপনাপন স্কন্ধ বিস্তার করেন! যদি উত্তরোত্তর ও উপর্য্যুপরি এত প্রকার রাজকর দিয়াও আমরা এখনও নিঃস্ব হই নাই, তবে স্বদেশের মহদুন্নতির নিদান-স্বরূপ এই মঙ্গলময় মেলার পুষ্টিসাধন জন্য কিছু ২ দান করিয়া কখনই দায়গ্রস্ত হইব না—দান করিতে কখনই কাতর হইব না। "দশের নড়ি একের বোঝা" সকলে ভার বাঁটিয়া লইলে কাহারো কষ্ট হইবে না, অথচ একটী অনুপম সুখ-রাজ্যের রাজপুরী নির্ম্মিত হইয়া উঠিবে!

অতএব হে সম্ভ্রান্ত দেশহিতৈষি মহাশয়গণ! ভাবিয়া দেখুন, আমরা যিনি যাহা সাহায্য করিয়াছি, তাহার দ্বিগুণতর আনুকূল্য করা এক্ষণে উচিত কি না? যাঁহারা অদ্যাপি বান্ধবশ্রেণীতে আছেন, কিন্তু সহকারী-শ্রেণীতে প্রবিষ্ট হন নাই, তাঁহাদিগের তাহাতে সন্নিবিষ্ট হওয়া আবশ্যক কি না? এবং যাঁহারা দূর হইতে ইহাকে সামান্য ক্রীড়াভূমি জ্ঞানে অদ্যাপি প্রীতিপরায়ণ হয়েন নাই, ইহার প্রতি তাঁহাদিগের প্রেম-দৃষ্টিপাত ও ইহাকে প্রেমালিঙ্গন করা কর্ত্তব্য কি না? কেবল যে ধন দ্বারাই সাহায্য হইতে পারে, অন্যবিধরূপে হইতে পারে না, তাহাও নহে। কিঞ্চিৎ ২ দান করা সকলেরই সাধ্যাধীন, সুতরাং তাহা তো করিতেই হইবেক। তদ্ব্যতীত যাঁহার যে বিষয়ে যেমন ক্ষমতা, তিনি সেই বিষয়ে তদনুরূপ সহকারিতা করিলেই অভীষ্ট সিদ্ধ হয়। যিনি মান্যব্যক্তি, তাঁহার উপস্থিতি দ্বারা মেলার মাহাত্ম্য বৃদ্ধি করা উচিত। যিনি অনুসন্ধিৎসু প্রজ্ঞাবান্ বলিয়া খ্যাত, তাঁহার সদুপায় নির্দ্ধারণ ও সদুপদেশ দান করা কর্ত্তব্য। যিনি বিদ্বান্, তিনি অধ্যক্ষশ্রেণীর বিদ্যোৎসাহী বিভাগে নিযুক্ত হইয়া তাহার গুরুত্ব বিধান করুন। যিনি কবি, তিনি হিতজনক প্রসঙ্গ-পুষ্প ভাব-সূত্রে গ্রন্থন করিয়া মেলার অঙ্গশোভা সম্পাদন করুন। যিনি বক্তা, তিনি সদ্বক্তৃতা দ্বারা সমাজের উৎসাহ ও কর্ত্তব্য-জ্ঞানকে জাগরূক করিতে থাকুন। যিনি সঙ্গীতজ্ঞ, তিনি সুমধুর সঙ্গীত রসে মেলাভূমিকে অমৃতস্রোতে প্লাবিত করুন। যাঁহারা মল্লবিদ্যার কৌতুকী, তাঁহারা যোদ্ধা প্রতিযোদ্ধা আনয়ন করিয়া বল ও কৌশলের শিক্ষক হউন। যাঁহারা দৃশ্যকাব্যের রসজ্ঞ, তাঁহারা রঙ্গভূমির বিশুদ্ধ আমোদ দেখাইয়া আমোদ ও উপদেশ দান করুন। যাঁহারা উদ্ভিদ্‌বিদ্যার ভাবগ্রাহী, তাঁহারা নানাজাতি কুসুম, নানাজাতি ফলমূল, নানজাতি তরুলতা, নানাজাতি শস্য এবং নানাজাতি জলজ শৈবালাদি আহরণ করিয়া অথবা আহরণকারীদিগকে উৎসাহ দিয়া, কৃষি ও বাণিজ্যের শোভা ও ভৈষজ্যের উন্নতি সাধন করুন। এরূপ হইলে আর কিসের চিন্তা? এরূপ না হইলেই বা চলিবে কেন? এরূপ হইতেই বা অসম্ভাবনা কি? আরো কি জন্মভূমির প্রতি আমরা কঠোর থাকিব? এখনও কি আলস্যের জড়তাতে জ্বরাগ্রস্ত থাকিব? এখনও কি স্বার্থদৃষ্টির ঘোরে অচৈতন্য—অন্ধবৎ রহিব? এখনও কি পরিবার প্রতিপালন ভিন্ন অন্য কর্ত্তব্যকে স্মরণ করিব না? সমাজের নিকট—স্বদেশের নিকট যে গুরুতর ঋণে ঋণী আছি, তাহা কি চিরকাল ভুলিয়া থাকিব? ইন্দ্রিয়সেবার সেবক হইয়া নির্দ্দোষ আমোদ ও যথার্থ সুখভোগে আজো কি বঞ্চিত থাকিব? কখনই না! চারিদিকে এই সকল সমুৎসুক আনন্দোৎফুল্ল কর্ত্তব্য-জ্ঞান-জ্যোতিঃ-বিকাশক বদনপরম্পরা দৃষ্টি করিয়া নিশ্চিত বোধ হইতেছে,

আমরা উপর্য্যুক্ত দোষাবলীকে মহোদ্যম দ্বারা দূরীভূত করিতে সমর্থ হইব—অবশ্যই সমর্থ হইব! যখন তিন বৎসর মধ্যেই এতদূর হইয়াছে, তখন কিছুকালে আশানদী অবশ্যই সুখ-সিন্ধুর সঙ্গমলাভে সমর্থা হইবে, সন্দেহ নাই।

কিন্তু যতদিন সেইটী সুসম্পন্ন না হইয়া উঠে, ততদিন ইহার অনুষ্ঠাতা ও অধ্যক্ষমণ্ডলীকে অবিচলিত অধ্যবসায় অবলম্বন করিয়া থাকিতে হইবে। তাঁহারা ইহার সূত্রপাত ও ক্রমশঃ শ্রীবৃদ্ধি সাধন করিয়া ইতিমধ্যেই আমাদের নমস্য ও কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন। এক্ষণে প্রার্থনা, তাঁহারা ইহাকে পরিণত অবস্থায় উন্নত করিয়া এবং ইহাকে পূর্ব্বোক্ত রূপে সম্পূর্ণ ঐক্য-বিধায়ক ও মঙ্গলসাধক করিয়া দিয়া অক্ষয় কীর্ত্তি স্থাপন করুন—ভারতবর্ষের ভাবী ইতিহাসের পত্রাবলী মাধ্য হীরকের রেখার ন্যায় অঙ্কিত থাকুন,—লোকানুরাগের সঙ্গে আত্মপ্রসাদ ও ঈশ্বরপ্রসাদ লাভ করিয়া অনন্ত কালের সুখাধিকারী হউন।

নিতান্ত বাধিত।

শ্রীমনোমোহন বসু।

রামায়ণের মর্ম্ম ও তদন্তর্গত নীতি

সুপ্রথিত আর্য্যাবর্ত্তের উত্তরাংশে অযোধ্যা নামে এক অতি সমৃদ্ধিশালিনী নগরী আছে। স্নিগ্ধসলিলবাহিনী সরযূ অনুপম লহরী-লীলা বিস্তার করতঃ যাহার উপকণ্ঠ দিয়া সুমধুর কলস্বরে প্রবাহিত হইতেছে। যাহার গবাক্ষ-জাল রন্ধ্র দিয়া সুবিমল রত্নজ্যোতিঃ পরম্পরা সহস্রধা বিকীর্ণ হওয়াতে বোধ হইতেছে যেন নগরী দশনাংশু-প্রভা বিস্তার করিয়া পরম সমৃধিশালিনী অমরাবতীকেও উপহাস করিতেছে। সেই অযোধ্যা নগরীতে সূর্য্যতনয় মনুর বিশুদ্ধ বংশে দশরথ নামা এক অতীব প্রতাপান্বিত শান্তশীল নরপতি জন্ম পরিগ্রহ করেন। নৃপশ্রেষ্ঠ অজের পরলোক গমনান্তর দশরথ পিতৃ-সিংহাসন প্রাপ্ত হইয়া অপত্য-নির্ব্বিশেষে প্রজাপালন করিতে লাগিলেন। দশরথ অলৌকিক বিদ্যাবুদ্ধিসম্পন্ন ও পরম ন্যায়বান ছিলেন। তাঁহার প্রখর দোর্দ্দণ্ড প্রতাপ নিবন্ধন নিখিল অরাতি-কণ্টক উন্মূলিত হওয়াতে রাজ্য শান্তি-প্রবল হইয়াছিল, সুশাসন বশতঃ দস্যুতস্করাদি উপশান্ত হওয়াতে প্রকৃতিবর্গ নিরুপদ্রব ও নিষ্কণ্টক হইয়াছিল, অধিক কি, রাজাধিরাজ দশরথ সৌরাজ্য-সম্ভূত নিয়মসমূহ যথারীতি প্রয়োগ করিয়া মহেন্দ্ররাজধানীকেও অধঃকৃত করিয়াছিলেন। প্রহ্লাদন-হেতু চন্দ্র ও প্রতাপ-হেতু তপনের ন্যায় মহারাজ প্রকৃতিরঞ্জন-হেতু রাজ-শব্দ অন্বর্থ করিয়াছিলেন। কৌশল্যা কৈকেয়ী ও সুমিত্রা নামে তাঁহার তিন ধর্ম্মপত্নী ছিল। মহারাজ, ত্রিবিধ মন্ত্র-শক্তির ন্যায়, পতিব্রতা ধর্ম্মপরায়ণা উক্ত তিন মহিষীতে নিতান্ত অনুরক্ত ছিলেন। দশরথ রাজ্য শাসন প্রসঙ্গে প্রায় অযুত বৎসর অতিবাহন করিলেন, কিন্তু সংসারাশ্রম-সুখের নিদানভূত পুন্নাম-নরক-পরিত্রাতা পুত্রের অভাবে তাঁহার মন দিন দিন অপ্রসন্ন ও গ্লানির আস্পদ হইয়া উঠিল, রাজ্য শাসন বিষয়ে নিতান্ত ঔদাসীন্য দৃষ্ট হইতে লাগিল। তিনি সর্ব্বদা বিরলে বসিয়া বিষয়-বিরাগ প্রদর্শন করিতে লাগিলেন। অমাত্যবর্গ রাজার এইরূপ মানসিক ভাবের পরিবর্ত্তন দেখিয়া নিতান্ত পরিতপ্ত হইতে লাগিলেন।

এই সময়ে দেবগণ, কমলযোনি-বর দৃপ্ত লঙ্কেশ্বর রাবণ কর্ত্তৃক নিতান্ত উপদ্রুত হইয়া, ভগবান্ ভূতভাবন নারায়ণ সমীপে আগমন করতঃ বিনয়-নম্র বচনে কহিতে লাগিলেন, ভগবন্। দুরাত্মা রাবণ প্রজাপতির বরে গর্ব্বিত হইয়া আমাদিগের প্রতি যথেচ্ছ ব্যবহার আরম্ভ করিয়াছে, তাহার দৌরাত্ম্যে আমরা নিপীড়িত হইয়া ভবৎ সমীপে আগমন করিয়াছি। আমাদের প্রতি প্রসন্ন হউন। * *

* হে বিশ্বভাবন! আমরা কাতর হইয়া করজোড়ে প্রার্থনা করিতেছি, তুমি যেমন লোকস্থিতিরক্ষার্থ বরাহ আকার স্বীকার করিয়া প্রলয়-জলধি-মগ্ন মেদিনীমণ্ডলের উদ্ধার সাধন করিয়াছিলে, সেইরূপ দশরথ-গৃহে মানব-রূপে অবতীর্ণ হইয়া দুরাত্মা দশাননকে সবংশে নিহত করতঃ আমাদিগকে নিরুপদ্রব কর। ভগবান্ নারায়ণ দেবগণ কর্ত্তৃক এইরূপ অভিহত হইয়া, সাদর সম্ভাষণ পূর্ব্বক তাঁহাদের প্রার্থনা স্বীকার করিলেন। ইন্দ্র-প্রমুখ নাকেসদ্‌গণও বিষ্ণুর সহায়তা সম্পাদনার্থ স্ব স্ব

আংশিক মাত্রা দ্বারা বানর রূপে অবতীর্ণ হইতে সঙ্কল্প করিয়া হৃষ্ট-চিত্তে স্ব-স্থানে প্রতিগমন করিলেন।

এ দিকে মহারাজ দশরথ কুলগুরু বশিষ্ঠ দেবের আদেশ ক্রমে বারাঙ্গনা দ্বারা মহাতেজা ঋষ্যশৃঙ্গকে স্বরাজে আনয়ন করিয়া পুত্রেষ্টি সত্রের অনুষ্ঠান করিলেন। মহদাড়ম্বরসহকারে যজ্ঞ-ক্রিয়া নির্ব্বাহ হইল। দশরথ কৌশল্যা ও কৈকেয়ীকে যজ্ঞীয় চরু প্রদান করিলেন। সুমিত্রা উক্ত দুই মহিষীর নিতান্ত প্রিয়পাত্রী ছিলেন বলিয়া তাঁহারা স্ব স্ব অংশ প্রদান দ্বারা তাঁহার মনস্তুষ্টি সাধন করিলেন। এইরূপে মহিষীত্রয় পুত্রোৎপাদক চরু ভক্তিসহকারে ভক্ষণ করিয়া শুভলক্ষণযুক্ত গর্ভ ধারণ করিলেন। ক্রমে গর্ভগৌরব প্রযুক্ত তাঁহাদের শরীর অবসন্ন ও আভরণনিচয় দুর্ব্বহ বোধ হইতে লাগিল। প্রভাত সময়ে বিরলতারকাস্তবকময়ী বিপাণ্ডুরা রজনী যাদৃশ শোভমানা হয়, স্বর্ণালঙ্কারপরিধানা, ক্ষীণকান্তি মহিষীত্রয়ও তাদৃশী শ্রীসম্পন্না হইলেন।

উপযুক্ত সময়ে, কৌশল্যা ও কৈকেয়ী যথাক্রমে কুমারদ্বয় এবং সুমিত্রা যুগল কুমার প্রসব করিলেন। মহারাজ দশরথ আত্মানুরূপ পুত্রলাভে সন্তুষ্টহৃদয় হইয়া, বিভবানুরূপ মহোৎসবে প্রবৃত্ত হওয়াতে সমস্ত নগরী আহ্লাদময়—উৎসবময় হইয়া নয়নের অনির্ব্বচনীয় প্রীতি সম্পাদন করিতে লাগিল। মহারাজ কৌশল্যা-গর্ভ-সম্ভূত সর্ব্বজ্যেষ্ঠ তনয়ের নাম রাম, কৈকেয়ী-সম্ভূত তনয়ের নাম ভরত ও সুমিত্রার যুগল কুমারের নাম যথাক্রমে লক্ষ্মণ ও শত্রুঘ্ন রাখিলেন। সৌর-কিরণের অনুপ্রবেশ হেতু চান্দ্রমসী শশিকলা যেমন দিন দিন পরিবর্দ্ধমান্ হয়, রামপ্রমুখ কুমার চতুষ্টয় সেইরূপ পরিবর্দ্ধমান্ হইয়া জনগণের অপরিসীম আনন্দ উৎপাদন করিতে লাগিলেন। মহারাজ দশরথ পুত্রগণের অলৌকিক রূপ-লাবণ্য ও বিনয়-নম্রতা প্রভৃতি সদ্‌গুণ দর্শনে আপনাকে পরম সৌভাগ্যশালী জ্ঞান করিয়া হর্ষ-সাগরে নিমগ্ন হইলেন। কুমারগণের রূপ-লাবণ্যের সঙ্গে সঙ্গে পরস্পরের সৌভ্রাত্রবন্ধনও দৃঢ়তর হইতে লাগিল। সকলেই একত্র আহার বিহারাদি কার্য্যকলাপে জনগণের নয়ননন্দন হইয়া উঠিলেন। যদিচ তাহারা সকলেই একহৃদয় ছিলেন, তথাপি অনির্ব্বচনীয় কারণ প্রভাবে লক্ষ্মণ রামের ও শত্রুঘ্ন ভরতের একান্ত অনুরক্ত হইয়া উঠিলেন, মহারাজ দশরথের যেমন অতুল ঐশ্বর্য্য, কুমার চতুষ্টয়ের গর্ভৈকাদশবর্ষ বয়ঃক্রম সময়ে উপনয়ন কার্য্যও তদনুরূপ সমারোহ সহকারে নির্ব্বাহ করিয়া, অধ্যয়নার্থ সর্ব্বশাস্ত্র বিশারদ অধ্যাপক নিযুক্ত করিয়া দিলেন। কুমারেরা অসাধারণ মেধাবলে অল্পকাল মধ্যেই সমগ্র শাস্ত্রে পারদর্শী হইয়া উঠিলেন। অনন্তর মহারাজ স্বয়ংই অসি চর্ম্ম শরাসন প্রভৃতি ধারণ করিয়া পুত্রদিগকে সমন্ত্রক ধনুর্ব্বেদ শিক্ষা দিতে লাগিলেন। দশরথ সসাগরা পৃথিবীর অদ্বিতীয় অধিপতি ছিলেন এরূপ নহে, অদ্বিতীয় অস্ত্র-বেদজ্ঞ বলিয়াও বিখ্যাত ছিলেন; রামাদি, ভ্রাতৃচতুষ্টয় পিতৃ-সমীপে অস্ত্রশিক্ষা প্রাপ্ত হইয়া অসাধারণ যোদ্ধা বলিয়া প্রথিত হইলেন।

এইরূপে এই প্রস্তাব-রচয়িতা রামের বিবাহ,—রামের যৌবরাজ্যাভিষেক ও বনবাস, —রাবণের সীতাহরণ,—রাবণ বধ,—সীতার পরীক্ষা,—রামচন্দ্রের অযোধ্যায় প্রত্যাগমন ও রাজ্যগ্রহণ,—সীতাবিসর্জ্জন,—কুশ ও লবের জন্ম,—অশ্বমেধ,—কুশ ও লবের রামায়ণ গান ও তাহাদের পরিচয়,—সীতার পুনঃপরীক্ষা প্রার্থনা ও তাঁহার প্রাণত্যাগ—প্রভৃতি রামায়ণের সমুদায় মর্ম্ম বাল্মীকির ভাবমত সবিস্তরে বর্ণন করিয়াছেন। বিস্তৃতি নিবন্ধন এখানে তৎসমুদায় উদ্ধার

করা হইল না। রামায়ণান্তর্গত নীতি-বিষয়ে তিনি যাহা লিখিয়াছেন, তাহা নিম্নে উদ্ধৃত করা হইতেছে।

এই সপ্তকাণ্ডরূপ কল্পপাদপে নানা নীতিবিষয়িণী কথা বর্ণিত আছে। লঙ্কাদ্বীপে রাবণ অতিশয় দুরাচার ছিল। সে বল পূর্ব্বক পরদার হরণ করিয়া আনিত। পরিশেষে সীতা হরণ করাতে তাহাকে যে প্রকার দুরবস্থান্বিত ও অপমানিত হইয়া প্রাণত্যাগ করিতে হইয়াছিল, তাহা ইহাতে সবিস্তর বর্ণিত আছে। সুতরাং তৎপাঠে রাবণের ন্যায় ব্যবহারের প্রতি সকলেরই ঘৃণা জন্মে। পক্ষান্তরে রাম অতি সদাশয় ছিলেন, পুরাণে যেরূপ বর্ণিত আছে তাহাতে বোধহয়, ধৈর্য্য, বিনয়, গাম্ভীর্য্য, সরলতা, দাক্ষিণ্য প্রভৃতি সদ্‌গুণ যেন মূর্ত্তিমান হইয়া রামরূপে অবতীর্ণ হইয়াছিল। রামচন্দ্র অনেক বার নানা বিপদে পতিত হইয়াছিলেন, কিন্তু তাহাতে তিনি বিচলিত হন নাই। তাঁহার বদনমণ্ডলে নিরবচ্ছিন্ন ধৈর্য্য ও গাম্ভীর্য্য বিরাজ করিত। সত্যসন্ধ রামচন্দ্র পিতৃপরায়ণ ছিলেন, তিনি একমাত্র পিতৃসত্যরক্ষার্থ অনায়াসে রাজ্য-সুখ বিসর্জ্জন পূর্ব্বক চতুর্দ্দশ বর্ষকাল বনে বনে ভ্রমণ করিয়া অসাধারণ পিতৃভক্তির পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করেন। দুরাত্মা রাবণ সীতারে হরণ করিয়া লইয়া গেলে রামচন্দ্র বানর-বল সহকারে লঙ্কা অবরোধ করিয়াছিলেন, কিন্তু তথাপি সত্য-লঙ্ঘন ও রাজ্যের অনিষ্টাশঙ্কা ভয়ে অযোধ্যায় গমন করিয়া অনুজ ভরতের সাহায্য গ্রহণ করেন নাই। রাম প্রিয়তমার উদ্ধার সাধন করিয়া নিয়মিত চতুর্দ্দশ বর্ষান্তে অযোধ্যায় গমন পূর্ব্বক রাজ্য-ভার গ্রহণ করিতে বিলক্ষণ সুনিয়ম সহকারে প্রজাপালন করিয়াছিলেন। বনগমন সময়ে জটাচীর ধারণ করিতে, রামের যে প্রকার বিনয়-চিহ্ন-সুশোভিত মুখকান্তি দৃষ্ট হইয়াছিল, রাজাসন গ্রহণ সময়ে মহার্হ রাজপরিচ্ছদ পরিধান করিতে তাহার কিছুমাত্র ব্যত্যয় হয় নাই। রামচন্দ্র বনে বনে ভ্রমণ করিয়া অনেক সময়ে দুর্ব্বিষহ দুঃখানলে দগ্ধ হইয়াছিলেন, কিন্তু তথাপি, রাজ্য-ভার গ্রহণ পূর্ব্বক, তদ্দুঃখের নিদানভূতা জননী কৈকেয়ীর প্রতি কিছুমাত্র অসম্মান প্রদর্শন করেন নাই, প্রত্যুত অনুক্ষণ দৃঢ়তর ভক্তি সহকারে তাঁহার সেবা-শুশ্রূষা করিতেন। পরিশেষে রামচন্দ্র একমাত্র প্রজারঞ্জনের নিমিত্ত স্বীয় স্নেহময়ী প্রতিমা প্রিয়তমাকে নিতান্ত নিরপরাধা জানিয়াও অনায়াসে পরিত্যাগ করিয়াছিলেন।

রামায়ণ পাঠে পাতিব্রত্য বিষয়িণী নীতিও লাভ করিতে পারা যায়। জনকনন্দিনী সীতা অতিশয় পতিপরায়ণা ছিলেন। বোধহয়, জগদীশ্বর জগল্লোককে পতিভক্তি বিষয়ক উপদেশ দিবার নিমিত্ত সীতার নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। সীতা, সাক্ষাৎ প্রজাপতি সদৃশ জনক এবং সর্ব্বগুণান্বিত ও সর্ব্বপ্রকার ধনসম্পদের অধিপতি পতি লাভ করিয়া, এরূপ চিরদুঃখিনী ছিলেন যে ভূমণ্ডলে অন্য কোন রমণী, তাদৃশ সুভগকুলের বধূ হইয়া, সীতার ন্যায় দুরবস্থান্বিতা হন নাই। সুকুমারাঙ্গী জানকী প্রগাঢ় দাম্পত্যপ্রেমে আবদ্ধ হইয়া, ভর্ত্তার অনুগমন করত একমাত্র তাহার মুখ দেখিয়াই সুকঠোর বনবাসদুঃখ সহ্য করিয়াছিলেন। অনন্তর দুর্ম্মতি রাবণ কর্ত্তৃক হৃতা হইয়া লঙ্কায় অশেষবিধ যন্ত্রণা ভোগ করেন, কিন্তু তথাপি অমূল্য সতীত্ব-রত্ন বিনষ্ট করেন নাই। পরিশেষে রামচন্দ্র রাবণ বধ করিয়া, অগ্নিপরীক্ষা গ্রহণ পূর্ব্বক সীতাকে গ্রহণ করত অযোধ্যায় আগমন করেন। এমন সময়েও নিদয় দৈব প্রতিকূল হইয়া চিরদুঃখিনী সীতার সুখরত্ন অপহরণ করেন। রামচন্দ্র দুর্নিবার লোকগঞ্জনা সহ্য করিতে না পারিয়া, তাদৃশ পতিপরায়ণা কামিনীকে অরণ্যে নির্ব্বাসিত করিলে সীতা, ভ্রমক্রমেও ভর্ত্তা কিম্বা দেবরগণের নিন্দাবাদ করেন নাই, প্রত্যুত আপনাকেই চিরদুঃখিনী ও হতভাগিনী বলিয়া

বারম্বার ধিক্‌কার প্রদান করিয়াছিলেন। সীতা একান্ত পতিপ্রাণা ও সরল-হৃদয়া ছিলেন। তাঁহার ন্যায় শুদ্ধাচারিণী কামিনী ভূমণ্ডলে দৃষ্টিগোচর হয় না। নির্ম্মল পবিত্রভাব ও অলৌকিক মহত্ত্বচ্ছটা তাঁহার বদন মণ্ডলে নিরন্তর বিরাজমান্ থাকিত। সীতা, তাদৃশ সার্ব্বভৌম্ চক্রবর্ত্তী পতি লাভ করিয়াও চিরজীবনের মত বননিবাসিনী হইয়া, যদৃচ্ছালব্ধ ফলমূল দ্বারা অতিকষ্টে জীবন ধারণ করিয়া ছিলেন। তিনি রাজ্যসুখ ভোগ প্রার্থনা করেন নাই, কেবল পতিসুখেই সুখী ও পতী-দুঃখেই দুঃখী ছিলেন। সীতা, শ্বশ্রূগণের প্রতি কখনও অভক্তি প্রকাশ করেন নাই, প্রত্যুত তাঁহাদিগের নিরন্তর শুশ্রূষা করিয়া আশীর্ব্বাদ পাত্রী হইতেন। জানকী নিরন্তর দুঃখাতিবেগ সহ্য করিয়াই জীবনাতিবাহন করেন, তাঁহার ভাগ্যে একদিনের তরেও সুখভোগ ঘটিয়া উঠে নাই। সুতরাং এরূপ ললনার ইতিবৃত্তি পাঠ করিলে কাহার হৃদয় বিগলিত না হয়? এবং কোন্ সামাজিকের মনেই বা অভূতপূর্ব্ব আনন্দ-মিশ্র শোক ভাবের উদয় না হইয়া থাকে? সীতার ন্যায় সেই পবিত্র ভাব—সেই পতিপরায়ণতা—সেই মহত্ত্বগরিমাবিষয়িণী নীতি লাভ করিতে চেষ্টা করা অস্মৎ কামিনীকুলের একান্ত বিধেয়, এবং তজ্জন্য রামায়ণান্তর্গত সীতাচরিত অধ্যয়ন করা তাহাদিগের সর্ব্বাগ্রে কর্ত্তব্য।

রামায়ণে, অসাধারণ ভ্রাতৃপ্রেম, অসাধারণ সুহৃৎ প্রণয় ও অসাধারণ প্রভু-ভক্তির বিষয় সবিস্তর বর্ণিত আছে। সুশীল ভরত পিতৃ-দত্ত রাজ্য প্রাপ্ত হইয়াও কেবল প্রগাঢ় ভ্রাতৃ-প্রেম নিবন্ধন তাহা গ্রহণ করেন নাই। প্রত্যুত অগ্রজের পাদুকাকেই রাজ্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা করিয়াছিলেন। ভরত অগ্রজ রামচন্দ্রকে অতিশয় ভক্তি করিতেন, প্রাণান্তেও অগ্রজের অপ্রিয় কার্য্য সাধন করেন নাই। তিনি মাতুলালয় হইতে আগমন করিয়া সৈন্যসামন্ত সমভিব্যাহারে অরণ্যে প্রস্থান করত অগ্রজকে পুনরানয়ন করিতে বিস্তর প্রয়াস পাইয়াছিলেন। এইরূপ লক্ষ্মণও রামচন্দ্রের প্রতি প্রগাঢ় ভক্তিমান্ ছিলেন। তিনি অগ্রজের প্রতি অনুরাগ বশতঃ, স্বল্পবয়সে অনায়াসে রাজ্য-সুখ বিসর্জ্জন পূর্ব্বক বনে বনে ভ্রমণ করিয়া তদীয় প্রিয়কার্য্য সাধন করিয়াছিলেন। দুর্ব্বিষহ শক্তিশেল-বেদনা সহ্য করিয়া ও বিপুল পরাক্রম সহকারে যুদ্ধকরত ভ্রাতৃজায়ার উদ্ধার সাধন করিয়াছিলেন। লক্ষ্মণ অগ্রজের আজ্ঞা কখনও অমান্য করেন নাই। তিনি ভ্রাতৃ আজ্ঞা বশতঃ নিতান্ত নির্দ্দয়ের ন্যায়, গর্ভবতী ভ্রাতৃ-বধূকে অরণ্যে পরিত্যাগ করেন।

সুগ্রীব ও বিভীষণ অসাধারণ সুহৃৎ-প্রণয়ের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছেন। বিপদকালে বন্ধুকে পরিত্যাগ না করিয়া কিরূপে তাহার প্রিয়কার্য্য সাধন করিতে হয়, উক্ত মহাত্মদ্বয়ই তাহার এক শেষ করিয়াছেন। সুগ্রীব প্রিয়তম মিত্রের সহায়তা সম্পাদনের নিমিত্ত, সসৈন্যে লঙ্কায় গমন পূর্ব্বক যুদ্ধস্থলে বিপুল কষ্ট ও যন্ত্রণা সহ্য করিয়াছিলেন। বিভীষণও প্রিয় মিত্রের নিমিত্ত স্বীয় আত্মীয়বর্গের—প্রাণাধিক-প্রিয়তম পুত্রের বিনাশসাধন করিতেও কুণ্ঠিত হন নাই। এইরূপ পবনতনয় হনুমানও অসামান্য প্রভুভক্তি প্রকাশ করিয়াছিলেন। শত যোজন বিস্তীর্ণ জলধি উত্তীর্ণ হইয়া জনকতনয়ার অন্বেষণ, সেতুবন্ধে কষ্ট স্বীকার, গন্ধমাদন পর্ব্বত হইতে বিশল্যকরণী আনয়ন পূর্ব্বক লক্ষ্মণের জীবনপ্রদান প্রভৃতি প্রত্যেক কার্য্যে তাঁহার অসাধারণ প্রভুভক্তির নিদর্শন প্রাপ্ত হওয়া যায়। বিপদ সময়ে প্রভুর প্রতি অসম্মান প্রদর্শন কিম্বা তাহাকে পরিত্যাগ না করিয়া কিরূপে তাহার প্রিয়কার্য্য সাধন করিতে হয়, হনুমানই তদ্বিষয়ের আদর্শ-ভূমি। প্রভুপরায়ণ হনুমান্ প্রাণান্তেও স্বামী রামচন্দ্রের

প্রতি অসন্তুষ্টি প্রকাশ করে নাই। প্রত্যুত নিরন্তর দৃঢ়তর ভক্তি সহকারে তাঁহার প্রিয় কার্য্য সাধন করিতেন। রামায়ণে এতাদৃশ মহাত্মগণের বৃত্তান্ত পাঠ করিলে তদনুরূপ আচরণ করিতে বলবতী প্রবৃত্তি জন্মিয়া থাকে। কিন্তু বিশেষরূপ যুক্তিসহকারে বিবেচনা করিয়া দেখিলে বিভীষণের সমুদায় কার্য্য সন্নীতির অনুমোদিত বলিয়া প্রতিপন্ন হয় না। যাহা হউক, রামায়ণে উল্লিখিত মহাত্মগণের চরিত্র পাঠ করিলে যে বহুতর নীতি লাভ করিতে পারা যায়, তদ্বিষয়ে কাহারও দ্বিরুক্তি নাই।

এতদ্ব্যতীত পূর্ব্বতন মহর্ষিগণের বিনয়, সরলতা, সত্যনিষ্ঠা, বিদ্যাপরায়ণতা প্রভৃতি বিষয় পাঠ করিলে বহুল পরিমাণে নীতিবিষয়ক উপদেশ লাভ করিতে পারা যায়। বাহুল্যভয়ে তদ্বিষয় সবিস্তর বর্ণন করিতে না পারিয়া, এই স্থানেই প্রস্তাবের উপসংহার করিলাম।

শ্রীরজনীকান্ত গুপ্ত।
সংস্কৃত কলেজ।

মহাভারতের মর্ম্ম ও তদন্তর্গত

একদা নৈমিষারণ্যে শনকাদি ঋষিগণ তপস্যা করিতেছিলেন। এমন সময়ে বেদব্যাসের শিষ্য সৌতি তথায় উপস্থিত হওয়াতে পরমশ্রদ্ধাস্পদ ঋষিগণ তাঁহাকে ভৃগুবংশের উৎপত্তি বর্ণনা করিত অনুরোধ করিলেন। সৌতি তাঁহাদিগের আজ্ঞানুসারে বিস্তারিতরূপে ভৃগুবংশ কীর্ত্তন করণানন্তর রাজা জনমেজয়ের উপাখ্যান আরম্ভ করিলেন।

কোন সময়ে রাজা জনমেজয়ের পিতা মহারাজ পরীক্ষিৎ মৃগয়া করিতে গিয়া নিরপরাধে একজন তপস্বীকে অপমান করেন। তাহাতে উক্ত তপস্বীর পুত্রের অভিসম্পাতে তক্ষক দংশনে তাঁহার প্রাণ-বিয়োগ হয়। পিতার তক্ষক-দংশনে মৃত্যু হইয়াছে শুনিয়া রাজা জনমেজয় পৃথিবীস্থ সমুদায় সর্পের বিনাশার্থ সর্পযজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন। সেই যজ্ঞ-কার্য্য সমাধা হইলে পর তিনি সর্প-বিনাশ-জনিত পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিবার জন্য পুনরায় অশ্বমেধ যজ্ঞ আরম্ভ করেন। দেবরাজ ইন্দ্র সেই যজ্ঞের বিঘ্ন উৎপাদনার্থে ছেদিত অশ্বের মস্তকে প্রবেশ করত ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে আরম্ভ করিলেন। তদ্দর্শনে একটি ব্রাহ্মণকুমার বিকট হাস্য করিয়াছিলেন বলিয়া রাজা জনমেজয় তাঁহাকে সেই স্থলে বিনাশ করেন। কথিত আছে সেই ব্রহ্মহত্যা পাপে তিনি মহাব্যাধিগ্রস্ত হইলে, ব্যাসদেব তাঁহাকে মহাপাপ হইতে মুক্তির জন্য প্রিয় শিষ্য বৈশম্পায়নের নিকট মহাভারত শ্রবণ করিতে উপদেশ দেন। তাঁহার আদেশে মহর্ষি বৈশম্পায়ন তাঁহাকে ক্রমান্বয়ে অষ্টাদশপর্ব্ব মহাভারত শ্রবণ করাইয়াছিলেন।

পূর্ব্বকালে চন্দ্রবংশে শান্তনু নামে এক মহাবল পরাক্রান্ত প্রজারঞ্জন রাজা ছিলেন। তাঁহার প্রথমা ভার্য্যা গঙ্গার গর্ভে অষ্টবসু পুত্র রূপে জন্মগ্রহণ করিয়া, সর্ব্বকনিষ্ঠ ভীষ্ম ব্যতীত সকলেই গঙ্গাদেবী কর্ত্তৃক ভাগীরথী প্রবাহে নিক্ষিপ্ত হন। ঐ কনিষ্ঠ পুত্রের নিক্ষেপকালে রাজা তাঁহাকে নিবারণ করাতে গঙ্গাদেবী পুত্র রাখিয়া পূর্ব্ব প্রতিজ্ঞানুসারেতাঁহাকে ত্যাগ করিয়া যান। রাজা পুনর্ব্বার সত্যবতী নাম্নী পরম রূপবতী মৎস্যজীবীর কন্যার পাণিগ্রহণ করেন। তাঁহার গর্ভে চিত্রঙ্গদ ও বিচিত্রবীর্য্য নামে রাজার দুই কুমার জন্মগ্রহণ করেন। উক্ত কুমারদ্বয়ের শৈশবাবস্থাতেই মহারাজ

শান্তনু তনুত্যাগ করেন। মহানুভব ভীষ্ম তাহাদিগকে প্রতিপালন করিয়া চিত্রাঙ্গদের মস্তকে রাজছত্র প্রদান করেন, যেহেতুক তিনি নিজে পিতার সত্যবতী সহ বিবাহকালে, রাজ্য ও সংসার ত্যাগ করিতে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন। চিত্রাঙ্গদ চিত্ররথ নামক গন্ধর্ব্বের সহিত সমরে হত হইলে তাঁহার কনিষ্ঠভ্রাতা বিচিত্রবীর্য্যই তৎসিংহাসনে অভিষিক্ত হন। অল্পকালের মধ্যেই তাঁহার যক্ষ্মারোগ জন্মিল, সুতরাং তাঁহার মাতার আদেশে ব্যাসদেব তাঁহার ভার্য্যার গর্ভে ধৃতরাষ্ট ও পাণ্ডু এবং তাঁহার দাসীর গর্ভে বিদুর এই তিন পুত্র উৎপাদন করেন। ধৃতরাষ্ট্র জন্মান্ধ ছিলেন, সুতরাং তাঁহার অনুজ পাণ্ডু পিতার পরলোকান্তে রাজ্যাভিষিক্ত হইলেন।

গান্ধাররাজকন্যা গান্ধারী ধৃতরাষ্ট্রের মহিষী ছিলেন। পাণ্ডু কুন্তী ও মাদ্রী নামে কন্যাদ্বয়ের পাণিগ্রহণ করেন। পাণ্ডুরাজ দৈব দুর্ব্বিপাক বশতঃ ব্রহ্মশাপগ্রস্ত হইয়া স্ত্রীসম্ভোগে বঞ্চিত হইয়াছিলেন; কিন্তু তাঁহার সহধর্ম্মিণী কুন্তী বাল্যকালে দুর্ব্বাসা ঋষিকে সন্তুষ্ট করিয়া এক মন্ত্র প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, সেই মন্ত্রপ্রভাবে তিনি যে দেবতাকে স্মরণ করিতে সেই দেবতাই তাঁহার নিকট উপস্থিত হইতেন। বালসুলভ চপলতা প্রযুক্ত তিনি সূর্য্যদেবকে ঐ মন্ত্রদ্বারা স্মরণ করেন, তদনুসারে তাঁহার ঔরসে কুন্তীর এক পুত্র হয়। ঐ পুত্র মাতাকর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইলে রাধা নাম্নী এক সূতভার্য্যার দ্বারা প্রতিপালিত হয; এবং কাল প্রাপ্তে জামদগ্ন্য পরশুরামের নিকট সমুদায় যুদ্ধবিদ্যা শিক্ষা করিয়া মহাবীর কর্ণ নামে বিখ্যাত হন। পাণ্ডুপত্নী কুন্তী স্বীয় পতির আজ্ঞায়, যম, পবন ও ইন্দ্রদেবের ঔরসে ক্রমান্বয়ে যুধিষ্ঠির ভীম ও অর্জ্জুন নামে তিন পুত্র উৎপাদিত করেন। মাদ্রীরও ঐ মন্ত্র দ্বারা অশ্বিনীকুমারের ঔরসে নকুল ও সহদেব নামে যমজ পুত্র হয়। এদিকে ধৃতরাষ্ট্রের দুর্য্যোধন দুঃশাসন প্রভৃতি একশত পুত্র হইল। মহারাজা পাণ্ডু শাপ জন্য শীঘ্রই কলেবর পরিত্যাগ করিলেন, মাদ্রী তাঁহার অনুমরণ করিলেন। তদনন্তর যুধিষ্ঠিরাদি পঞ্চভ্রাতা ধৃতরাষ্ট্র কর্ত্তৃক প্রতিপালিত হইতে লাগিলেন। কিন্তু তাঁহাদের প্রতি ক্রূর-স্বভাব দুর্যোধনের হিংসা-বৃত্তি ক্রমশই পরিবর্ধিত হইতে লাগিল। তিনি এক দিবস বাল্য-ক্রীড়া করিতে করিতে মধ্যম পাণ্ডব ভীমকে বিষাক্ত মিষ্টান্ন ভোজন করাইয়া বন্ধন করতঃ পাতালে নিক্ষেপ করেন। কিন্তু ভাগ্যবলে অনন্তের অনুগ্রহে তিনি সে যাত্রা বিপদ হইতে মুক্ত হইয়াছিলেন এবং পাতাল হইতে সুধাপান দ্বারা সমধিক বলবান হইয়া হস্তিনায় প্রত্যাগমন করিলেন। ভরদ্বাজ মুনীর পুত্র দ্রোণ দ্রুপদ নামক পাঞ্চাল রাজার রাজ্যে বাস করিতেন। কোন সময়ে তৎকর্ত্তৃক অপমানিত হইয়া পাঞ্চাল রাজ্য ত্যাগ করতঃ পরশুরামের নিকট সমুদয় অস্ত্র-শিক্ষা করেন। তাঁহার ন্যায় রথী ভীষ্ম ব্যতীত আর কেহই ছিল না। তিনি এক্ষণে অশ্বত্থামা নামা পুত্রের সহিত ভীষ্মের নিকট উপস্থিত হইয়া যুধিষ্ঠির দুর্য্যোধন প্রভৃতির শিক্ষা কার্য্যে নিযুক্ত হইলেন। রাজপুত্রগণ তাঁহার নিকট সমুদয় অস্ত্রবিদ্যায় সুসম্পন্ন হইলেন, কিন্তু তৃতীয় পাণ্ডব অর্জ্জুনের ন্যায় ধনুর্ধারী হইতে কেহ পারিলেন না। ভীম ও দুর্য্যোধন উভয়েই গদাযুদ্ধে সুনিপুণ হইলেন। অশ্বত্থামাও স্বীয় পিতার নিকট উপদেশ প্রাপ্ত হইয়া এক জন অসামান্য ধনুর্ধর হইয়া উঠিলেন। পাণ্ডবেরা অচিরকাল মধ্যেই বেদবিদ্যায় ও ধনুর্ব্বিদ্যায় অত্যন্ত বিচক্ষণ হইয়াছে দেখিয়া অসূয়াপরতন্ত্র দুর্য্যোধন যৎপরোনাস্তি ক্ষুণ্ণ হইলেন এবং কি উপায়ে তাহাদিগের বিনাশ সাধন করিবেন এই চিন্তাই তাঁহার অন্তঃকরণ মধ্যে জাগরূক রহিল। তিনি কর্ণকে অদ্বিতীয় ধনুর্দ্ধর দেখিয়া তাঁহার দ্বারাই সিদ্ধ-মনস্কাম হইবেন মনে করিয়া, তাঁহাকে অঙ্গ দেশের আধিপত্য প্রদান পূর্ব্বক

তাঁহার সহিত মিত্রতা করিলেন।

এইরূপে এই প্রস্তাব রচয়িতা যুধিষ্ঠিরের যৌবরাজ্যাভিষেক ও জতুগৃহদাহ—দ্রৌপদীর স্বয়ম্বর, অর্জ্জুনের লক্ষ্যভেদ ও দ্রৌপদীর বিবাহ—প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হেতু অর্জ্জুনের তীর্থযাত্রা—খাণ্ডবদাহন—রাজসূয় যজ্ঞ—দ্যূতক্রীড়া—পাণ্ডবদিগের বনগমন—বিরাটের গৃহে অজ্ঞাতবাস—কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ—অশ্বমেধ যজ্ঞ—পাণ্ডবদিগের স্বর্গারোহণ প্রভৃতি মহাভারতোল্লিখিত বৃত্তান্ত সকল সবিস্তারে বর্ণন করিয়াছেন। বিস্তৃতি নিবন্ধন তাহা এস্থলে উদ্ধৃত করা হইতেছে না। মহাভারতের অন্তর্গত নীতি বিষয়ে তিনি যাহা লিখিয়াছেন তাহানিম্নে উদ্ধৃত হইতেছে।

দুর্য্যোধন স্বীয় অভিমান ও পাণ্ডুপুত্রগণের প্রতি চিরবিদ্বেষ বশতঃ দুষ্ট মন্ত্রী শকুনির পরামর্শে যুধিষ্ঠিরাদিকে যৎসামান্য বিষয় প্রদানেও অস্বীকৃত হইয়া কেবল আপনিই যে কালগ্রাসে পতিত হইয়াছিলেন, এমন নহে, ভূরি ভূরি ক্ষত্রিয়কুলোদ্ভব নৃপতিবর্গের বিনাশ সাধনেরও হেতু হইয়াছিলেন। অভিমান ও দ্বেষ সত্ত্বেও তাঁহার ভ্রাতৃস্নেহ ও মহত্ত্ব প্রভৃতি সদগুণ ছিল। রাজা যুধিষ্ঠির সত্যব্রততা, দয়ালুতা, ধর্ম্মানুরাগিতা প্রভৃতি সদ্গুণের আদর্শ-স্বরূপ। ভীমার্জ্জুন নকুল সহদেবের সদৃশ গুরুভক্তি দেখাইতে দ্বাপর যুগে আর কেহই দৃষ্টিগোচর হয় নাই। দ্রৌপদীর পতিগণের প্রতি অসামান্য ভক্তি ছিল। ধৃতরাষ্ট্রের স্বীয় পুত্রের প্রতি অন্যায় স্নেহ, ভীষ্মদেবের মহানুভবতা, কর্ণের দাতৃত্ব ও অহংকার, দ্রোণাচার্য্যের পুত্র-বৎসলতা ও শিষ্য-স্নেহ এবং কৃষ্ণের অপ্রতিহত বুদ্ধিকৌশল অনৈসর্গিক বোধ হয়। মহাভারতের অধিকাংশ বর্ণনাই বীর-রসে পরিপূর্ণ। স্থলবিশেষে অন্য অন্য রসও দৃষ্ট হয়। ইহার স্থলবিশেষ পাঠ করিলে হীনবল ব্যক্তিদিগেরও অন্তঃকরণ বীররসে আস্ফালিত হইতে থাকে। স্থলবিশেষ শ্রবণ করিলে নিতান্ত পাষাণ হৃদয়েরও অন্তঃকরণ দয়ায় দ্রবীভূত হইতে থাকে। যখন, পাণ্ডবেরা দ্যূতে পরাজিত হইলে দুর্য্যোধন দ্রৌপদীকে কেশাকর্ষণ পূর্ব্বক রাজসভায় আনয়ন করত তাঁহার প্রতি বস্ত্রহরণ প্রভৃতি অহিতাচার করিতে উদ্যত হইতেছে, আর মহাবাহু ভীম সেই সমুদয় অবমাননা সহ্য করিতে অক্ষম হইয়া চক্ষু রক্তবর্ণ করত এক দুই বার যুধিষ্ঠিরের প্রতি তৎপ্রতিহিংসার প্রার্থনায় দৃষ্টিপাত করিতেছে, কিন্তু যুধিষ্ঠির আজ্ঞা প্রদান করিলেন না বলিয়া আবার মস্তক অবনত করিয়া রহিতেছে,—সেই স্থলটা পাঠ করা যায়, তখন কাহার অন্তঃকরণে ক্রোধের সঞ্চার না হয়? কাহার মনেই বা যুধিষ্ঠিরের সত্যবাদিত্বের উপর দৃঢ় প্রত্যয় না হয়? এবং কাহার মনেই বা ভীমের যুধিষ্ঠিরের প্রতি দৃঢ় ভক্তি প্রত্যক্ষীভূত না হয়? যখন দুর্য্যোধন অসঙ্কুচিত চিত্তে সাত জন রথীকে একা শিশু অভিমন্যুর প্রাণ সংহার করিতে আদেশে দিলেন, আহা! সেই স্থলটি পাঠ করিলে কাহার মনে না তাহার প্রতি ঘৃণা জন্মে? যখন মহানুভব ভীষ্ম পাণ্ডবদিগকে আপন বধের উপায় বলিয়া দিলেন, পাঠ করা যায়, তখন কোন্ ব্যক্তির অন্তঃকরণ তাঁহার সদাশয়ত্ব দর্শনে অক্ষম হয়? মহাভারত আদ্যোপান্ত পাঠ করিলে জিতেন্দ্রিয়তা, দয়া, মহানুভবতা প্রভৃতি বহুবিধ সুনীতি প্রাপ্তে অন্তঃকরণ নির্ম্মল হইয়া উঠে। জ্ঞাতিবিরোধ যে কি প্রকার অনিষ্টকর এবং তাহা হইতে পৃথিবীর যে কত প্রকার অমঙ্গল ঘটিয়া উঠে, এবং যতই ক্লেশ সহ্য করিতে হউক না কেন সর্ব্বশেষে যে ধর্ম্মের জয় ও অধর্ম্মের পরাজয় হয়, মহাভারত পাঠে তদ্বিষয়ক বিশেষ উপদেশ প্রাপ্ত হওয়া যায়।

শ্রীজানকীনাথ দত্ত।

ক্ষত্রিয়জাতির দেশপ্রিয়তা ও সাহসিকতা।

"—রিপুদলবলে দলিয়া সমরে,
জন্মভূমি রক্ষাহেতু কে ডরে মরিতে?
যে ডরে, ভীরু যে মূঢ়, শতধিক তারে!"

—মেঘনাদ বধ কাব্য।

বিখ্যাত ভারত ভূমি অতি পুরাতন,
মনোরমস্থান নাই ইহার মতন।
ইথে জন্মিয়াছে কত শত মহাজন,
ঘটেছে এখানে কত অদ্ভুত ঘটন!
সুন্দর ভারত ভূমি ফল ফুলে নত,
আকাশ ভূমির শোভা কোথা আছে এত?
নদ নদী বন গ্রাম ভূধর নগর,
শস্যপূর্ণ শস্যক্ষেত্র, উদ্যান সুন্দর,
এ দেশের সম হেন কোথায় বা আছে?
সার্থক এখানে যেই জন্ম লভিয়াছে।
কত শত মহাজ্ঞানী—কত কবিগণ—
শত শত মহীপাল—মহাশূর জন—
ইহাতে জন্মিয়াছিল, কিন্তু এবে গত,
সেই সঙ্গে ভারতের পরাক্রম হত।
পূর্ব্বে যবে ভারতের ছিল একদিন,
যখন ভারতভূমি ছিলেন স্বাধীন,
আছিল তখন ইথে মহিপালগণ,
ভারত-গরিমা, সূর্য্য বংশের ভূষণ,
যখন ক্ষত্রিয় বীর বীররসে ভাসি,
সেবিতেন স্বীয় দেশ দেশ-শত্রু নাশি।
সময়ের দ্রুত গতি, কিন্তু সম নয়,
ভাগ্যলক্ষ্মী স্থিরভাবে বল কোথা রয়।
ভারতের সুখ সূর্য্য যবে অস্ত গেল,
ভাগ্যবান্ বলবান্ যবন আইল।
এহেন সময় যত হিন্দু রাজগণ,
পরস্পর গৃহরণে মত্ত সর্ব্বজন।

দারুণ হিন্দুর অরি, যবে বীরদর্প করি
আইল ভারতরত্ন করিতে গ্রহণ,
পরস্পর, নাশে ব্যস্ত ক্ষত্রিয় তখন।

তথাপি ক্ষত্রিয় নহে হীনপরাক্রম,
স্বদেশ রক্ষার্থ ধরি সিংহের বিক্রম,
বধিল যে কত অরি, যথা নলবনে করী,
অথবা মৃগের যূথে মৃগরাজ সম,
কোথায় বীরতা হেন চির নিরুপম।

নির্ভয়ে সমর ক্ষেত্রে করিয়া গমন,
সাহসে যুঝিয়া রণে করি প্রাণপণ,
মরিয়াছে শত ২, ব্যথিত সিংহের মত,
যখন শীকারি দলে করিয়া বেষ্টন,
বহু অস্ত্রাঘাতে করে তাহার নিধন।

ভারতের রত্ন দেখি লুব্ধ রাজগণ,
লভিতে করিত চেষ্টা করি আক্রমণ,
তাদের করিয়া নাশ, পুরাইয়া মন আশ,
পরাক্রমে জন্মভূমি করিতে রক্ষণ।
হায় কিন্তু সেই দিন নাহিক এখন।

পূর্ব্বে বহুকাল গত যবে ক্ষত্রগণ,
বদ্ধপরিকর সবে করিতে ভ্রমণ,
উপেক্ষিয়া আর কাজ, পরিয়া সমর-সাজ,
এক কাজে এক মনে করিত যতন,
সাধ্য কি ভারতে শত্রু আসিতে তখন?

ছিল যবে বাপ্পারাও মিবার ঈশ্বর,
ভুবন বিখ্যাত যথা চিতোর নগর,
যবনেরে পরাজিয়া, রাজপুত সৈন্য নিয়া,
সিন্ধুপারে নিজ রাজ্য করিলা বিস্তার,
কর দিয়া বহু দেশ পাইল নিস্তার।

পারসিক আরবিক বহু রাজচয়,
আক্রমি ভারত মানিয়াছে পরাজয়।
মহাশূর সেকন্দর, এসিয়ার রাজ্যেশ্বর,
ডেরায়স্ আদি সব করিয়া বিজয়,
ক্ষত্রিয়ের অস্ত্রে শেষে বীরগর্ব্ব ক্ষয়।

পরহিত, দেশহিত করিতে সাধন,
করেছে ক্ষত্রিয় নিজ জীবন অর্পণ।
সাহসে নির্ভয় করি, জীবন আশা পরিহরি,
স্নেহময় স্বদেশের করিতে রক্ষণ,
ত্যজি সুখ আশ, ত্যজি গৃহ পরিজন।

অনুপম রূপে গুণে ক্ষত্রিয়ললনা,
না দেখি রমণী দিতে তাদের তুলনা
খুলি স্বর্ণ অলঙ্কার, খুলি চারু রত্নহার,
সময়ের ব্যয় তরে দিয়াছে অঙ্গনা,
রণে পাঠায়েছে সুতে করি উত্তেজনা।

সার্থক ক্ষত্রিয় শূর! মৃতবত জন
ভারতে জন্মেছি কেন আমরা এখন?
নাহি পরাক্রম লেশ, ক্ষীণ মান পূর্ণদেশ,
তাই অধীনতা পাশে বন্ধীর মতন,
তাহে অপমান নাই—হেন নীচমন।

কোথা ক্ষত্রবীর সব—ক্ষত্র রাজগণ!
কোথা ভীষ্ম কার্ত্তবীর্য্য পাণ্ডুর নন্দন!
কোথায় হামির রায় কোথা ভীমসিংহ হায়,
কোথায় প্রতাপ আদি বীরবরগণ!
দেখুক ভারতে তারা কি দশা এখন!

যন্ত্র-বিজ্ঞান।

আত্মা ব্যতীত সকল বস্তুই মৌর্ত্তিক। মৌর্ত্তিক বলিতে যাহাতে মূর্ত্ত আছে তাহাই বুঝায়। মূর্ত্তের কোন লক্ষণ সুস্পষ্টরূপে দেওয়া বড় সুকঠিন। যত প্রাকৃত বিজ্ঞানের উন্নতি হইতেছে, ততই মূর্ত্তের নূতন ২ গুণ প্রকাশ পাইতেছে। মূর্ত্তের গুণ ব্যতিরেকে মূর্ত্তের বিষয় আমরা কিছুই জানিতে পারি না। অতএব মূর্ত্তের লক্ষণ করিতে গেলে কেবল মূর্ত্তের কতকগুলি গুণের নামোল্লেখের অধিক কিছুই হইবে না। যন্ত্রবিজ্ঞান, দৃষ্টিবিজ্ঞান, দ্রব্যবিজ্ঞান, তড়িৎবিজ্ঞান, এ সকল গুলিই প্রাকৃত বিজ্ঞানের এক ২ প্রধান প্রধান অংশ। যে বিদ্যাদ্বারা, বস্তু কি নিয়মানুযায়ী হইয়া এক স্থানে থাকে বা স্থান পরিবর্ত্তন করে, ইহা জ্ঞাত হই, তাহাকে আমরা যন্ত্র-বিজ্ঞান কহিয়া থাকি। যন্ত্র বিজ্ঞান দুই অংশে বিভক্ত। (১) স্থিতি বিজ্ঞান, (২) গতি বিজ্ঞান।

(১) বলের কার্য্য হইলে পরও যদি কোন দ্রব্য সাম্যাবস্থায় থাকে, তাহা হইলে যে বিদ্যা দ্বারা সেই সমস্ত বলের সম্বন্ধ বিষয় জানিতে পারি তাহাকে স্থিতি-বিজ্ঞা কহিয়া থাকি।

(২) যে বিষয়ে বল দ্বারা সঞ্চালিত বস্তুর বিষয় বিবেচনা করি তাহাকে আমরা গতি-বিজ্ঞান কহিয়া থাকি।

উপরোক্ত লক্ষণ মধ্যে বল কথাটির ব্যবহার করা হইয়াছে। বলের লক্ষণ নিম্নলিখিরূপে করা যাইতে পারে। গতি বা স্থিরতা বিশিষ্ট অবস্থার পরিবর্ত্তনকারী যে কারণ, তাহাকে আমরা বল কহিতে পারি। যন্ত্র বিজ্ঞানের লক্ষণ গতির ক্ষেত্রতত্ত্ব বলিলেও বলা যায়। যন্ত্র বিজ্ঞানের বিষয় জানিবার পূর্ব্বে মূর্ত্তের নিম্নলিখিত মৌলিক ধর্ম্ম কয়েকটী জানা কর্ত্তব্য। সকল মূর্ত্তিক পদার্থ ঘনত্ব, আয়তন, বিভাজ্যতা, তরলতা, স্থিতিশীলতা, আকর্ষণ, প্রত্যাকর্ষণ বা নিরাকরণ বিশিষ্ট।

ঘনত্ব বা অবকাশব্যাপীত্ব,—দুইটী মূর্ত্তিক পদার্থ এক সময়ে এক স্থানে থাকিতে না পারা যে মূর্ত্তের গুণ তাহাকেই বলে। যথা, একটী পয়সা যে স্থানে রহিয়াছে তথায় আর একটী পয়সা বা অন্য একটী পদার্থ রাখিতে হইলে সেই প্রথম পয়সাটীকে অগ্রে স্থানান্তরিত করিতে হয়। অথবা জলে কোন বস্তু নিক্ষেপ করিলে সেই স্থানের জল চারি পার্শ্বে সরিয়া যায়।

আয়তন,—উপরোক্ত পরীক্ষা দ্বারা এই গুণ প্রকাশ পায়, বস্তুবিশেষে বিশেষ বিশেষ স্থান ব্যাপিয়া রহিয়াছে।

বিভাজ্যতা,—সকল মূর্ত্তিক পদার্থ যত ক্ষুদ্র হউক না কেন, তাহাকে আরও ছোট ছোট ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে। যথা,—অতি ক্ষুদ্র রেণুকেও আরও ছোট ছোট ক্ষুদ্র ভাগে বিভক্ত করা যায়। কোন বস্তুর গন্ধ, ঘ্রাণ-শক্তি দ্বারা জ্ঞাত হইবার কালীন সেই বস্তুর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রেণু বায়ুর সহিত মিশ্রিত হইয়া আমাদের ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের সহিত সংসর্গ দ্বারা গন্ধজ্ঞান জন্মাইয়া দেয়। মৃগনাভির গন্ধ একটী ঘরে ২০ বৎসর কালের অধিককাল থাকে অর্থাৎ ২০ বৎসরেও সেই সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রেণু ক্ষয় হয় না।

বারুদে অগ্নি প্রদান করিলে ২৪৪ পরিমাণে স্থূলতর হয়। জল তাতদ্বারা ধূমাকার প্রাপ্ত হইলে ১৮০০ পরিমাণে তরল অবস্থা অপেক্ষা স্থূলতর হয় ইত্যাদি। মূর্ত্তের যে উপরোক্ত গুণ তাহাকে আমরা বিভাজ্যতা কহিয়া থাকি।

তরলতা,—সকল মূৰ্ত্তিক বস্তুকে এক স্থান হইতে যে স্থানান্তরিত করা যায়, তাহাকেই তরলতা কহা যায়।

আকর্ষণ,—মূৰ্ত্তিক বস্তুদিগের একত্রে আনিবার আশয়কে আকর্ষণ কহে। আকর্ষণ ৫ প্রকার। তন্মধ্যে দুইটী আকর্ষণ আমাদিগের জানা কর্ত্তব্য, সংসক্তি আকর্ষণ ও গুরুত্ব বিষয়ক আকর্ষণ। দুইখানি কাচ যদি একত্র করা যায়, তাহা হইলে সেই দুইটীকে ভিন্ন করিবার জন্য কিঞ্চিৎ বল প্রদানের আবশ্যক করে। সেই কাচের একত্র থাকিবার আশয়কে সংসক্তি আকর্ষণ কহা যায়। গুরুত্ব বিষয়ক আকর্ষণের সংসক্তি আকর্ষণ হইতে এই প্রভেদ যে গুরুত্ব আকর্ষণ, একটী বস্তু যতদূরে থাকুক না কেন, তদুপরি তাহার কার্য্য হইতে থাকে। গুরুত্ব বিষয়ক আকর্ষণ দ্বারা চন্দ্র সূর্য্য নিজ নিজ স্থানে রহিয়াছে। কোন একটী বস্তুকে উর্দ্ধদিকে নিক্ষিপ্ত করিলে শীঘ্র নিম্নে পতন হয়, ইহা পৃথিবীর আকর্ষণ-শক্তিবশতঃ।

যে পরিমাণে একটী বস্তুতে মূৰ্ত্ত আছে, সেই পরিমাণে তাহার গুরুত্ব স্বল্প বা অধিক হইয়া থাকে। এই কারণবশতঃ একটী পালক ও একটী টাকা একত্রে উর্দ্ধ হইতে নিক্ষিপ্ত হইলে একত্রে ভূমে পতিত হয়। (Experiment to be seen within an Air Pump). বায়ু শোষক যন্ত্রের ভিতরে পরীক্ষা করিতে হইবে, কারণ ঐ টাকাতে অধিক মূৰ্ত্ত আছে বলিয়া আকর্ষণ জন্য অধিক শক্তির আবশ্যক হয়, এই কারণবশতঃ অধিক বেগে গতি হইতে পারে না। পৃথিবী হইতে সমান দূরে সকল স্থানে আকর্ষণ শক্তির সমান আধিক্য। এই বিষয়টী পরিদোলক পরীক্ষা দ্বারা স্পষ্ট প্রতীয়মান্ হয়। উত্তরমেরুতে সেকেণ্ড গণনা জন্য পরিদোলকের দীর্ঘতা যেরূপ, তদপেক্ষা নাড়ীমণ্ডলের নিকটবর্ত্তী যে পরিমাণে হইবে, সেই পরিমাণে পরিদোলকের দীর্ঘতা ছোট করা আবশ্যক। কারণ, পৃথিবী ঠিক গোলাকার নয়। আকর্ষণ পৃথিবীর উপরিস্থলে অন্য সকল স্থান অপেক্ষা অধিক, নিম্নে বা উর্দ্ধে আকর্ষণ শক্তি ক্রমশঃ অল্প হইয়া আইসে।

একটী বস্তু নিম্নে নিক্ষিপ্ত হইলে পর আকর্ষণবশতঃ প্রথম সেকেণ্ডে সামান্যতম সংখ্যায় ১৬ ফুট ১০ হাত পতিত হয়। দুইটী বস্তু যদি পৃথিবীর আকর্ষণ ও অন্যান্য সকল প্রকার বাহ্য পদার্থের আকর্ষণ বিবর্জ্জিত হইয়া শূন্যে স্থিত হইত, তাহা হইলে নিজ নিজ আকর্ষণ ক্রমে কিঞ্চিৎ সময় মধ্যে দুইটী দুইটীর মধ্যাংশে আসিয়া একত্রিত হইত। একত্রিত হইবার স্থল যে পরিমাণে মূৰ্ত্ত আছে সেই পরিমাণে নির্ণীত হয়।

আকর্ষণ দ্বারা বস্তুর গতি ক্রমশঃ বৃদ্ধি হয়। কারণ, আকর্ষণের কার্য্য সকল সময়ে সকল অবস্থায় হইয়া থাকে। যথা, এক মিনিটে এক ক্রোশ গমনের শক্তি থাকিলে দ্বিতীয় মিনিটে দুই ক্রোশ গতির শক্তি হইবে।

সমান পরিমাণে বৰ্দ্ধিত গতিকে Acceleration কহা যায়। যে কোন পদার্থ হউক না কেন, যদি তাহার গতি সমান রূপে বৰ্দ্ধিত হয়, তাহা হইলে বিজোড় সংখ্যা ১৩৫৭... এই পরিমাণে স্থল পরিভ্রমণ করিবে। যথা, প্রথম সেকেণ্ডে ১ ফুট বা ১ হাত বা ১ ক্রোশ গতি হইলে দুই সেকেণ্ডে তাহা ৩ ফুট বা ৩ হাত বা ৩ ক্রোশ গতি হইবে।

আকর্ষণ জন্য বস্তুদের গতি পতনকালে সমানরূপে বৰ্দ্ধিত হয়; উর্দ্ধদিকে নিক্ষেপ করিলে আকর্ষণ জন্য গতি সমানরূপে স্বল্প হইয়া আসে। একটী দ্রব্য উর্দ্ধদিকে নিক্ষেপ করিলে যে সময়ে

তাহার গতি নষ্ট হয়, পতন অবস্থায় সেই গতি প্রাপ্ত হইবার জন্য সেই সময় ও সমান দীর্ঘ স্থল পরিভ্রমণ করা আবশ্যক করে।

আকর্ষণ ও গুরুত্ব একই পদার্থ নহে। আকর্ষণ ও গুরুত্ব এই দুইটী মধ্যে কার্য্যকারণ ভাব। গুরুত্ব আকর্ষণের কার্য্য। আকর্ষণ স্বল্প হইলে গুরুত্বও স্বল্প হইয়া আসে। ইহার দৃষ্টান্ত, বেলুনের উপরে কোন দ্রব্য ওজন করিলে পৃথিবীর উপরিভাগ অপেক্ষা অনেক অল্প ভারি বোধ হয়।

প্রত্যাকর্ষণ,—আকর্ষণের বিপরীত গুণকে প্রত্যাকর্ষণ বা নিরাকরণ কহা যায়। আকর্ষণের কারণ প্রদর্শন করা যেমন অতি সুকঠিন, নিরাকরণের কারণ প্রদর্শনও সেইরূপ। বিলাতীয় একজন দর্শনকার Dr. Knight কহিয়াছেন যে, সকল বস্তুতে যে তাড়িৎ আছে, তাহাতেই নিরাকরণ বা প্রত্যাকর্ষণ জন্মিয়া থাকে।

প্রত্যাকর্ষণ থাকাতে জল ও তেলেতে মিশ্রিত হইতে পারে না। ইত্যাদি।

Motion গতি

গতির কোন লক্ষণ দেওয়া বড় সুকঠিন। গতিকে স্থান পরিবর্ত্তন বলিলে হয়, কিন্তু তাহা হইলে গতিকে গতি বলা অপেক্ষা কিছু অধিক বলা হইল না। গতি দ্বারা আমরা সকল বস্তুর স্থায়িত্ব বিষয়ে জ্ঞাত হই। কোন কার্য্য গতি ব্যতিরেকে সাধন হয় না। গতি দুই প্রকার; নিরপেক্ষ গতি ও আপেক্ষিক গতি।

একটী বস্তু যে স্থানে স্থিত, যখন সেই স্থানটী, আরো একটী বস্তু যে স্থানে স্থিত, তাহার সহিত তুলনা করিয়া দেখি এবং সেই বস্তু অন্য অন্য বস্তুর সম্বন্ধে কিরূপ স্থান পরিবর্ত্তন করে, তাহা বিবেচনা করি, তখন আমরা তাহার আপেক্ষিক গতির বিষয় বিবেচনা করিয়া থাকি।

কিন্তু সকলপ্রকার গতিই নিরপেক্ষ গতির মধ্যে ধর্ত্তব্য। কারণ, গতি হইলেই স্থান পরিবর্ত্তন হইবে, কিন্তু গতি বিষয়ে আমাদের যে জ্ঞান জন্মায় তাহা কেবল আপেক্ষিক গতি বিষয়ে।

যথা, দুইখানি জাহাজ সমান বেগে যদি ক্রমশঃ একদিকে চলিতে থাকে, তাহা হইলে প্রত্যেক জাহাজের লোকেরা অন্য জাহাজখানি গতিহীন বলিয়া বোধ করিবে। অথবা, পৃথিবীর গতি দ্বারা পৃথিবীর উপরিস্থ সকল প্রকার দ্রব্যের গতি হইতেছে, কিন্তু সে গতি বিষয়ে আমাদিগের কোন জ্ঞান জন্মায় না। অথবা, যদি দুইখানি জাহাজ দুই বিপরীত দিকে সমান বেগের সহিত যায়, তাহা হইলে একখানি জাহাজস্থিত ব্যক্তিরা অন্য জাহাজখানির যথার্থ গতি অপেক্ষা দ্বিগুণ গতিবেগ বিবেচনা করিবে। এইরূপ বোধ হইবার কারণ এই যে, যখন আমরা কোন দ্রব্যের গতি বিষয়ে বিবেচনা করি, তৎকালে আমরা আপনারা স্থির রহিয়াছি এইরূপ মনে করিয়া লই।

কোন দ্রব্যের নিক্ষেপ দ্বারা যে গতি প্রাপ্ত হয় তদ্বিষয়ে আমরা যৎকিঞ্চিৎ জ্ঞাত আছি।

উপরোক্ত দুই প্রকার গতি হইতে বিভিন্ন আর এক প্রকার গতি আছে, যদ্দ্বারা গাছ মনুষ্য ও অন্যান্য জীব সমুদায় প্রতিদিন বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতে থাকে। সকল প্রকার গতির বিষয় বিবেচনা করিলে স্পষ্ট বোধ হইবে যে, সকলপ্রকার পদার্থই গতি-বিশিষ্ট।

গতির বিষয় বিবেচনা করিতে হইলে নিম্নলিখিত কয়েকটী বিষয় আমাদের জানা কর্ত্তব্য;—

(১) যে কারণ দ্বারা গতি হইতেছে,

(২) গতির বেগ ও দিক্ নিরূপণ,

(৩) গতি-বিশিষ্ট দ্রব্যে কত মূর্ত্ত আছে,

(৪) কতদূর গতি হইতেছে,

(৫) সেই স্থল পরিভ্রমণে কত সময় আবশ্যক হইল,

(৬) কত বেগ সহিত সেই দ্রব্য অন্য কোন এক দ্রব্যেতে আঘাত করিতেছে।

দ্রব্যসমূহের উপরোক্ত যে জড়তা শক্তির বর্ণনা করা হইয়াছে, তদ্দ্বারা সকল প্রকার অবস্থা পরিবর্ত্তনে বাধা জন্মে। কোন বস্তু স্থির থাকিলে তাহা স্থিরই থাকে, যদি না অন্য কোন বাহ্য কারণ দ্বারা গতি প্রাপ্ত হয়। গতি প্রাপ্ত হইলে তাহার গতি রোধ জন্য বাহ্য বলের আবশ্যক করে। কোন বস্তুকে গতি প্রদান করিতে হইলে, বায়ু জল আকর্ষণ ও দ্রব পদার্থের স্থিতিস্থাপকতা ও অন্যান্য জীব ও মনুষ্যের গতি হেতু শক্তির ব্যবহার করা হয়। কোন্ দ্রব্য কত দূর কত সময়ে পরিভ্রমণ করিতেছে, ইহা বিবেচনা করিয়া, গতির কত বেগ তাহা আমরা জানিতে পারি। যত অল্প সময়ে যত অধিক দূর পরিভ্রমণ হয়, ততই গতির বেগ অধিক বলিয়া থাকি। গতির বেগ নির্ণয় করিবার জন্য আমরা সময় দ্বারা পরিভ্রমিত স্থলকে ভাগ করিয়া থাকি। যথা, ১০০০ ক্রোশ ১০ মিনিটে পরিভ্রমণ করিলে ১ মিনিটে ১০০ ক্রোশ পরিভ্রমণ করে, অর্থাৎ ১০০ ক্রোশ সেই বস্তুর গতিবেগ। যদি দুইটী বস্তুর গতিবেগ তুলনা করিতে হয়, যথা, একটী বস্তু ৬০ ক্রোশ ৬ মিনিটে পরিভ্রমণ করে, আর একটী বস্তু ৯০ ক্রোশ ১০ মিনিটে পরিভ্রমণ করে, তাহা হইলে

প্রথম বস্তুর গতিবেগ : দ্বিতীয় বস্তুর গতিবেগ :: ১০ : ৯। কোন দ্রব্য এক নিয়োজিত সময় মধ্যে কত পরিভ্রমণ করিতে পারে, ইহা জানিবার নিমিত্ত সময়কে গতিবেগ দিয়া গুণ করিতে হয়, সেই গুণফল পরিভ্রমিত স্থলের সমান। কারণ, গতিবেগ কিম্বা সময় বৃদ্ধি করিলে স্থল পরিভ্রমণ সেই পরিমাণে অধিক হয়।

এইরূপে গতি-বেগ দ্বিগুণ করিলে, নির্দ্ধারিত সময় মধ্যে দ্বিগুণ স্থল পরিভ্রমণ হইবে। অথবা যদি সময় দ্বিগুণ করা হয় কিন্তু গতিবেগ অগ্রে যেরূপ ছিল সেই রূপই থাকে, তাহা হইলে স্পষ্টই দেখা যাইতেছে যে, দ্বিগুণ স্থল পরিভ্রমণ করিবে।

গতি বিশিষ্ট পদার্থ যখন কোন বিশেষ দিকে চালিত হয়, তখন তাহার গতিকে সরল গতি কহা যায়। কিন্তু যখন ক্রমশঃ দিক্ পরিবর্ত্তন করিতে থাকে, তৎকালে তাহার গতিকে বক্রগতি বলা যায়।

কোন এক বিশেষ দিকে গতি বিশিষ্ট পদার্থ সেই দিকে দুই তিনটী সঞ্চালন-সামর্থ্য সম্পন্ন বল দ্বারা সঞ্চালিত হইলে, তাহার গতি সেই দিকেই থাকে, কেবল বেগের স্বল্পতা বা আধিক্য হয়। কিন্তু যদি ভিন্ন ভিন্ন দিকে সঞ্চালন-সামর্থ্য থাকে, তাহা হইলে সেই বস্তু সঞ্চালিত হয়, নিম্নলিখিত নিয়ম দ্বারা তাহাদের বিশেষ বিশেষ গতি নির্ণয় করা যায়।

দুই বলের যোগে, সেই বলদ্বয় প্রতিরূপ যে দুই সরল রেখা, তদুপরি সমান্তরাল চতুর্ভুজ ক্ষেত্রের কর্ণরেখা ক্রমে গতি হইয়া থাকে।

দুই তিন বল দ্বারা সঞ্চালিত দ্রব্য আমরা সচরাচর অনেক দেখিতে পাই। একখানি নৌকা বায়ুভরে ও জলস্রোতে চলিতে থাকে। গাড়ি চলিতাবস্থায় যদি আমরা লম্ফন করি তাহা হইলে তাহাও এই প্রকার গতির ভিতর বিবেচ্য।

যদি একটী বস্তুর গতি নির্দ্ধারিত সময়ে সময়ে ক্রমশঃ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় তাহা হইলে, সেই গতির বেগ বৃদ্ধি হইতেছে, এইরূপ কহিয়া থাকি। যদি তাহার ক্রমশঃ গতি ক্ষয় হইয়া আইসে, তাহা হইলে তাহার গতি (Retarded) অর্থাৎ হ্রাস প্রাপ্ত হইতেছে, কহিয়া থাকি। আকর্ষণ দ্বারা দ্রব্য নিম্নদিকে পতিত হইলে তাহার গতিবেগ ক্রমশঃ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়, উর্দ্ধে নিক্ষিপ্ত হইলে তাহার গতি-বেগের হ্রাস হয়। এই বিষয়টী অনেক কৌশল দ্বারা স্থির হইয়াছে। যদি একটী দ্রব্যকে সরল রেখা পরিভ্রমণ করিবে বলিয়া নিক্ষিপ্ত করা যায়, তাহা হইলে সেই দ্রব্যটী সমান সরল রেখা পরিভ্রমণ না করিয়া, আকর্ষণ দ্বারা আকর্ষিত হইয়া, ক্ষেপণী রেখাতে গতি হয়। ক্ষেপণী রেখাতে পরিভ্রমণ করা, ইহা গেলিলিও কর্ত্তৃক নির্ণীত হইয়াছিল। বায়ু দ্বারা বাধিত হয় বলিয়া, ঠিক ক্ষেপণী রেখাতে পতন হয় না। গতি হইবার কালে যে বলের আবশ্যক করে, তাহা নির্ণয় জন্য আমরা গতির বেগ এবং দ্রব্যের গুরুত্বতে গুণ করিয়া থাকি। এবং যত পরিমাণে সেই গুণফল অধিক হয়, সেই পরিমাণে আমরা বলটীকে অধিক বলবতী বা স্বল্প বলবতী বলিয়া থাকি। ঐ গুণফলটীকে আমরা সেই বস্তুর (Momentum) ভার-শক্তি কহিয়া থাকি। এই রূপে আমরা দেখি যে দুইটী বস্তুর সমান বেগ হইলে, তাহাদের ভার-শক্তি তাহাদের মূর্ত্তিক পরমাণু পরিমাণে হইয়া থাকে। কিন্তু গতি-বেগ বিভিন্ন হইলে সেই গতি-বেগ পরিমাণে তাহাদের ভার-শক্তি (Momentum) হইয়া থাকে। উপরোক্ত নিয়মটি প্রাকৃত বিজ্ঞানের নিয়ম সমূহের মধ্যে একটী প্রধান নিয়ম।

উপর উক্ত বর্ণনা মধ্যে এক প্রকার গতির নিয়ম সমুদায় দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু প্রাকৃত বিজ্ঞান মধ্যে ঐ নিয়মগুলি সুচারুরূপে জানা সর্ব্বাগ্রে আবশ্যক। তজ্জন্য পরিষ্কার রূপে সেইগুলি নিম্নে লিখিত হইল।

গতির নিয়ম

(১) সকল বস্তু জড়তা গুণবিশিষ্ট; অর্থাৎ যখন স্থির অবস্থায় থাকে বা গতি বিশিষ্ট হয়, তখন সেই সেই বস্তু সেই সেই অবস্থায় থাকে, যদি না কোন বাহ্য কারণ দ্বারা তাহারা সেই সেই অবস্থা-বিবর্জ্জিত হয়। "জড় পদার্থ নিশ্চেষ্ট"।

(২) "জড়ের প্রতি যত বল কেন একবারে দেওয়া যাউক না, সকল বলগুলি স্ব স্ব অভিমুখে সরল রেখা ক্রমে উহার গতি উৎপাদন করে"।

(৩) কার্য্য কারণের সমান ভাব। যথা, দুইটী বস্তুর মধ্যে যদি একটী আর একটীকে আসিয়া আঘাত করে, তাহা হইলে দুইটীর আঘাত সমান ও বিপরীত দিকে কার্য্য করে।

গতির নিয়ম তিনটী অনেক পরিশ্রমের ফল। এই নিয়ম তিনটীর যথার্থ্য বিষয়ে অনেক প্রকার প্রমাণ দেওয়া যায়। তন্মধ্যে নিম্নলিখিত প্রমাণটী সর্ব্বোৎকৃষ্টর প্রমাণ। এই নিয়ম সমুদয় স্বীকার করিয়া যে সকল জ্যোতিষ-ঘটনা গণনা করা যায়, তাহা একবারে সম্পূর্ণরূপে আমাদের তদ্বিষয়ে দর্শন-শক্তিজনিত জ্ঞানের সহিত মিলিত হয়।

এতদ্ব্যতীত অনেকানেক তুচ্ছ বিষয় হইতে আমরা এই সমুদায়ের যাথার্থ্য পরীক্ষা করিতে পারি। যথা, একখানি গতি-বিশিষ্ট জাহাজের মধ্যে একটী গোলা উৰ্দ্ধে নিক্ষেপ করিলে যে স্থান হইতে সেই গোলা নিক্ষিপ্ত হয়, সেই স্থানেই পতিত হয়, জাহাজের গতি হেতু সেই গোলা পশ্চাতে পতিত হয় না। এই বিষয়টী দ্বারা দ্বিতীয় নিয়মটির যাথার্থ্য স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে।

একজন অশ্বারোহী ব্যক্তি, অশ্ব দ্রুতগামী হইয়া দৌড়িতেছে, এমন সময়ে অশ্ব হইতে উৰ্দ্ধে লম্ফন করিয়া পুনরায় সেই অশ্বের উপর বসে। এই বিষয়টী অতি আশ্চর্য্য ও অনেক কৌশল ও ভরসার কার্য্য, কিন্তু ইহা ঐ দ্বিতীয় নিয়মটী অনুযায়ী হইয়া কার্য্য করা ব্যতীত আর কিছুই নয়। কারণ, সেই ব্যক্তি লম্ফন কালে তাহারও সেইদিকে সমান বেগে গতি হইয়া থাকে।

অন্যান্য নিয়ম সমুদায়ের প্রমাণ, সচরাচর দেখিতে পাই, এমন ঘটনা হইতে দেওয়া যায়।

মাধ্যিক বল

Central Forces

সকল বস্তুর সরল রেখাতে গতি হইবার আশয় আছে। যখন আমরা কোন বস্তু বক্র গতি-বিশিষ্ট দেখিতে পাই, তখন এ বিষয় আমরা নিশ্চয় স্থির করিতে পারি যে, বস্তুটীর স্বাভাবিক গতি দুইটী বল দ্বারা বিনষ্ট হইয়াছে। এবং ইহাও নিশ্চয় স্থির করিতে পারি যে, কোন উপায় দ্বারা সেই দুইটী বল বিনষ্ট করিতে পারিলে সেই বস্তু পুনরায় সরলরেখা-গতি-বিশিষ্ট হইবে। দুইটী বলের মধ্যে একটীকে আমরা কেন্দ্রাভিমুখ বল ও অপরটিকে কেন্দ্রত্যাগী বল কহিয়া থাকি। যে বল দ্বারা সেই বস্তুর বৃত্ত-স্পর্শক রেখা ক্রমে গতি হইবার আশয় থাকে, তাহাকে কেন্দ্রত্যাগী বল কহিয়া থাকি। যদ্দ্বারা কোন বিশেষ কেন্দ্রাভিমুখে সঞ্চালিত হয়, তাহাকে কেন্দ্রাভিমুখ বল কহিয়া থাকি। কেন্দ্রাভিমুখ বল ও কেন্দ্রত্যাগী বল দুইটীকে একত্রে আমরা মাধ্যিক বল কহিয়া থাকি। মাধ্যিক বল দ্বারা সঞ্চালিত পদার্থ আমরা অনেক দেখিতে পাই। এইরূপ বল দ্বারা সঞ্চালিত হইয়া পৃথিবী চন্দ্র ও অন্যান্য গ্রহগণ অণ্ডাকার বৃত্তেতে সূর্য্যের চারিপার্শ্বে ঘুরিতেছে। জ্যোতিষশাস্ত্র শিক্ষা করিবার পূর্ব্বে গতি-বিজ্ঞান উত্তম রূপে জানা কর্ত্তব্য। লাড়িরিয়র নামক একজন ফরাসিস জ্যোতির্ব্বেত্তা গতি-বিজ্ঞানের নিয়ম অনুযোগ দ্বারা নেপচুন নামক গ্রহের আবিষ্ক্রিয়া করেন। তিনি অন্যান্য গ্রহগণের অণ্ডাকার বৃত্তিতে গোলযোগ দেখিয়া সেই গোলযোগের কারণ জানিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। অবশেষে গণনা দ্বারা দেখিলেন যে একটী গ্রহ অবশ্য থাকিবে, যদ্দ্বারা এই গোলযোগ উপস্থিত হইতেছে। পরে গণনা দ্বারা সেই গ্রহ কতদূরে স্থিত, কোনখানে স্থিত, এবং কত বড় তাহা ঠিক করিয়াছেন। পরে দূরবীক্ষণ দ্বারা সেই গ্রহের স্থায়িত্ব মিশ্চিত হইয়াছিল।

ভারকেন্দ্র

Centre of Gravity

সকল পদার্থ মধ্যে একটী বিন্দু আছে, যাহাকে ভারকেন্দ্র কহা যায়। বস্তু-মধ্যে যে বিন্দু স্থিরতা প্রাপ্ত হইলে বস্তুর সকল অংশ সকল অবস্থায় স্থিরতা প্রাপ্ত হয়, তাহাকেই ভারকেন্দ্র কহা যায়। সকলেই জানে যে একটী যষ্টিকে অঙ্গুলীর উপর স্থির রাখিবার নিমিত্ত সেই যষ্টির মধ্যভাগ আমাদের

অঙ্গুলীর উপর রাখিতে হয়। অর্থাৎ সেই যষ্টির ভার-কেন্দ্র তাহার মধ্যভাগে স্থিত। যষ্টির যদি এক দিক্ সূক্ষ্ম ও এক দিক্ মোটা হয়, তাহা হইলে যষ্টিকে দুই ভাগে বিভক্ত বিবেচনা করিলে, সূক্ষ্ম দিক্ দীর্ঘে অনেক বড় হয়। অর্থাৎ যে দিক অধিক মোটা সেই দিকে অধিক মূর্ত্ত আছে বলিয়া ভারকেন্দ্র সেই দিকের নিকটেই হইয়া থাকে। এই জন্য দুইটী সমান ভারী বস্তুর ভার-কেন্দ্র সেই দুইটী বস্তুর ভার-কেন্দ্র সংযোগকারী সরল রেখার মধ্যভাগ হইয়া থাকে। যদি একটী বস্তু আর একটী বস্তু অপেক্ষা দ্বিগুণ ভারী হয় তাহা হইলে সেই লঘু বস্তু হইতে ভার-কেন্দ্রের দূর গুরু-পদার্থ হইতে ভার-কেন্দ্রের দূরের দ্বিগুণ হয়। যে পরিমাণে মূর্ত্ত থাকে, সেই পরিমাণে দূর নির্ণয় হয়। কারণ, ভার-কেন্দ্র স্থির থাকিলে বস্তুর অন্য সকল অংশ সকল অবস্থায় স্থির থাকা আবশ্যক। অর্থাৎ এক ধারের ভার দ্বারা ভার-কেন্দ্র হইতে তাহার দূরকে গুণ করিলে সাম্যাবস্থা জন্য অন্য দিকের ভার দ্বারা ভ্যর-কেন্দ্র হইতে তাহার দূরকে গুণ করিলে দুইটী গুণফল সমান হওয়া আবশ্যক। এই দুইটী গুণফল সমান না হইলে সাম্যাবস্থা থাকিতে পারে না। একটী বস্তুর সমস্ত ভার তাহার ভার-কেন্দ্রের ভিতর দিয়া ঊর্দ্ধ রেখা ক্রমে কার্য্য করিতে থাকে। এই জন্যই সেই ঊর্দ্ধ রেখাকে ভার-কেন্দ্রের দিক্ নিরূপণী রেখা বলে। ভার-কেন্দ্রের দিক্ নিরুপণী রেখা, কোন বস্তুর তলা যে স্থল ব্যাপিয়া রহিয়াছে, তন্মধ্যে পড়িলে সেই অবস্থায় বস্তু দণ্ডায়মান থাকিতে পারে, কিন্তু তাহা না হইলে বস্তু সে অবস্থায় থাকিতে পারে না।

কোন নৌকা উল্টাইয়া পড়িবার কালে তন্মধ্যস্থিত ব্যক্তিরা দণ্ডায়মান হইলে, সেই নৌকার উল্টাবার অধিক সম্ভাবনা। কারণ, তাহা হইলে ভার-কেন্দ্রের দিক্ নিরূপণী রেখা তলার বাহিরে পড়িবার অধিক সম্ভাবনা। তজ্জন্য নৌকা যখন টলমল্ করে তখন তন্মধ্যে আমাদের স্থির হইয়া বসিয়া থাকিলে বাঁচিবার অধিক সম্ভাবনা থাকে।

একটী বস্তুর তলা যে পরিমাণে মোটা হয় সেই পরিমাণে তাহা উল্টাইবার অল্প সম্ভাবনা।

মনুষ্য বেড়াইবার কালে তাহাদের দুই পদের মধ্যস্থলে ভার-কেন্দ্র দিক্ নিরূপণী রেখা পতিত হয়। যখন কোন ভার পৃষ্ঠের উপর করা যায়, তৎকালে দণ্ডায়মান থাকিবার নিমিত্ত সেই মনুষ্যকে সম্মুখে নত হইতে হয়। যে সকল লোক বাঁশ বাজী করিয়া থাকে, তাহারা রজ্জুর উপর বেড়াইবার কালে হস্তে একটা বাঁশ লইয়া যায়। ইহার কারণ কেবল ভার-কেন্দ্র নিরূপণী রেখা তাহার পদতল মধ্যে রজ্জুর উপর পড়িবার জন্য।

যন্ত্র সমুদায়ের বিবরণ

নিম্নলিখিত যন্ত্র কয়েকটী সচরাচর ব্যবহার করা হয়।—

(১) দণ্ড যন্ত্র।

(২) কপিকল যন্ত্র।

(৩) অক্ষচক্র যন্ত্র।

(৪) ক্রম-নিম্ন ধরাতল।

(৫) কালজা।

(৬) স্ক্রু যন্ত্র।

প্রাকৃত বিজ্ঞানে যে সমুদায় বর্ণনা করা হইয়াছে এবং যাহা কিছু যন্ত্র বিষয়ে বর্ণনা করা যায়, তন্মধ্যে নিম্নলিখিত কয়েকটী বিষয় স্বীকার করিয়া লইতে হইবে।

(১) পৃথিবীর উপরি ভাগের অল্প খণ্ড সমধরাতল বলিয়া বিবেচনা করি, যদিও তাহা সেরূপ নয়।

(২) আকর্ষণ বশতঃ সকল বস্তুই পৃথিবীর কেন্দ্রাভিমুখে পতিত হয়।...

(৩) কোন বলের কার্য্য তাহার দিক্ নিরূপণী সরল রেখার সর্ব্ব স্থানে সমান।

(৪) যদিও কোন ভূমি ও যন্ত্র একবারে সমান (Smooth) নয়, তথাচ সামান্যতঃ সেই সমুদায়কে সমান বলিয়া বিবেচনা করি।

সরল-দণ্ড যন্ত্র

এক লৌহ বা কাষ্ঠ নির্ম্মিত দীর্ঘাকার দণ্ডকে দণ্ড-যন্ত্র বলা যায়। দণ্ড-যন্ত্র বলিলে তিনটী বিষয় বিবেচনা করা কর্ত্তব্য; (১) ভারাশ্রয়ী পদার্থ, যদুপরি অবলম্বের ন্যায় দণ্ড-যন্ত্র ঘুরিতে পারে, (২) অবলম্বের দুই পার্শ্বে দণ্ডের দুই ভুজ...

"অবলম্ব বল ও ভারের বিনিবেশ ক্রমে এই দণ্ড-যন্ত্র তিন প্রকার হইতে পারে।"

(১) প্রথম প্রকারে ভারাশ্রয়ী পদার্থের দুই দিকের মধ্যে এক দিকে বল প্রদান করা হয়, আর এক দিক গুরুত্ব বিশিষ্ট পদার্থতে প্রয়োগ করা হয়।

(২) দ্বিতীয় প্রকারে ভারাশ্রয়ী পদার্থ অর্থাৎ অবলম্ব এক শেষে ও অন্য শেষে বল প্রদায়িকা পদার্থ থাকে এবং মধ্যে ভার-বিশিষ্ট পদার্থ।

(৩) তৃতীয় প্রকারে ভারাশ্রয়ী পদার্থ ও গুরুত্ব-বিশিষ্ট পদার্থের মধ্যে বল প্রয়োগ করা হয়।

ভারাশ্রয়ী পদার্থ হইতে বল প্রয়োগে স্থলের দীর্ঘতা বল দ্বারা গুণ করা হইলে, সেই গুণফলটীকে আমরা বলের ভার-শক্তি কহিয়া থাকি। ঐরূপে ভারাশ্রয়ী পদার্থ হইতে যন্ত্রের আর শেষ পর্য্যন্ত পদার্থের গুরুত্ব দ্বারা গুণ করা হইলে, সেই গুণ-ফলটিকে আমরা সেই গুরুত্ব বিশিষ্ট পদার্থের ভার-শক্তি কহিয়া থাকি। উপরোক্ত দুইটী গুণ-ফল সমান হইলে যন্ত্র-মধ্যে সাম্যাবস্থা থাকে।

দ্রব - বিজ্ঞান

তরল পদার্থ দ্বারা চাপ প্রয়োগ করা যায়, ইহা সচরাচর তরল পদার্থের কার্য্য দেখিলে নিশ্চয় জানা যায়। জল মধ্যে হাত ডুবাইতে কিঞ্চিৎ বল প্রয়োগের আবশ্যক হয়। কোন লঘু পদার্থ জল মধ্যে ডুবাইলে তাহা তৎক্ষণাৎ জলের উপরি ভাগে উত্থিত হয়। জল পরিপূর্ণ পাত্রের গাত্রে ছিদ্র করিলে সেই জলের গতিরোধ জন্য বলপ্রয়োগ আবশ্যক হয় ইত্যাদি। এই সকল বিবেচনা করিলে তরল পদার্থের চাপ-শক্তি স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়।

বায়ুরাশির চাপ বায়ু-শোষকযন্ত্র দ্বারা স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়। যদি বায়ুশোষক যন্ত্র দ্বারা একটি কাচের পাত্র হইতে বায়ু শোষণ করিয়া লওয়া হয়, তাহা হইলে বায়ুরাশির চাপে সেই কাচের পাত্র একেবারে ভাঙ্গিয়া যায়। এতদ্ব্যতীত নৌকার বায়ুভরে গমন ও বায়ু ঘরট্ট যন্ত্রের ঘূর্ণন দেখিয়া বায়ুর চাপ বিষয়ে স্পষ্ট জ্ঞান জন্মে। মাগডিবর্গে যে পিত্তলের দুইটী অর্দ্ধ বর্ত্তুল লইয়া কৌতুক করা হইয়াছিল, তাহা হইতেও বায়ুর চাপের কার্য্য অতি সুস্পষ্ট রূপে দেখা যায়।

দুইটী পিত্তলের অর্দ্ধ বর্ত্তুল একত্রিত করিলে কোন দিকে বায়ু প্রবেশের পথ থাকে না। সেই পিত্তলের অর্দ্ধ বর্ত্তুল-দ্বয়-মধ্যস্থিত বায়ু একটী ছোট ছিদ্রের (যাহা স্ক্রু দ্বারা বদ্ধ করা যায়) মধ্য দিয়া বায়ুশোষক যন্ত্র দ্বারা নিষ্কাষিত করা যায়। বায়ু নিষ্কাশিত হইলে পর অশ্বের বল সহযোগ দ্বারাও সেই দুইটী অর্দ্ধ বর্ত্তুলকে ভিন্ন করা কঠিন হইয়া উঠে।

তৈল, পারদ, ধূম, জল, বায়ু সকলই তরল পদার্থ মধ্যে গণিত। কিন্তু তরল পদার্থের লক্ষণ নিরূপণ নিমিত্ত তরল পদার্থ সমূহের এক সাধারণ গুণ নির্ণয় করা আবশ্যক। জল বায়ু ইত্যাদি পদার্থ সকলের পরমাণু অতিশয় তরলতাগুণ-বিশিষ্ট। এই হেতু নিম্নলিখিত লক্ষণ তরল পদার্থের লক্ষণ বলিয়া দেওয়া যায়।

যে পদার্থের পরমাণু বিভাগে অত্যল্প বল প্রয়োগের আবশ্যক করে, তাহাকেই আমরা তরল পদার্থ কহিতে পারি। এই লক্ষণ হইতে স্পষ্ট দেখা যাইতেছে যে তরল পদার্থের সহিত সংলগ্ন কোন পদার্থের উপর চাপ তদুপরি দণ্ডায়মান রেখাক্রমে হইয়া থাকে।

তরল পদার্থ দুই প্রকার। এক প্রকার ধূমাকারে দৃষ্ট হয়, আর এক দ্রব। প্রথম প্রকার তরল পদার্থ চাপন দ্বারা মর্দ্দিত হইলে পূর্ব্বাবস্থাপেক্ষা স্বল্পস্থানব্যাপী হয়। চাপন হইতে মুক্ত হইলে অধিক অবকাশব্যাপী হয়। এতৎ প্রকার তরল পদার্থ স্থিতিস্থাপক গুণবিশিষ্ট বলা হয়। দ্রব পদার্থ চাপন দ্বারা মর্দ্দিত হয় না এবং তজ্জন্য দ্রব পদার্থসমূহকে অস্থিতিস্থাপকতা গুণবিশিষ্ট বলা যায়।

ঘনত্ব ও আপেক্ষিক গুরুত্ব

তরল পদার্থ সমুদায় দুই ভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে। যে সকল তরল পদার্থ ধূমাকারে থাকে এবং যে সকল তরল পদার্থ জলাকারে থাকে। অন্য ২ অনেক প্রকার গুণ দ্বারা তরল পদার্থ সমুদায়কে অন্য ২ ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে, কিন্তু দ্রব বিজ্ঞান মধ্যে আমরা তরল পদার্থ কিরূপ ঘনত্ব বা আপেক্ষিক গুরুত্ব-বিশিষ্ট তাহাই বিবেচনা করি; এবং এই দুইটী গুণের বিষয় বিবেচনা করিয়া অন্য অন্য গুণের বিষয় নির্ণয় করিয়া থাকি।

এই কিউঃ ইঞ্চ জল ও এক কিউঃ ইঞ্চ পারদ, দুইটী তুলনা দ্বারা আমরা বলিয়া থাকি যে পারদে জল অপেক্ষা ১৩ গুণ ঘনত্ব।

আপেক্ষিক গুরুত্ব—কোন বস্তুর গুরুত্ব কোন স্থিরীকৃত পদার্থের সমান অংশের গুরুত্বের সহিত তুলনা করিয়া যাহা হয় তাহাই আপেক্ষিক গুরুত্ব।

ঘনত্ব নির্ণয়কালে যে স্থিরীকৃত পদার্থের সহিত তুলনা করা হয় ও আপেক্ষিক গুরুত্ব বিষয় নির্ণয় করিবার জন্য যে স্থিরীকৃত পদার্থের সহিত তুলনা করা হয়, এই দুইটী স্থিরীকৃত পদার্থ যদি

এক হয়, তাহা হইলে কোন্ এক বস্তুর আপেক্ষিক গুরুত্ব ও ঘনত্ব একই হইবে। যথা, জল যদি স্থিরীকৃত পদার্থ হয়, তাহা হইলে পারদের ঘনত্ব ও আপেক্ষিক গুরুত্ব একই হইবে।

তরল পদার্থ সমুদায়ের অন্যান্য জড় পদার্থের সহিত এক সাধারণ গুণ আছে, তাহা আকর্ষণ। অন্যান্দ জড় পদার্থ যে নিয়ম অনুসারে আকর্ষিত হয় ও আকর্ষণ করে, তরল পদার্থ সমুদায়ও সেই সকল নিয়মানুযায়ী হইয়া থাকে। এইরূপ না হইলে আপেক্ষিক গুরুত্ব ও ঘনত্ব কিছুই থাকিত না। তাহা হইলে দ্রব-বিজ্ঞান আর এক প্রকারেরই হইত।

কোন তরল পদার্থ সাম্যাবস্থায় থাকিলে তাহার মধ্যে এক সমতল ক্ষেত্রের সকল অংশে সমান চাপ হয়। এই বিষয়টী কোন উপায় দ্বারা এক সমতল ক্ষেত্রের দুই ভিন্ন অংশের চাপ নির্ণয় করিলে স্পষ্ট প্রতীয়মান হইবে। যথা, মনে কর একটী বোতল মধ্যে একটী ছিপি পুরিবার নিমিত্ত ।৷০ সের চাপ প্রয়োগ করিতে হয়। এই বোতল যদি নিম্ন দিকে মুখ করিয়া জলে নিমগ্ন করা যায়, এবং ১০ হাত কি ১২ হাত দূরে গিয়া সেই ছিপি বোতল মধ্যে প্রবেশ করে, তাহা হইলে সেই জলের অন্য এক অংশে ঐরূপে ঐ বোতল নিমগ্ন করিলে ১০ হাত কি ১২ হাত নিম্নে ডুবাইলে ছিপি বোতলের ভিতর প্রবেশ করিবে। এইরূপ অন্যান্য পরীক্ষা দ্বারা এই বিষয় স্থির করা যায়। স্থিতি-স্থাপকতা বিশিষ্ট তরল পদার্থের চাপও এইরূপ অন্যান্য পরীক্ষা দ্বারা নির্ণীত হয়।

একটী জড় পদার্থ যদি কোন প্রকার তরল পদার্থে নিমগ্ন করা যায়, তাহা হইলে সেই জড় পদার্থের উপর সমুত্থিত চাপ কত হইবে? নিমগ্নিত জড় পদার্থ স্থানান্তরিত করিয়া সেই স্থান তরল পদার্থে পরিপূর্ণ বিবেচনা কর, এবং মনে কর যে সেই তরল পদার্থ যাহা সেই জড়ের স্থান ব্যাপিয়া রহিয়াছে, তাহা জড়ত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে। এইরূপ মনে করায় কোন সাম্যাবস্থার পক্ষে কোন হানি হয় না। জড়ত্ব প্রাপ্ত তরলের উপর চাপ ও সেই নিমগ্নিত পদার্থের উপর চাপ সমান হইয়া থাকে। জড়ত্ব প্রাপ্ত তরলের উপর চাপ তাহার ভারিত্বের সহিত সমান। অর্থাৎ নিমগ্নিত জড় পদার্থের উপর যে চাপ তাহা স্থানান্তরিত তরলের ভারিত্বের সহিত সমান।

যখন একটী বেলুন বাতাসে উড়িতে থাকে, তৎকালীন যে বাতাস সেই বেলুনের জন্য চারি পার্শ্বে সরিয়া যায়, তাহার গুরুত্ব বেলুনের গুরুত্ব অপেক্ষা অধিক হয়, এই কারণ বশতঃ বেলুন উপরে উত্থিত হয়। হাইড্রোজেন গ্যাস অন্য সকল প্রকার গ্যাস অপেক্ষা লঘু বলিয়া এই গ্যাসে বেলুন পরিপূর্ণ করা হয়। বেলুন রেশম কাপড় দ্বারা প্রায়ই নির্ম্মিত হয়।

একটী ধূমাকার তরল ও জলাকার তরলের চাপের এই বিভিন্নতা যে ধূমাকার তরলের চাপ তাহার ঘন ফলের উপরে নির্ভর করে, এবং জলাকার দ্রবের চাপ কোন বাহ্য চাপ বা দ্রবের ভারিত্ব বা ঘনত্বের উপর নির্ভর করে।

বায়ুর চাপ একটী পিচকিরীর কার্য্য দেখিলে স্পষ্ট দেখা যাইবে। পিচকিরীর মুখের ছিদ্র অঙ্গুলী দ্বারা বদ্ধ করিয়া পিচ্‌কিরীর হাতল ভিতরে পুরিতে অনেক বলের আবশ্যক করে। কারণ, যে পরিমাণে বায়ু স্বল্প স্থলব্যাপী হয়, সেই পরিমাণে অধিক চাপ হয়।

বায়ুর ভার আছে ইহা অতি সহজে নিশ্চয় করা যায়। যথা, একটী বোতলকে বায়ু পরিপূর্ণ ওজন করিলে এবং বায়ুশোষক যন্ত্র দ্বারা বায়ু নিষ্কাশিত করিয়া ওজন করিলে শেষ বারের ওজন পূর্ব্ব অপেক্ষা অনেক স্বল্প হয়। অর্থাৎ বায়ুর গুরুত্ব আছে।

পৃথিবীর চারি পার্শ বায়ু-রাশি দ্বারা বেষ্টিত। এই বায়ু-রাশি ঊর্দ্ধে কিঞ্চিৎ দূর অবধি আছে। কোন সমতল দ্রব্যের উপর বায়ু-রাশির চাপ সেই সমতল দ্রব্যের ন্যায় মোটা বায়ু-স্তম্ভের গুরুত্ব। এই অনুমান পরীক্ষার সহিত মিলিত হয়। যথা, পর্ব্বতের উপরে বায়ুরাশির চাপ নিম্ন অপেক্ষা অনেক স্বল্প।

সকল প্রকার তরল পদার্থের গুরুত্ব, বায়ুর গুরুত্ব যেরূপ জ্ঞাত হওয়া যায়, সেই উপায় দ্বারা জান৷ যায়। অনেক ধূমাকার তরল পদার্থ বায়ু অপেক্ষা ভারী। যথা, 'কার্‌বোনিক এসিড গ্যাস' একটী বোতাল হইতে আর একটী বোতলে ঢালা যায়।

দৃষ্টি বিজ্ঞান

বস্তু হইতে আলোক নির্গত হইয়া চক্ষুঃ মধ্যে প্রবেশ হইলে পর বস্তু সমুদায় আমাদের দৃষ্টিগোচর হয়। পৃথিবীস্থ সকল বস্তু হইতে স্বভাবতঃ আলোক নির্গত হয় না। যে সকল বস্তু হইতে আলোক নির্গত হয়, তৎসমুদায়কে আমরা স্বয়ং-জ্যোতির্ম্ময় কহিয়া থাকি। একটী জ্যোতির্ম্ময় পদার্থ হইতে যে আলোক নির্গত হয় তাহা চারিপার্শ্বস্থ অদৃশ্য পদার্থতে প্রতিফলিত হইয়া, আমাদের চক্ষুঃ মধ্যে প্রবেশ করে। সেই প্রতিফলিত আলোক দ্বারা আমরা স্বভাবতঃ অদৃশ্য পদার্থ সমুদায় দেখিতে পাই। যে সমুদায় বস্তু মধ্যে আলোকের প্রবেশ হয়, তাহাকে আমরা স্বচ্ছ কহিয়া থাকি, যে সকল বস্তু মধ্যে আলোকের প্রবেশ হয় না তাহাদের অস্বচ্ছ কহিয়া থাকি। কাচ, বায়ু, জল ইত্যাদি স্বচ্ছ, কাষ্ঠ ধাতু ইত্যাদি অস্বচ্ছ। যখন স্বল্প পরিমাণে আলোকের প্রবেশ হয়, তন্মধ্য দিয়া অন্যান্য বস্তু উত্তম রূপে দৃষ্ট হয় না। শৃঙ্গ কোয়াসা-আচ্ছাদিত বায়ু-রাশি মেঘ এই সকল পদার্থের ভিতর দিয়া সুস্পষ্ট রূপে দেখা যায় না। কোন বাহ্য কারণ দ্বারা বাধিত না হইলে আলোক সরল রেখাতে নির্গত হয়। এক-একটী আলোকের সরল রেখাকে কিরণ কহিতে পারি। যে স্থলে আলোকের সরল রেখা সমুদায় একত্রিত হয়, অর্থাৎ যে স্থল হইতে আলোক নির্গত হয়, সেই স্থানকে আলোক-যোনি বলা যায়। আলোকের সরল রেখায় গতি নিম্নলিখিত পরীক্ষা দ্বারা স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়। একটী অন্ধকার ঘর থেকে যদি এক বক্র নলের এক পার্শ্বে একটী আলোক-যোনি থাকে, তাহা হইলে সেই আলোক-যোনি অন্য পার্শ্ব হইতে দৃষ্টিগোচর হয় না। কিন্তু নলটী যদি সরল হয়, তাহা হইলে এক পার্শ্বস্থিত আলোক-যোনি অন্য পার্শ্ব হইতে সুস্পষ্টরূপে দেখা যায়, অর্থাৎ আলোকের কিরণ সরল রেখাতে নির্গত হয়। আর আলোকের কিরণ সরল রেখাতে নির্গত হয় বলিয়া, একটী বর্ত্তুলের ছায়া চক্রাকার রূপে দৃষ্ট হইয়া থাকে।

আলোকের গতি এক সেকেণ্ডে ১০০,০০০ লক্ষ ক্রোশ; সূর্য্য হইতে পৃথিবীতে আট মিনিটে পৌঁছে। একটী কামানের গোলার যদি গতিবেগ বরাবর সমান থাকিত, তাহা হইলে ৩২ বৎসরে এ কার্য্য সাধন হইতে পারিত। এই তুলনা করিবার কারণ এই যে তুলনা দ্বারা এ বিষয় কিঞ্চিৎ সুস্পষ্ট রূপে বুঝা যায়।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, একটী বস্তুতে যে মূর্ত্ত আছে তাহা, সেই বস্তুর গতিবেগ দ্বারা গুণ করা হইলে, গুণ-ফল সেই বস্তুর ভার-শক্তি।

অতএব স্পষ্ট দেখা যাইতেছে যে, আলোকের পরমাণু আমাদের যতদূর বোধগম্য হইতে পারে, তাহা অপেক্ষা যদি না অনেক ক্ষুদ্রতর হইত, তাহা হইলে আমাদের জীবন ধারণ করা অতি সুকঠিন হইয়া উঠিত।

চক্ষুর মধ্যে আলোকের প্রবেশ দ্বারা যে জ্ঞান উৎপাদন হয়, তাহা আলোক সরাইবার কিঞ্চিৎ কাল পর পর্য্যন্ত থাকে। যথা, একটী জ্বলন্ত পদার্থ সূত্র দ্বারা বন্ধন করিয়া ঘূর্ণন করিলে একটী জ্বলন্ত চাকার ন্যায় বোধ হয়।

আলোক এক অবকাশ হইতে অন্য অবকাশে যাইবার কালীন দুই অবকাশের মধ্যে তাহার গতি প্রতিভঙ্গিত হয়। এই গুণটীকে আলোকের প্রতিভঙ্গ গুণ বলা যায়। নিউটনের মতে প্রতিভঙ্গের কারণ আকর্ষণ। আলোকের পরমাণু সমুদায় এক প্রকার অবকাশে এক রকমে আকর্ষিত হয়, অন্য প্রকার অবকাশে অন্য রকমে আকর্ষিত হয়।

আলোকের গতি যে এক অবকাশ হইতে অন্য অবকাশে যাইবার কালীন প্রতিভঙ্গিত হয়, এতদ্বিষয়ে অনেক দৃষ্টান্ত দেখা যায়। যথা, একটী যষ্টি জল মধ্যে ডুবাইলে সেই যষ্টিকে ভাঙ্গা বা বক্র বোধ হয়। অথবা, একটী গেলাস মধ্যে একটী টাকা রাখিয়া যদি ক্রমশঃ গেলাস হইতে অন্তরে যাওয়া যায়, যতক্ষণ না টাকাটী ঠিক অদৃশ্য হয়, এবং পরে যদি গেলাস জলে পরিপূর্ণ করা হয়, তাহা হইলে ঐ টাকা সেই স্থান হইতে আবার দৃষ্ট হয়। ইহা আলোক প্রতিভঙ্গিত হয় বলিয়া এইরূপ হইয়া থাকে। ইহাও বলা কর্ত্তব্য যে যে-সকল কিরণ বক্র হইয়া পতিত হয়, সেই সকলগুলিই কেবল প্রতিভঙ্গিত হয়, কিন্তু যেগুলি দণ্ডায়মান রেখাক্রমে পতিত হয়, সেগুলি প্রতিভঙ্গিত হয় না। কারণ, দণ্ডায়মান রেখাক্রমে পতিত হইল হইলে চারিপার্শ্বের আকর্ষণ সমান হয়, তজ্জন্য আকর্ষণের কোন কার্য্য হয় না।

আলোক প্রতিভঙ্গিত হইবার নিয়ম আছে। সেই নিয়ম এই যে, দুইটী বিশেষ অবকাশ মধ্যে প্রতিভঙ্গিত কিরণ ও দণ্ডায়মান রেখার কোণ এবং কিরণের আপাত রেখা ও দণ্ডায়মান রেখার কোণ এই দুয়ের নিষ্পত্তি স্থির থাকে। বায়ু হইতে জলে আলোকের গতি হইলে এই নিষ্পত্তি... পরিমাণে হয়।

ইহা দেখা যাইতেছে যে, আলোক এক অবকাশ হইতে অন্য এক অবকাশ মধ্যে প্রতিভঙ্গিত হইলে, সেই অবকাশের ঘনত্ব যদি অধিক হয়, তাহা হইলে তদুপরি দণ্ডায়মান রেখার নিকটবর্ত্তী হইয়া প্রতিভঙ্গিত হয়। এই কারণ বশতঃ যাঁহারা জল মধ্যে মৎস্যকে বন্দুক দ্বারা মারিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহাদের মৎস্য যেখানে দেখিতে পান তাহার অনেক নিম্নভাগে লক্ষ্য করিতে হয়। যাহারা আলোকের প্রতিভঙ্গ-শক্তি বিষয় জ্ঞাত নয়, তাহারা হঠাৎ বিশ্বাস করিবে না যে, তারা সমুদায় যেখানে দেখিতে পাই, ঠিক সেইখানে স্থিত্ত নয়, কারণ, পৃথিবী বেষ্টনকারী বায়ুরাশিতে আলোকের গতি প্রতিভঙ্গিত হয়। এইজন্য সূর্য্যের আলোক সূর্য্য অস্তে যাইবার পরও অনেকক্ষণ থাকে। এমন কি ইংলণ্ডের স্থানে স্থানে সময়ে সময় ২৪ ঘণ্টার অধিককাল থাকে। Zenith নিকটবর্ত্তী হইলে Horizon অপেক্ষা স্বল্প পরিমাণে আলোকের গতি প্রতিভঙ্গিত হয়।

আলোকের প্রতিভঙ্গিত হওয়া গুণ বশতঃ মনুষ্যেরা নিজ কার্য্য সাধন জন্য অনেক প্রকার আবশ্যকীয় যন্ত্র নির্ম্মাণ করিয়াছে। যথা, দৃষ্টিকাচের নির্ম্মাণ, যদ্দ্বারা আলোক কিরণ সমুদায়ের এক-প্রবণতা হয় বা পৃথক-প্রবণতা হয়।

প্রতিফলন

আলোক প্রতিফলিত হইবার কারণ নিউটনের মতে মূর্ত্তের নিরাকরণ গুণ বশতঃ। সকল প্রকার পদার্থ, যাহা স্বয়ং-জ্যোতির্ম্ময় নয়, তাহা অন্যান্য স্বয়ং-জ্যোতির্ম্ময় পদার্থের আলোক তদুপরি প্রতিফলন দ্বারা দৃষ্টিগোচর হয়।

কাচ জল ও অন্যান্য অতি স্বচ্ছ পদার্থ হইতে আলোকের কিরণ কিয়দংশ প্রতিফলিত হয়, প্রতিফলিত না হইলে দৃষ্টিগোচর হইত না।

সমস্ত আলোক কিরণ কোন পদার্থ হইতে কখন প্রতিফলিত হয় না। অতি উৎকৃষ্ট মুকুর হইতেও আলোকের অর্দ্ধেক কিরণের কিয়দংশের অধিক বই প্রতিফলিত হয় না।

কোন বস্তু হইতে আলোক কিরণ নিম্নলিখিত নিয়মানুসারে প্রতিফলিত হয়।

(১) আপাত এবং প্রতিফলিত কিরণ সেই অবকাশস্থ আপাত চিহ্নের গ্রহজ দণ্ডের সহিত সমধরাতলে থাকিয়া তাহার দুই বিপরীত পার্শ্বে অবস্থান করে।

(২) গ্রহজ দণ্ডের সহিত আপাত কিরণ এবং প্রতিফলিত কিরণ যে কোণে অবস্থান করে তাহাদের পরিমাণ সমান।

এই কারণ বশতঃ যখন কোন মুকুর মধ্যে একটী বস্তুর প্রতিবিম্ব দিকে দৃষ্টি করা যায়, তৎকালে বোধ হয় যে, সেই আলোক কিরণ সেই মুকুরের পশ্চাৎ হইতে আসিতেছে। যখন আপনাদের প্রতিমূর্ত্তি মুকুর মধ্যে দৃষ্টি করি তৎকালে বোধ হয় সেই প্রতিমূর্ত্তি মুকুরের পশ্চাতে রহিয়াছে।

আলোক সমধরাতলে প্রতিফলিত হইলে তাহার প্রতিফলনের চুল্লি-স্থান ঐ সমধরাতলের পশ্চাতে হইয়া থাকে। আর আলোক-যোনি ঐ সমধরাতলের সম্মুখে যত দূরে স্থিত, পশ্চাতে ঠিক সমান দূরে চুল্লী-স্থান হইয়া থাকে।

একখানি পুরোস্তুঙ্গ মুকুরের সম্মুখে আলোক-যোনি থাকিলে সেই আলোক-যোনির চুল্লী তাহার পশ্চাতে হইয়া থাকে, কিন্তু ঠিক সমান দূরে হয় না, তদপেক্ষা নিকটে হইয়া থাকে! এইরূপ হইলে বস্তু অপেক্ষা তাহার প্রতিবিম্ব ছোট বলিয়া বোধ হয়।

পুরোনিম্ন মুকুরের সম্মুখে থাকিলে এবং সম্মুখস্থ দূর যদি ঐ কাচের ব্যাসার্দ্ধ অপেক্ষা ছোট হয়, তাহা হইলে প্রতিবিম্ব বস্তু অপেক্ষা বড় বোধ হয়।

আলোকের তেজ

কোন স্বয়ং-জ্যোতির্ম্ময় পদার্থ হইতে আলোক কিরণ নির্গত হইলে, যে পরিমাণে সেই আলোকময় পদার্থ হইতে দূরে স্থিত হইবে, সেই পরিমাণে দূরের বর্গ ক্রমে আলোক কিরণের তেজের হ্রাস হইবে। এ বিষয় অনেক প্রকার পরীক্ষা দ্বারা নির্ণীত হইয়াছে। কিন্তু সে সকল পরীক্ষা এ স্থলে দেওয়া যাইতে পারে না।

সূর্য্য-কিরণের সাত প্রকার রঙ আছে বলিয়া আকাশের এক পার্শ্বে মেঘ ও অপর পার্শ্বে সূর্য্য থাকিলে রামধনু দেখা যায়। জল-বিন্দুর ভিতর দিয়া সূর্য্য-কিরণ একবার প্রতিফলিত ও দুইবার প্রতিভঙ্গিত হইলে রামধনু দেখা যায়। কোন কোন সময়ে একত্রে দুইটী ধনু দৃষ্ট হয়। কখন কখন রাত্রেও রামধনু দেখা যায়। চন্দ্রের কিরণ অতি তেজোহীন বলিয়া রামধনু স্পষ্ট দেখা যায় না।

তাড়িত বিজ্ঞান

কোন কোন বস্তু ঘর্ষিত অথবা উত্তাপিত হইলে অন্য লঘু বস্তুকে আকর্ষণ করে। কোন ২ সময়ে তন্মধ্য হইতে শব্দ সহকারে ফস্‌ফরাসের গন্ধ-বিশিষ্ট অগ্নিকণা নির্গত হয়। বস্তুসমূহের উপরোক্ত গুণকে তাড়িত কহা যায়। যে বস্তু হইতে ঘর্ষণ অথবা উত্তাপ দ্বারা তাড়িত উৎপন্ন হয়, তাহাকে তাড়িতাত্মক কহা যায়। যে সকল বস্তুকে তাড়িত প্রবেশ করে তাহাকে তাড়িত-পরিচালক কহা যায়। এবং যাহাতে তাড়িতের প্রবেশ হয় না, অথবা যদ্দ্বারা তাড়িত চালনা হয় না, তাহাকে তাড়িত-রোধক বলা যায়। যে বস্তুতে স্বাভাবিক তাড়িতাংশ অপেক্ষা অধিকতর তড়িৎ প্রবেশ করে তাহাকে ধন-তাড়িত বিশিষ্ট কহা যায়। এবং যাহার স্বাভাবিক অংশ অপেক্ষা তাড়িতের ভাগ ন্যূন তাহাকে ঋণ-তাড়িতপূর্ণ বলা যায়। তাড়িতপূর্ণ বস্তু হইতে অপর বস্তুর মধ্য দিয়া শব্দসহকারে তাড়িত নির্গত হইয়া যাওয়ার নাম তাড়িতাঘাত।

কাচ ঘর্ষণ দ্বারা ঋণ-তাড়িতপূর্ণ হয়। গালা রজন আম্বর প্রভৃতি কতক প্রকার পদার্থ ঘর্ষণ দ্বারা ঋণ-তাড়িতপূর্ণ হয়। বিড়ালের লেজের রোম রেশমী পদার্থে ঘর্ষণ করিলে ঋণতাড়িত উৎপন্ন হয়। যখন কোন বস্তু কোন তাড়িতাত্মক দ্রব্য দ্বারা পৃথিবী হইতে অসংলগ্নিত হয়, তৎকালে ঐ বস্তু একান্তীকৃত হইয়াছে বলিলে বলা যায়।

বস্তুসমূহ দুই প্রকার; তাড়িতাত্মক ও তাড়িতেতর। তাড়িতাত্মক দ্রব্যসমূহ তাড়িতরোধক এবং তাড়িতেতর পদার্থসমূহ তাড়িত পরিচালক। ধাতুসমূহ, জল, কয়লা ইত্যাদি দ্রব্য তাড়িত-পরিচালক; অপর বস্তু উদ্ভিজ্জ অথবা জীবিত তাড়িত-রোধক। ভূমিসংলগ্ন কাচের নল অথবা গোলা ঘর্ষণ দ্বারা ধন-তাড়িত উৎপন্ন করে। অসংলগ্ন কাচের দ্রব্য অথবা গালা গন্ধক ইত্যাদি দ্রব্য ঘর্ষণ দ্বারা ঋণ-তাড়িত উৎপন্ন করে। যে বস্তুকে ঘর্ষণ করা যায় এবং যদ্দ্বারা ঘর্ষিত হয়, এই দুই বস্তুর মধ্যে বিপরীত প্রকার তাড়িত উৎপন্ন হয়। যথা,- কাচেতে এবং রেশমী দ্রব্যেতে ঘর্ষিত হইলে, কাচে ধন-তাড়িত ও রেশমী দ্রব্যেতে ঋণ-তাড়িত উৎপন্ন হয়।

লিডনজায় যে একপ্রকার আবৃত বোতল নির্ম্মিত হইয়াছে, তাহার উপরিভাগে ঋণ-তাড়িত ও ভিতরে ধন-তাড়িত উৎপাদিত হয়।

এই দুই বিপরীত প্রকার তাড়িতের পরস্পর অত্যন্ত আকর্ষণ। যদ্যপি কোন তাড়িত-পরিচালক দ্বারা আবৃত বোতলের ভিতর ও বহির্ভাগ সংলগ্ন করা হয়, তাহা হইলে শব্দ ও উজ্জ্বল শিখাসহকারে তাড়িত নির্গত হয়। বস্তু-মধ্য-গত তাড়িত ও আকাশ-দেশের বিদ্যুৎ একই প্রকার।

আকাশীয় বিদ্যুতের তাবৎ গুণ দ্রব্য-জাত তাড়িতে দেখা যায়। এবং আকাশীয় বিদ্যুৎ ঘুড়ি দ্বারা নিম্নে আনয়ন পূর্ব্বক দ্রব্য-জাত তাড়িতের কার্য্য সাধন হইতে পারে।

এ বিষয়ে মহাবিজ্ঞ ডাক্তার ফ্রাঙ্কলিন সাহেব অনেক পরীক্ষা দ্বারা মহাবিখ্যাত হইয়াছিলেন। তিনি একখানি রেশমী রুমালে ঘুড়ির কাঁপের ন্যায় কাঁপ বসাইয়া ও এক লম্বা নেজুড় দিয়া উড়াইয়াছিলেন। ঘুড়ির শিরোভাগে এক সূচাগ্রে তার জড়াইয়াছিলেন, অর্দ্ধ হাত উপরিভাগ পর্য্যন্ত তার ছিল। আকাশ-দেশে মেঘ আচ্ছাদিত হইবার প্রাক্‌কালে এই পতঙ্গ উড়াইয়াছিলেন। মেঘের ভিতর হইতে তাড়িতরাশি এই পতঙ্গ দ্বারা নিম্নে আনিয়া, একটী একান্তীকৃত ধাতুময় পাত্রে রাখিয়া, অনেক প্রকার দ্রব্যজাত-তাড়িত হইতে যে পরীক্ষা হয়, তাহা সম্পন্ন করিয়াছিলেন।

উচ্চ মন্দির ও ইমারতাদি তাড়িত-পরিচালক দ্বারা বিদ্যুৎ-আঘাত হইতে রক্ষা করা যায়। বিজ্ঞানশাস্ত্র দ্বারা তাড়িত সহকারে নানাপ্রকার অদ্ভুত কার্য্য সমাধা হয়। তাড়িত বার্ত্তাবহ, যদ্দ্বারা এখান হইতে শত ২ ক্রোশ দূরের সংবাদ ক্ষণকাল মধ্যে প্রাপ্ত হওয়া যায় তাহা দ্রব্য-সম্ভূত তাড়িত দ্বারা সম্পন্ন হয়।

তাড়িতের আঘাত দ্বারা বাত রোগের বিশেষ উপশম হয়। তাড়িত উৎপাদনের অনেক প্রকার উপায় আছে, তন্মধ্যে নিম্নে একটি প্রধান উপায় দেওয়া হইতেছে।

সচরাচর তাড়িত উৎপাদনের যন্ত্র এই প্রকারে নির্ম্মিত হয়। যথা, একখানি কাচের চক্রাকার থালা, ২ নাগাদ ৪ ফুট পরিসর অর্দ্ধ ইঞ্চ মোটা তাহার মধ্যস্থলে এক শলা আছে, যাহার চতুষ্পার্শ্বে ঐ থালা চক্রের ন্যায় ঘুরিতে থাকে। ঐ শলাকা উভয় পার্শ্বে দুই মঞ্চের উপরে স্থাপিত ও এক দিকে চরকার ন্যায় হাতল আছে, যাহা ধরিয়া ঐ থালা ঘুরান যায়। ঐ থালা ৪ খানা গদিতে সংলগ্ন হইয়া ঘুরিতে থাকে, গদির উপর পারদ মিশ্রিত টিন লেপিত থাকে। এক পিতল নির্ম্মিত ফাঁপা চোঙ্গাকৃতি তাড়িত-বাহক ঐ কাচের থালার অতি নিকটে ভূমি হইতে একান্তীকৃত হইয়া স্থাপিত হইলে, তন্মধ্যে তাড়িতরাশি একত্রিত হয়। ঐ তাড়িতাত্মক পদার্থ হইতে অপর বস্তুতে তাড়িত চালনা করিয়া নানা প্রকার কৌতুক ও পরীক্ষা করা যায়। তাড়িতোৎপাদক যন্ত্র অনেক প্রকারের হইতে পারে।

(শ্রীউদয়চন্দ্র বসু।)

সঙ্গীত বিষয়ক প্রবন্ধ

পৃথিবীতে সময়ে সময়ে যে সকল বিদ্যা প্রকাশ হইয়াছে, তাহাদের মধ্যে সঙ্গীত বিদ্যার সমতুল্য মানবজাতির চিত্তবিনোদন করিতে আর কেহই সক্ষম নহে। কোন্ মহাত্মা কোন্ সময়ে এবং পৃথিবীর কোন্ দেশে প্রথমে এই শ্রবণেন্দ্রিয়ের পরিতৃপ্তিকারিণী অত্যাশ্চর্য্যসুখপ্রদা বিদ্যার অনুশীলনে যত্নবান্ হইয়াছেন, তাহা নিরূপণ করা সহজ নহে। বসুন্ধরার প্রাচীন দেশ সকলের পুরাবৃত্ত পাঠ করিলে বিলক্ষণ প্রতীয়মান হয় যে, অতি পুরাকালেও কি সভ্য কি অসভ্য জাতি কেহই সঙ্গীত-রসাস্বাদনে বঞ্চিত ছিলেন না। অতীব প্রাচীনকালে যখন ভারতবর্ষে পুস্তকাদি

লিখনের প্রথা ছিল না, তখন সঙ্গীত-রূপা তরণীই যে সময়-সমুদ্র অতিক্রম করিয়া অমূল্য ধন প্রাচীন চরিত্র মনুষ্য-বংশে অর্পণ করিয়াছে, তাহার প্রমাণ-স্তম্ভ স্বরূপ শ্রুতি অদ্যাপি দেদীপ্যমান রহিয়াছে। বলিতে কি, সঙ্গীত-বিদ্যা এত পুরাতন কালে মানবকুল সমুজ্জ্বল করিয়াছে, বোধহয় যেন প্রকৃতি তাঁহার নরসন্তানকে আজন্ম সঙ্গীতপরায়ণ করিবার মানসেই গম্ভীর ঘননিনাদ, জল-প্রপাতের ঝর ঝর শব্দ, ঝটিকার হুহুঙ্কার, এবং বিহঙ্গদলের কণ্ঠধ্বনি প্রভৃতি সঙ্গীত উপদেষ্টাগণের প্রথমে সৃজন করিয়াছিলেন। ফলতঃ অঙ্কবিদ্যা যেরূপ অসীম বিশ্বরাজ্যের দৈর্ঘ্য পরিমাণে ও অসংখ্য জগতের সংখ্যাকরণে প্রকাশ পাইয়াছে, তদ্রূপ সঙ্গীতবিদ্যা শব্দ-সাগরের হ্রস্ব দীর্ঘ প্লুত রূপ তরঙ্গমালায় বিকাশিত হইয়া, চিরকালব্যাপী পরম পুরুষের অপার মহিমা কীর্ত্তনে প্রকাশ পাইতেছে, তাহার সন্দেহ নাই।

ভারতবর্ষ নিবাসি ঋষি-প্রণীত পুরাণে কথিত আছে যে, সকল সিদ্ধবিদ্যায় পারদর্শী সংসারের মঙ্গলকর্ত্তা ভগবান্ দেবাদিদেব ভবানীপতি সঙ্গীতবিদ্যার প্রথম প্রকাশ করিয়া বিশ্বব্যাপী পরমাত্মা বিষ্ণুর এতাধিক প্রীতিভাজন হইয়াছিলেন যে, করুণানিধান প্রেমানন্দে আর্দ্র হইয়া পবিত্রময়ী গঙ্গারূপে তাঁহাকে প্রেমালিঙ্গন করেন। বস্তুতঃ উপর্য্যুক্ত রূপকের যথার্থ তাৎপর্য্য গ্রহণ করিলে ঋষিবাক্য নিতান্ত অসঙ্গত বোধ হয় না। অর্থাৎ যে কালে পদার্থ মাত্রের পরমাণু সকল ভগবৎ স্বেচ্ছায় সঞ্চালিত হইয়া বিশ্বরচনা কার্য্যে নিয়োজিত হইয়াছে, সেই কাল হইতেই যে তাহাদের পরস্পরের গাত্র ঘর্ষণ শব্দ-হিল্লোল মহাকালরূপ হর-মুখ-কুহরে প্রতিধ্বনিত হইয়া সঙ্গীতরূপ তরঙ্গরাশি মহাকাশে বিস্তৃত হইতেছে, তাহার বিচিত্র কি? আর সঙ্গীত বিদ্যার প্রকৃত আলোচনা করিলে অর্থাৎ ভগবৎ মহিমা কীর্ত্তনে নিয়োজিত করিলে, যে আনন্দ-প্রবাহ-রূপিণী গঙ্গার জলে চিত্তের অসুখ মলা ধৌত হইয়া অন্তঃকরণ পবিত্র রসে আপ্লুত হয়, তাহাও ভ্রান্তিমূলক বলা যাইতে পারে না। সঙ্গীত যে সমাজের কতদূর হিতসাধন করে, তাহা পাঠক মহাশয়েরা কিঞ্চিৎ বিবেচনা করিলেই বুঝিতে পারিবেন যে, ইহার পর হিতকর পদার্থ আর নাই। যখন রণক্ষেত্রের মুহুর্মুহুঃ অস্ত্রনিক্ষেপের বজ্রপাত শব্দ, অশ্বগজাদির বেগযুক্ত পদধ্বনি, সৈন্যদলের কোলাহল, ধরাশায়ী ক্ষত যোদ্ধাদিগের আর্ত্তনাদ একত্রিত হইয়া সাক্ষাৎ মৃত্যুরূপ ভীষণ নিনাদে প্রাণীমাত্রকে মরণভয়ে ব্যাকুল করে, তখন যদি সঙ্গীতের অসামান্য শক্তি যোদ্ধৃগণের অন্তঃকরণে বীর-রস সিঞ্চন না করিত, তবে সমরানলের অসহ্য দাহন কেহই সহ্য করিত সমর্থ হইত না। ফলে, সঙ্গীত যে বীররসে ভয়, আদিরসে শোক, ঘৃণারসে কুপ্রবৃত্তি, রৌদ্ররসে অত্যাচার, করুণরসে দুঃখ প্রভৃতি নিবারণ করিতে পারে, তাহার ভুরি ভুরি প্রমাণ পাওয়া যায়। হীন ব্যক্তিকে মহতের নিকট আহুত করিবার পক্ষে সঙ্গীত ভিন্ন সহজ উপায় নাই। অসাধু-মার্গ-গমনশীলা বারাঙ্গনারাও সঙ্গীতের মহদাশ্রয় অবলম্বনে জনসমাজে সমাদৃতা হইয়া আসিতেছে, তাহা কাহার অবিদিত আছে?

পৃথিবীর আদিম নিবাসীরা সঙ্গীতবিদ্যার যে প্রথম সূত্রপাত করিয়াছিলেন, তাহা স্পষ্ট বোধ হয়। পরে জন-সমাজের জ্ঞানোন্নতি ও সভ্যতার উন্নতি সহকারে তাহার ক্রমশঃ শ্রীবৃদ্ধি হইয়া আসিতেছে। ভারতবর্ষের ঋষিবৃন্দের মধ্যে সঙ্গীতের যথেষ্ট সমাদর ছিল। নারদ, বাল্মীকি, ব্যাস প্রভৃতি মহাত্মারা বিখ্যাত সঙ্গীত-পরায়ণ ছিলেন। এবং তাঁহারা যে সংসারের শ্রেয় অবলম্বন ঈশ্বর উপাসনা কার্য্যের প্রধান অঙ্গ করিয়া সঙ্গীতকে নিয়োজিত করিয়া গিয়াছেন, তাহা অদ্যাপি

পূজাকালীন ঘণ্টাবাদনে প্রমাণ হয়। বর্ত্তমান অপেক্ষা পূর্ব্বকালে ভারতবর্ষে সঙ্গীতবিদ্যা অধ্যয়নের যে অনেক সুবিধা ও সুশৃঙ্খলা ছিল, তাহার প্রমাণ ভারতাদি পুরাণে লক্ষিত হয়। বিরাটরাজ্যে যখন পাণ্ডবেরা বৎসরেক অজ্ঞাতবাস করেন, তখন অর্জ্জুন বৃহন্নলারূপে রাজপ্রতিষ্ঠিত সঙ্গীতবিদ্যালয়ে অধ্যাপিকা পদে নিযুক্ত ছিলেন। ইহাতে সাহস পূর্ব্বক বলা যাইতে পারে, যে সঙ্গীতশাস্ত্র অধ্যয়ন করা সভ্যমাত্রের অবশ্যকর্ত্তব্য বিবেচনা করিয়া, প্রাচীন হিন্দু নরপতিরা স্থানে স্থানে পাঠশালা স্থাপন পূর্ব্বক তাহার যথেষ্ট উন্নতি সাধন করিতেন। অদ্যাপি তাঁহাদের চিরস্মরণীয় কীর্ত্তিসকল জাজ্বল্যমান রহিয়াছে। নারদ, ভরত, হনুমন্ত কল্লীনাথ প্রভৃতি মহাত্মাদের প্রণীত প্রাচীন সঙ্গীতগ্রন্থ সকল যাঁহাদিগের নয়নগোচর হইয়াছে, তাঁহারা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করেন যে, প্রাচীন হিন্দুজাতির বুদ্ধিক্ষেত্র কি অত্যাশ্চর্য্য উর্ব্বরা ছিল, এবং তাহাতে বিদ্যা-বৃক্ষ যে অসামান্য ফলশালী হইবে তাহার সন্দেহ কি? অনেক ভাষাজ্ঞ পণ্ডিতবর সার্ উইলিয়ম জোন্স বলেন, যে জ্যোতিঃ পদার্থের সপ্ত বর্ণ রক্ত নীল প্রভৃতি যে রূপ নভোমণ্ডলে রামধনুতে দৃষ্টিগোচর হয়, সেইরূপ শব্দতত্ত্বের সপ্ত স্বরদেশ ষড়্জ ঋষভ গান্ধার মধ্যম পঞ্চম ধৈবত নিষাদ প্রভৃতি শ্রবণেন্দ্রিয়ের উপলব্ধি হয় এবং বর্ণ সকলের মধ্যে যেমন হরিত ও নীল বর্ণদ্বয় নয়নের প্রীতিজনক, তেমনই সপ্ত স্বরের মধ্যে ষড়্জ ও পঞ্চম সাতিশয় শ্রবণ-প্রিয়। ফলে দর্শন ও শ্রবণেন্দ্রিয় এই উভয়ের বিষয় আলোক ও শব্দের পরস্পরের অনেক সৌসাদৃশ্য দৃষ্ট হয়। প্রকৃতির কোন্ নিয়ম-কৌশলে জ্যোতিঃ ও শব্দতত্ত্ব এক ধর্ম্মাক্রান্ত হইয়াছে, তাহার গুহ্যতম ভাব প্রকাশ করিতে এ পর্য্যন্ত কেহই সমর্থ হন নাই। ভারতবর্ষের সূক্ষ্মদর্শী মহোদয়েরা যেকালে শব্দতত্ত্ব অনুসন্ধান করিয়া স্বর-দেশের সপ্ত খনি হইতে সঙ্গীতরত্ন উদ্ধার করিতে প্রবৃত্ত ছিলেন, সেকালে জ্যোতির্বিদ্যাপ্রকাশক মহাপুরুষ নিউটনের জন্মভূমি ইংলণ্ড দেশের নাম মাত্র কাহারও কর্ণগোচর ছিল না। মহাত্মা জোন্স প্রণীত ভারত-সঙ্গীত প্রস্তাবে লিখিত আছে যে, ভারতবর্ষের সঙ্গীতশাস্ত্রবেত্তারা সঙ্গীত শব্দটীকে গীত, বাদ্য, নৃত্য প্রভৃতি ত্রিবিধ বিদ্যার উপাধি করিয়াছেন। সঙ্গীত শব্দটী শুনিবামাত্রই বোধ হয় যে, গীত বাদ্য প্রভৃতির উল্লেখ করা হইল। এক্ষণে গীত, বাদ্য, নৃত্য, পৃথক্ পৃথক্ সঙ্গীত বৃক্ষের কোন্ কোন্ শাখারূপে শোভিত হয়, তাহা যথাসাধ্য বর্ণনে বাধ্য হইলাম।

প্রথম, গীত

কণ্ঠ-বিনির্গত স্বরযুক্ত নানা রস ও ছন্দোবন্ধে প্রপূরিত কবিতা সকল যাহা রাগরাগিণী পথে ধাবমান হয়, তাহাকে গান অথবা গীত বলে।

দ্বিতীয়, বাদ্য

নানা প্রকার যন্ত্র যাহা অঙ্গুলি দ্বারা পীড়িত অথবা বায়ু দ্বারা সঞ্চালিত হইয়া মনোহর-শব্দ উৎপাদন করতঃ গীতের সহায়তা করে এবং কাল বিধান করে, তাহাকে বাদ্য কহে।

বাদ্য দুই প্রকার; স্বর-সহায়ী ও সময়-সহায়ী। বীণা বংশী সারঙ্গ এস্‌রাজ প্রভৃতি যন্ত্র, যাহাতে সপ্ত-স্বরের আন্দোলন করিয়া রাগরাগিণী-মার্গে ধাবিত গীতের ছায়া প্রদর্শিত হয়, তাহাদিগকে স্বর-সহায়ী যন্ত্র কহে। আর মৃদঙ্গ ঢোল করতাল মন্দিরা খচতাল প্রভৃতি যন্ত্র, যাহাতে গীতকালীন

অথবা বাদ্যকালীন সময় বিভাগ করা যায়, তাহাকে তাল বা সময়সহায়ী যন্ত্র কহে। এই প্রস্তাবের শেষ ভাগে বাদ্যযন্ত্রের বিষয় বিস্তারিত রূপে লিখিত হইবে।

তৃতীয়, নৃত্য

বাদ্য দ্বারা যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে সময় বিভাগ করা হয়, সেই সময়ে সময়ে অর্থাৎ তালে তালে পদনিক্ষেপ ও সর্ব্বাঙ্গচালন করিয়া মনোগত উল্লাস প্রকাশ করাকে নৃত্য কহে। নৃত্যটী মনুষ্য মাত্রেরই স্বভাবসিদ্ধ। তাহার চমৎকার উদাহরণ শ্রীযুক্ত বাবু রাজেন্দ্রলাল মিত্র পণ্ডিতচূড়ামণি প্রণীত বিবিধার্থসংগ্রহ প্রবন্ধে এইরূপ উল্লিখিত আছে যে, শৈশব কালে মনে আহ্লাদের সঞ্চার হইলে তাহার সঙ্গে সঙ্গেই করতালি ও লম্ফপ্রদানে পদনিক্ষেপ করতঃ বালকেরা নৃত্য করে, ইহা শিশুচরিত্রে প্রত্যহ দৃষ্ট হয়। ভারতবর্ষের সঙ্গীতশাস্ত্রে নৃত্য দুই মহৎশাখায় বিভক্ত আছে। ঐ শাখাদ্বয়কে তাণ্ডব ও লাস্য কহে। তাণ্ডব অর্থে শিব অর্থাৎ পুরুষ-নৃত্য, লাস্য অর্থে প্রকৃতি অর্থাৎ স্ত্রী-নৃত্য। নৃত্যের এই উভয় শাখায় যে বহুরূপ কৌশল আছে, তাহার সন্দেহ নাই।

সঙ্গীত-বৃক্ষের যে প্রথম অথবা প্রধান শাখা গীতবিদ্যা, তাহা স্বরযোগে নানা প্রকার রাগরাগিণী পথে প্রকাশ হয়। তাহারই এই স্থানে কিঞ্চিৎ বলা যাইতেছে।

রাগ শব্দে মনের ভাব অথবা প্রকৃতির শোভা বুঝায়। ভারতবর্ষে বৎসর ষড়্ঋতুতে বিভক্ত আছে। ঐ ঐ ঋতুকালীন স্বভাবের বিশেষ বিশেষ মনোহর শোভা বর্ণন করিতে ছয় রাগের উৎপত্তি হইয়াছে। প্রাচীন মতে চান্দ্রবর্ষ* হইতে আরম্ভ হয় বলিয়াই শরৎকাল হইতে ঋতু গণনা করার প্রথা ছিল এবং সেই রীতি অনুসারে আদি ছয় রাগ ছয় ঋতু-ক্রমান্বয়ে নিরূপিত আছে। যথা, শরতে ভৈরব, হেমন্তে মালব বা মালকোষ, শিশিরে শ্রী, বসন্তে হিন্দোল বা বসন্ত, গ্রীষ্মে দীপক এবং বর্ষায় মেঘ। পরে দিবারাত্রকে পঞ্চ ভাগ করিয়া, অর্থাৎ প্রাতঃ, পূর্ব্বাহ্ণ, মধ্যাহ্ন, অপরাহ্ণ ও সন্ধ্যাকাল সকলের শোভা বর্ণনচ্ছলে পঞ্চ পঞ্চ রাগিণীর উৎপত্তি হইয়া, ছয় রাগের সহিত ৩০টি রাগিণীর পরিণয় হয়। এবং পুনর্ব্বার দিবারাত্রকে অষ্ট প্রহরে বিভাগ করিয়া এক এক রাগের আট আট পুত্ররূপে ৪৮টী উপরাগের উৎপত্তি হয়। অনেক প্রাচীন গ্রন্থে সর্ব্বশুদ্ধ উপর্য্যুক্ত ৮৪টী রাগরাগিণীর বিবরণ আছে। এবং অনেকে বলেন যে, প্রাচীনকালে ভারতবর্ষের সঙ্গীত-রাজ্যে অসংখ্য রাগরাগিণী বিদ্যমান ছিল। এমন কি যখন দ্বাপর যুগে শ্রীকৃষ্ণ বৃন্দাবনে সুচারুনয়না গোপাঙ্গনা মণ্ডলীকে প্রেমতত্ত্ব উপদেশ করিতেন, তখন তাঁহাকে সেই প্রেমাভিলাষিণী ষোড়শশত গোপিণী প্রত্যেকে এক এক বিশেষ রাগরাগিণীতে স্বীয় স্বীয় প্রণয়ানুরাগের পরিচয় দিতেন। রাগবিরোধের গ্রন্থকর্ত্তা সুবিখ্যাত সোম মহাশয় বলিয়াছেন যে, যেরূপ সমুদ্র-জল বায়ুসহযোগে অনন্ত তরঙ্গরাশি বিস্তার করে, সেইরূপ শব্দতত্ত্বের প্রধান সপ্ত স্বররাজ ও তাহাদের পরস্পরের মধ্যস্থিতা ২২টী শ্রুতি অর্থাৎ খণ্ড-স্বর বা স্বর-কামিনী সকল শ্রেণীবদ্ধ করিয়া ত্রিগুণে প্রপূরিত করিলে, অর্থাৎ উদারা মুদারা তারা প্রভৃতি তিন গ্রামে বিস্তার পূর্ব্বক বিশেষ বিশেষ স্বরের পরস্পর সংযোগ ও বিয়োগে ক্রমশঃ যে অসংখ্য রাগ-তরঙ্গের উদ্ভব হইতে পারে, তাহা অসম্ভব নহে। তবে যন্ত্র বা কণ্ঠস্বর উপলক্ষে উপর্য্যুক্ত ৮৪টী অতিরিক্ত রাগরাগিণীর আলোচনা করা সু-কঠিন ও আয়াস-সাধ্য বিবেচনায় সচরাচর সঙ্গীত গ্রন্থে তাহারে নাম মাত্র উল্লেখ নাই। এই স্থলে ঐ

সপ্ত স্বর সকলের মধ্যস্থিতা ২২টী শ্রুতি বা স্বরকামিনী কোন্ কোন্ স্থানে অবস্থিতি করে, তাহা জানা আবশ্যক। ষড়জ ও ঋষভের মধ্যে ৪, ঋষভ ও গান্ধারের মধ্যে ৩, গান্ধার ও মধ্যমের মধ্যে ২, মধ্যম ও পঞ্চমের মধ্যে ৪, পঞ্চম ও ধৈবতের মধ্যে ৪, ধৈবত ও নিষাদের মধ্যে ৩, এবং নিষাদ ও ষড়জের মধ্যে ২, মোট ২২টী খণ্ড স্বর বর্ত্তমান আছে। তাহাদিগকে কোমলতর ও কোমলতম ও তীব্রতর ও তীব্রতম বলিয়া উল্লেখ করা হয়। হিন্দু সঙ্গীত-বেত্তারা সকলে সুকবি ছিলেন, সুতরাং তাঁহাদের কাব্যনৈপুণ্য দর্শন করাইবার জন্য স্বর-পরিবারদের নায়ক-নায়িকা রূপে বর্ণন করিয়াছেন। উক্ত ২২টী খণ্ড-স্বরকে স্বরকামিনী অথবা অপ্সরা রূপে গণনা করিয়া তাহাদের প্রত্যেকের এক এক নাম রাখিয়াছেন। যথা পঞ্চমের ৪টী মহিষীর নাম মালিনী চপলা লোলা ও সর্ব্বরত্না, ধৈবতের শান্তা প্রভৃতি তিনটী ভার্য্যা এবং অপরাপর স্বর-পত্নীদিগের রমণীয় নাম সকল উৎকৃষ্ট সঙ্গীত গ্রন্থ মাত্রে উল্লিখিত আছে। শব্দদেশের তিনগ্রামে যখন কোন এক বিশেষ স্বরনায়ক বিশেষ নায়িকা সহযোগে আধিপত্য করেন এবং অপর স্বর-পরিবারেরা তাহার অনুচর এবং বৈরীদল-শ্রেণীভুক্ত হয়, তখন এক বিশেষ রাগ বা রাগবধুর মূর্ত্তি প্রকাশ হয়। এবং তান উপজ প্রভৃতি আরোহ অবরোহ দ্বারা তাহাকে অলংকৃত করে। কোন বিশেষ রাগ-রাগিণীতে যে কয়েকটী স্বরের ব্যবহার হয়, তাহাদের প্রত্যেকের প্রয়োগের স্থান ও পরিমাণ বিবেচনায় তাহারা ভিন্ন ভিন্ন উপাধি গ্রহণ করে। যথা, বাদী, সম্বাদী, ন্যাস ইত্যাদি।

গীত বা রাগের আরম্ভে যে স্বরের প্রয়োগ হয় তাহাকে গ্রহ কহে এবং সমাপ্তিকালীন স্বরকে ন্যাস ও যাহার বহুল প্রয়োগ হয় তাহাকে বাদী অথবা অংশ কহে। ফলে, রাগ বা রাগিণীর বাদীস্বরকে রাজা সম্বাদীকে মন্ত্রী এবং অপর স্বরদের অনুচর বলিয়া গণনা করা হয় এবং যে বিশেষ স্বরকে রাগ বিশেষে ত্যাগ করিতে হয়, তাহাকে বিবাদী অথবা বৈরী কহে। প্রসিদ্ধ সঙ্গীত গ্রন্থ নারায়ণ হইতে উহার একটী প্রমাণ বচন নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

গ্রহঃ স্বরস্য ইত্যুক্তো যো গীতাদৌ সমর্পিতঃ
ন্যাসঃ স্বরস্তু স প্রোক্তো যো গীতাদি সমাপ্তিকঃ।
* * * *
যস্য সর্ব্বত্র বহুলম্ বাদ্যংশোঽপি *

কোন স্বর স্বামীত্ব স্বীকার করিলে এবং অপর স্বরেরা কেহ তাহার গ্রহ, কেহ অমাত্য, কেহ অনুচর পদবিশেষে নিয়োজিত হইলে এবং কেহ বা বৈরীরূপে পরিত্যক্ত হইলে কোন বিশেষ রাগ বা রাগিণীর মূর্ত্তি উদয় হয়।

ভারতবর্ষের কবিত্ব-আকাশে প্রাচীনকালে কি আশ্চর্য্য সূর্য্যই উদয় হইয়াছিল, যাহার আলোকে রাগরাগিণীর অদ্ভুত দেবমূর্ত্তি সকল সঙ্গীতবেত্তাদের হৃদয় দর্পণে প্রতিবিম্বিত হইয়া গ্রন্থবিশেষে বর্ণিত হইয়াছে! জোন্স মহাশয় বলেন যে রাগপরিবারদের শিল্পনৈপুণ্যসম্পন্ন যে সকল পট-সঙ্গীত গ্রন্থ নারায়ণে দৃষ্টিগোচর হয়, তাহারা দামোদর রত্নমালা চন্দ্রিকা এবং নারদ প্রণীত সঙ্গীত গ্রন্থ হইতে বচন সঙ্কলিত হইয়া চিত্রিত হইয়াছে।

উক্ত গ্রন্থে রাগরাগিণীদিগের চমৎকার মূর্ত্তির বিষয় বর্ণিত আছে। সে সমুদায় উল্লেখ করা শ্রমসাধ্য বিবেচনা করিয়া একটীমাত্র বচন নিম্নে লিখিত হইল।

লীলা বিহারেণ বনান্তরালে
চিন্বন্ প্রসূনানি বধূসহায়ঃ।
বিলাসবেশো ধৃতদিব্যমূর্ত্তিঃ
শ্রীরাগ এব প্রথিতঃ পৃথিব্যাম্॥

অস্যার্থ। পৃথিবীতে সুবিখ্যাত শ্রীরাগ যিনি বনের অন্তরালে নিজ কামিনীগণের সহিত নব মুকুল ও কুসুম চয়ন করিয়া ক্রীড়া করিতেছেন, তাঁহার মনোহর দেব-মূর্ত্তি দৃষ্ট হইতেছে।

কথিত আছে রাগরাগিণী সকল অসামান্য শক্তিসম্পন এক এক দেবদেবী। তাহাদের প্রভাবে অলৌকিক ব্যাপার সমস্ত সম্পাদন হইতে পারে। জনশ্রুতি আছে যে, যখন যবনকুলতিলক সম্রাট্ আকবর সঙ্গীত চূড়ামণি তানসেনকে গ্রীষ্ম ঋতুর শোভা বর্ণনচ্ছলে দীপক রাগের আলাপ করিতে আজ্ঞা করেন, তখন গায়ক বীর তানসেন দীপকের প্রভাব দর্শন করাইতে এতাধিক দৃঢ়-ব্রত হইয়াছিলেন যে তত্রস্থ লোক সকল সাক্ষাৎ বৈশ্বানরদের অনলের মূর্ত্তি দর্শন করিয়া ভয়ে ব্যাকুল হইয়াছিল এবং স্বয়ং তানসেনের জীবনান্ত হইয়াছিল। এই গল্পটি কতদূর বিশ্বাসযোগ্য তাহা পাঠক মহাশয়েরা বিচার করিবেন। শব্দ ও অনলের সহিত পরস্পরের কি সম্বন্ধ আছে তাহা আমরা জ্ঞাত নহি। তাহা পদার্থ বিৎ পণ্ডিতেরা বলিতে পারেন। তবে দুই পদার্থের পরস্পর ঘর্ষণ হইলে অগ্নির উৎপত্তি হয়, ইহা অনেকে দেখিয়াছেন। এবং বনে বায়ু বহিলে শুষ্ক বৃক্ষের পরস্পর ঘর্ষণ সহকারে দাবাগ্নি উদ্ভূত হইয়া বন দাহন করে তাহাও অনেকে শুনিয়া থাকিবেন। সেইরূপ যে দীর্ঘকাল স্বরঝটিকার প্রবল বহনে কণ্ঠ তালু জিহ্বা-মূল প্রভৃতি স্থান সকলের বায়ুর পরমাণুর সহিত বিপুল ঘর্ষণ হইলে হুতাশন প্রজ্জ্বলিত হইতে পারে, তাহা কি প্রকারে অসম্ভব বলা যাইবে? এবং তানসেন দীর্ঘকাল অতিরিক্ত পরিশ্রম করিয়া অতিশয় ক্ষীণ হইয়াছিলেন, সুতরাং কলেবর ত্যাগ করিতে বাধ্য হইলেন, তাহাতেই বা অযুক্তিযুক্ত কি? শুনিতে পাওয়া যায়, তানসেনের দুইটি কন্যা পিতার বিপদের বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া ব্যাকুলচিত্তে মেঘ রাগের আলাপ করিতে করিতে পিতার নিকটে ধাবমানা হইয়াছিলেন এবং অনল হইতে পিতৃজীবন রক্ষা করিতে এতাধিক ব্যগ্র হইয়া বর্ষার আহ্বান করিয়াছিলেন যে, মুষলধারায় বৃষ্টি হইয়া তত্রস্থ ভূমি প্লাবিত হইয়াছিল। এস্থলে বিচার্য্য এই যে, কণ্ঠাবিনিগর্ত বায়ুর সঞ্চালনে দূরস্থ মেঘ সকল আকর্ষিত হইয়া বৃষ্টি হইয়াছিল, কি সেই পিতৃশোকে বিহ্বলা অনাথা বালিকাদ্বয়ের খেদযুক্ত বিলাপধ্বনি তত্রস্থ লোকসমূহের নয়ন-মেঘ হইতে বারি আকর্ষণ করিয়া বর্ষণ করিয়াছিল? এতদুভয় যুক্তির মধ্যে পাঠক মহাশয়দিগের যাহা অভিরুচি হয়, তাহা গ্রহণ করিবেন। আমাদিগের বক্তব্য মাত্র এই যে, রাগরাগিণীর প্রভাবে যদিও কোন বাহ্যিক অলৌকিক ব্যাপার দর্শন করা অসম্ভব বোধ হয়, কিন্তু নানা প্রকার অদ্ভুত আন্তরিক অবস্থা উৎপন্ন হইতে পারে, তাহার আর সন্দেহ নাই।

এক্ষণে আদি ছয় রাগ ও তাহাদিগের পঞ্চ পঞ্চ কামিনী, একুনে ৩৬টী রাগরাগিণীর নাম উল্লেখ করা যাইতেছে। এবং ঐ সকল রাগরাগিণীর কোন স্বর অবলম্বন করিয়া প্রকাশমান হয়, তাহাও লিখিত হইতেছে।

স্বর সকলের সাঙ্কেতিক নাম নিম্নে লিখিত হইল। যথা,—

ষড়জ	ঋষভ	গান্ধার	মধ্যম	পঞ্চম	ধৈবত	নিষাদ
সা	ঋ	গা	ম	প	ধ	নি

এবং যে বিশেষ রাগ বা রাগিণীতে যে কোন বিশেষ স্বরবৈরী অর্থাৎ বিবাদী রূপে ত্যক্ত হইবে, তাহার স্থানে (০) শূন্য দৃষ্ট হইবে।

সুবিখ্যাত সোমেশ্বর প্রণীত রাগ বিরোধ হইতে নিচের লিখিত রাগপরিবারের নাম সকল উদ্ধৃত হইল।

রাগভৈরব	ধ	নি	সা	ঋ	গা	ম	প
তাহার পঞ্চ ভার্য্যা							
রাগিণী বরাতী	সা	ঋ	গা	ম	প	ধ	নি
ঐ মধ্যমাদি	ম	প	০	নি	সা	০	গা
ঐ ভৈরবী	সা	ঋ	গা	মা	প	ধ	নি
ঐ সৈন্ধবী	সা	ঋ	০	ম	প	ধ	০
ঐ জঙ্গালী	সা	ঋ	গা	ম	প	ধ	নি
রাগ মালব	নি	সা	ঋ	গ	ম	প	ধ
তাহার পঞ্চ ভার্য্যা							
রাগিণী টোড়ী	গ	ম	প	ধ	নি	সা	ঋ
ঐ গাডী	নি	সা	ঋ	০	ম	প	০
ঐ গন্তাক্রী	সা	ঋ	গ	ম	প	০	নি
ঐ ষষ্ঠাবতী	রাগবিরোধ নাই						
ঐ কুক্কুভা	ঐ	ঐ					

[রাগবিরোধ মতানুযায়ী]

(৯১ পৃষ্ঠায় * * * চিহ্নিত দেখ।)

রাগ হিন্দোল	ম	০	ধ	নি	সা	০	গ
তাহার পঞ্চ ভার্য্যা							
রাগিণী রামক্রী	সা	ঋ	গ	ম	প	ধ	নি
ঐ দেশাক্ষী	গ	ম	প	ধ	০	সা	ঋ
ঐ ললিত	সা	ঋ	গ	ম	০	ধ	নি
ঐ বিলাবলী	ধ	নি	সা	০	গ	ম	০
ঐ পটমঞ্জরী	রাগবিরোধ নাই						
রাগ দীপক	রাগবিরোধ নাই						
তাহার পঞ্চভার্য্যা							
রাগিণী দেশী	ঋ	০	ম	প	ধ	নি	সা
ঐ কাম্বোদী	সা	ঋ	গ	ম	প	ধ	০
ঐ নেতা	সা	ঋ	গ	ম	প	ধ	নি

ঐ কেদারী	নি	সা	ঋ	গ	ম	প	ধ
ঐ কর্ণাটী	নি	সা	০	গ	ম	প	০
রাগ মেঘ	রাগবিরোধ নাই						
তাহার পঞ্চভার্য্যা							
রাগিণী টেঙ্কা	সা	ঋ	গ	ম	প	ধ	নি
ঐ মল্লারী	ধ	০	সা	ঋ	০	ম	প
ঐ গুর্জ্জরী	ঋ	গ	ম	০	ধ	নি	সা
ঐ ভূপালী	গ	০	প	ধ	০	সা	ঋ
ঐ দেশাক্রী	সা	ঋ	গ	ম	প	ধ	নি

প্রাচীন সঙ্গীতবেত্তাদের মধ্যে রাগরাগিণীর বিশেষে ভিন্ন ভিন্ন মত ছিল, দৃষ্ট হয়। সঙ্গীতপারগ মিরজা খাঁর গ্রন্থ হইতে ৩৬টী রাগরাগিণীর প্রণালী যাহা জোন্স মহাশয় উদ্ধার করিয়াছেন, তাহাও এ স্থানে লেখা যাইতেছে। তাহাতে রাগ বিশেষে স্থানে স্থানে স্বরের বিভিন্নতা দৃষ্ট হইবে। মিরজা খাঁ বলেন যে তিনি স্বকপোলকল্পিত কোন রাগ বা রাগিণীর স্বরপ্রণালী প্রকাশ করেন নাই, যাহা যাহা লিখিয়াছেন, তৎসমুদায় প্রাচীন প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থ হইতে সংগৃহীত হইয়াছে।

প্রথম							
রাগ ভৈরব	ধ	নি	সা	০	গ	ম	০
রাগিণী বরাতী	সা	ঋ	গ	ম	প	ধ	নি
ঐ ভৈরবী	ম	প	ধ	নি	সা	ঋ	গ
ঐ মধ্যমাদী	ম	প	ধ	নি	সা	ঋ	গ
ঐ সৈন্ধবী	সা	ঋ	গ	ম	প	ধ	নি
ঐ বাঙ্গালী	সা	ঋ	গ	ম	প	ধ	নি
দ্বিতীয়							
রাগ মালব	সা	ঋ	গ	ম	প	ধ	নি
রাগিণী টড়ী	সা	ঋ	গ	ম	প	ধ	নি
ঐ গাডী	সা	০	গ	ম	০	ধ	নি
ঐ গণ্ডাক্রী	নি	সা	০	গ	ম	প	০
ঐ ষষ্ঠাবতী	ধ	নি	সা	ঋ	গ	ম	০
ঐ কুকুভা	ধ	নি	স	ঋ	গ	ম	প

(রাগবিরোধ মতানুযায়ী) * * *

রাগশ্রী	সা	ঋ	গ	ম	প	ধ	নি
রাগিণী মলয়াশ্রী	সা	০	গ	ম	প	০	নি
ঐ মারভী	গ	ম	প	০	নি	সা	০
ঐ ধ্যানস্বী	সা	০	গ	ম	প	০	নি

ঐ বাসন্তী	সা	ঋ	গ	ম	০	ধ	নি
ঐ আসয়ারি	ম	প	ধ	নি	সা	ঋ	গ

(মিরজা খাঁ গ্রন্থানুযায়ী)

তৃতীয়							
রাগশ্রী	সা	ঋ	গ	ম	প	ধ	নি
রাগিণী মলয়াশ্রী	সা	ঋ	গ	ম	প	ধ	নি
ঐ মারভী	সা	০	গ	ম	প	ধ	নি
ঐ ধ্যানস্বী	সা	প	ধ	নি	ঋ	গ	০
ঐ বাসন্তী	সা	ঋ	গ	ম	প	ধ	নি
ঐ আসওয়ারি	ধ	নি	সা	০	০	ম	প
চতুর্থ							
রাগ হিন্দোল	সা	০	গ	ম	প	০	নি
রাগিণী রামক্রী	সা	০	গ	ম	প	০	নি
ঐ দেশাক্ষী	সা	ম	গ	ধ	নি	সা	০
ঐ ললিত	ধ	নি	ম	০	গ	ম	০
ঐ বিলাবলী	ধ	নি	সা	ঋ	গ	ম	প
ঐ পটমঞ্জরী	প	ধ	নি	সা	ঋ	গ	ম
পঞ্চম							
রাগ দীপক	সা	ঋ	গ	ম	প	ধ	নি
রাগিণী দেশী	ঋ	গ	ম	০	ধ	নি	সা
ঐ কাম্বোদী	ধ	নি	সা	ঋ	গ ·	ম	প
ঐ নেতা	সা	নি	ধ	প	ম	গ	ঋ
ঐ কেদারী	নি	ম	০	গ	ম	প	০
ঐ কর্ণাটী	নি	সা	ঋ	গ	ম	প	ধ
ষষ্ঠ							
রাগ মেঘ	ধ	নি	সা	ঋ	গ	০	০
রাগিণী টেঙ্কা	সা	ঋ	গ	ম	প	ধ	নি
ঐ মল্লারী	ধ	নি	০	ঋ	গ	ম	০
ঐ গুর্জ্জরী	ঋ	গ	ম	প	ধ	নি	সা
ঐ ভূপালী	সা	গ	ম	ধ	নি	প	ঋ
ঐ দেশাক্রী	ঋ	গ	ম	প	ধ	নি	সা

এতদ্দেশে সঙ্গীত বিষয়ক চারিটী প্রাচীন মত প্রচলিত আছে। যথা ঈশ্বর, ভরত, হনুমন্ত বা পবন এবং কল্লীনাথ। ছয় রাগ ও ত্রিশটী রাগিণীর সংখ্যার বিষয় যাহা উপরে লিখিত হইল তাহা কেবল পবন মত অনুযায়ী, সর্ব্ববাদিসম্মত নহে। কল্লীনাথ মতে এক এক রাগের ছয় ছয়

ভার্য্যা ও আট আট পুত্র। সর্ব্বশুদ্ধ ৯০টী রাগরাগিণী বিদ্যমান আছে এবং ভরত মতে ৪৮টী রাগ পুত্রদের এক এক পত্নী আছে। তাহাতে রাগপরিবারের একশত আটত্রিশ সংখ্যা হয়। ফলে, যে সময়ে ভারতবর্ষে সঙ্গীত বিদ্যার অতিশয় চর্চা ছিল, তখন ভিন্ন ভিন্ন রাজ্যের ভিন্ন ভিন্ন পাঠশালার মতে নূতন রাগ সকল রচিত হইত এবং সেই সেই রাজধানীর নামানুযায়ী তাহাদের নামকরণ হইত। মূলতান রাগের নাম শ্রবণ করিলে বোধ হয় উক্ত রাগটী মূলতান নগরের প্রাচীন সঙ্গীত বিদ্যালয়ের সম্পত্তি। কখন কখন রচয়িতার নামে রাগের উপাধি দেওয়া যাইত। সারেং রাগটী বিখ্যাত সঙ্গীতজ্ঞ শারঙ্গদেবের রচিত অনুভব হয়। কখন বা কোন বিশেষ ঘটনা দ্বারা কোন রাগ বিশেষ উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছে। বাঘেশ্বরী অথবা বাঘশ্রী রাগিণী, অনেকে বলিয়া থাকেন, মহাহিংস্র পশু ব্যাঘ্র প্রভৃতিকে মোহিত করিতে পারে। বোধহয় কোন সময়ে শ্রী রাগের পরিবারের মধ্যে কোন বিশেষ রাগিণীর আলাপ কালে মৃগ সর্প এবং অপরাপর জন্তুদের ন্যায় ব্যাঘ্রও বশীভূত হইয়া থাকিবে এবং সেই ঘটনা অবধি সেই রাগিণীটী বাঘশ্রী আখ্যা পাইয়াছে। যখন ভারতবর্ষে ঐ ঐ রীতি অনুসারে রাগরাগিণীর নামকরণের প্রথা ছিল এবং যখন সঙ্গীতবেত্তারা নিজ নিজ পাণ্ডিত্য দেখাইবার লালসায় নূতন নূতন রাগরাগিণী রচনা করিতে নিযুক্ত থাকিতেন, তখন যে ক্রমশঃ রাগরাগিণীর বহু সংখ্যা হইবে, তাহার আশ্চর্য্য কি!

ভারতবর্ষের যে কয়েকটী বাদ্য যন্ত্রের সচরাচর নাম শুনা যায়, তাহাদের উল্লেখ করা উচিত বোধে নিম্নে লিখিত হইতেছে। বাদ্যযন্ত্র শব্দে কাষ্ঠ, ধাতু, চর্ম্ম, মৃত্তিকা প্রভৃতি পদার্থে নির্ম্মিত বস্তু, যাহা হস্ত বা বায়ুর আঘাতে শব্দায়মান করা যায়, তাহাকে বুঝায়। কোন্ কোন্ সময়ে কোন্ ২ যন্ত্র প্রথম সৃষ্টি হইয়াছিল, কোন্ ২ মহাত্মা তাহাদের প্রকাশ করেন এবং তাহাদের প্রকাশ হইবার বিশেষ ঘটনাই বা কি? তৎসমুদয় বর্ণন করা আমাদের ক্ষমতার অতিরিক্ত। তবে মাতৃভূমির গৌরব কীর্ত্তন করিবার মানসে তাহাদের যথাজ্ঞাত নাম সকল লিখিতে বাধ্য হইলাম। পুরাতন বাদ্যযন্ত্র সকলের মধ্যে বীণা ও বংশীর নাম শ্রেষ্ঠ রূপে গণনা করা হয়। তাহাদের উভয়ের মধ্যে কে প্রাচীনতর ও কে প্রাচীনতম তাহা বলিতে পারি না। পুরাণ-অগ্রগণ্য ভারতে উভয়েরই নাম উল্লেখ করা আছে। সমুদ্র মন্থনে যে আশ্চর্য্য বংশ উদ্ভুত হইয়াছিল, তাহার প্রধান অংশ মুরলীরূপে জগতের উৎকৃষ্ট শ্রীকৃষ্ণ করে শোভিত হইয়াছিল, এবং দেবর্ষি নারদ, যিনি পরম ভাগবতদিগের অগ্রগণ্য ছিলেন, যিনি জ্ঞানযোগে ও তপোবলে পরম পবিত্র পুরুষার্থ লাভ করিয়াছিলেন, তিনি ভগবৎ উপাসনার শ্রেষ্ঠ উপযোগী সঙ্গীত বিদ্যার সমাদর করিতে জগন্মাতা বাগ্‌দেবীর করকমল-স্থিতা বীণাযন্ত্রের অনুরূপ পৃথিবীতে প্রকাশ করেন, কথিত আছে। শিঙ্গা, ডমরু, দুন্দুভি প্রভৃতি অপর অপর বাদ্য-যন্ত্রসকল, যাহাদের নাম পুরাণে শ্রুত হওয়া যায়, তাহাদের মধ্যে কোন্‌টী কোন্ সময়ে প্রথম প্রকাশ পাইয়াছিল, তাহা অনুসন্ধান করা সুকঠিন। আমরা কেবল তাহাদের নাম মাত্র নীচের লিখিত শ্রেণী মতে উল্লেখ করিলাম।

স্বরসহায়ী।

যে সকল যন্ত্র ফূৎকার বা বায়ুর সঞ্চালনে বাদিত হয়।	যে সকল যন্ত্র অঙ্গুলীর পীড়নে অথবা রজ্জুর ঘর্ষণে বাদিত হয়।

বংশী
শিঙ্গা
তূরী
ভেরী
শঙ্খ
সানাই
রোসন চৌকি

তুমড়ী
ভেপু বা
ভোড়ং

বীণা
রবাব
সরদ
সেতার
এস্রাজ
সারঙ্গ
সারিন্দা

স্বরশিঙ্গার
তাউস
তানপুরা
একতারা
মুচং
জলতরঙ্গ

সমরসহায়ী।

কাষ্ঠ চর্ম্ম ও মৃত্তিকা
নির্ম্মিত
মৃদঙ্গ বা পাখোয়াজ
তবলা
খোল
ঢোলক
জোড়খাই
রণ ঢক্কা বা ঢাক
দামামা
দগড়া
দুন্দুভি
নাগ্‌রা
নহবৎ
তাসা
কাড়া

জগঝম্প
দারা
খঞ্জনী
ডমরু
গোপীযন্ত্র
মাদল।

ধাতু নির্ম্মিত
ঘণ্টা
কাঁসর
কাঁসি
মন্দিরা
কর্ত্তাল
খরতাল।

উপরি-উক্ত বাদ্যযন্ত্র সকলের মধ্যে কেহ কেহ রণবাদ্য কেহ কেহ মাঙ্গল্য বা উৎসব বাদ্য বলিয়া পরিগণিত হয়। তূরী ভেরী দুন্দুভি দামামা প্রভৃতি প্রাচীন কালের রণক্ষেত্রে বাদিত হইত, সুতরাং তাহাদিগকে রণবাদ্য বলা যাইতে পারে। এবং শঙ্খ ঘণ্টা কাঁসর সানাই ঢোল নহবৎ প্রভৃতি বাদ্য সকল মঙ্গল বা উৎসব কার্য্যে ব্যবহৃত হয় বলিয়া তাহাদিগকে মাঙ্গল্য বাদ্য কহে।

স্বরলিপি

স্বরলিপির সহজ পদ্ধতি স্থাপন করা প্রয়োজন হইতেছে। প্রাচীন কালে ভারতবর্ষে স্বর সকলের লিপিবদ্ধ করিবার সদুপায় ছিল। জয়দেবের গীতগোবিন্দ ও প্রাচীন সঙ্গীত গ্রন্থে তাহার সাঙ্কেতিক চিহ্নসকল অদ্যাপি দৃষ্ট হয়। স্বর বিশেষের কম্পন বা হ্রস্ব দীর্ঘ ও বিশ্রাম কাল নির্দ্দিষ্ট করিতে হইলে বিশেষ বিশেষ সাঙ্কেতিক লক্ষণ সকল অঙ্কিত হইত এবং ঐ সকল চিহ্ন উপলক্ষ করিয়া গীত সকল যে রাগরাগিণী বিশেষে লিপিবদ্ধ করা যাইবে, তাহার বাধা কি?

আক্ষেপের বিষয় এই যে হিন্দু আধিপত্যের পতনের সঙ্গে সঙ্গেই ভারতমাতার পূর্ব্ব-ধন-সকল অন্ধকার কূপে পতন হইয়াছে। যবন অধিকার কালেও প্রাচীন সঙ্গীতের কিছু কিছু আদর ছিল। সম্রাট আকবর ও মহম্মদ সা প্রভৃতি কেহ কেহ হিন্দুসঙ্গীতের আদর করিতেন। ব্রজ বাওরা, গোপাল নায়ক, তানসেন প্রভৃতি সঙ্গীত-নিপুণ বড় বড় গায়কেরা রাজ-অন্নে প্রতিপালিত হইতেন এবং সংস্কৃত সঙ্গীত গ্রন্থসকল যবন ভাষায় অনুবাদিত হইত, শুনিতে পাওয়া যায়। কিন্তু বর্ত্তমান কালে ভারত-সঙ্গীত-প্রদীপ একেবারে নির্ব্বাণ হইয়াছে। সাধারণের উপকারার্থে কোন রাজকীয় সঙ্গীত পাঠশালা স্থাপিত নাই, রাজকোষ হইতে কিছুমাত্র সাহায্য প্রদান করা হয় না, প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থসকল প্রায় লোপ হইয়াছে, আর যে কয়েকখানির নাম শুনিতে পাওয়া যায়, তাহাও দুষ্প্রাপ্য। সুবিজ্ঞ অধ্যাপকের সংখ্যা অতি অল্প, যাঁহারা আছেন তাঁহারা বিনা বেতনে শিক্ষা প্রদান করেন না। সঙ্গীত বিদ্যার্থীদিগের মধ্যে অনেকে ক্ষমতাহীন, গুরু সন্তোষ করিতে অসমর্থ, এবং শিক্ষা দিবারও সুপ্রণালী নাই। সুতরাং সঙ্গীতবিদ্যার যে পূর্ব্বশ্রী ভ্রষ্ট হইয়াছে তাহাতে আর সন্দেহ কি! ভারতমাতার স্বাধীনতার যে পথে গমন করিয়াছে সঙ্গীতবিদ্যাও যে সেই পথগামিনী হইয়াছেন, তাহা বলা বাহুল্য! হায়! বঙ্গভূমির ধনাঢ্য হিন্দুসমাজ আর কতকাল মাতৃদুর্দশা দেখিয়া নিশ্চিন্ত থাকিবেন! পৃথিবীর অন্য অন্য দেশবাসী আধুনিক সভ্য জাতিদের স্বদেশ গৌরবাকাঙ্ক্ষা দর্শনে কি তাহাদের মনে ধিক্কার উপস্থিত হয় না? ভারতভূমির অমূল্য ধন সঙ্গীত-রত্ন তাচ্ছিল্য তস্করে অপহরণ করিতেছে তাহা কি তাঁহারা দেখিয়াও দেখিতেছেন না?

এক্ষণে দেশ-হিতৈষী বিদ্যানুরাগী সভ্য মহাশয়দিগের নিকট প্রার্থনা এই যে, তাঁহারা মাতৃভূমির পূর্ব্ব গৌরব পুনরুদ্দীপণ করা অবশ্যকর্ত্তব্য বিবেচনা করিয়া, সঙ্গীত বিদ্যালয় সংস্থাপনে অগ্রসর হউন। প্রাচীন প্রাচীন সঙ্গীত গ্রন্থ সকল, যাহাদের নাম শুনিতে পাওয়া যায়, অর্থাৎ রাগবিরোধ, রাগমালা, রাগদর্পণ, নারায়ণ, রত্নাকর, সভাবিনোদ প্রভৃতির অন্বেষণ করিয়া বঙ্গ ভাষায় অনুবাদ করণের উপায় করুন, শিক্ষা প্রদান করিবার সুনিয়ম সকল সংস্থাপিত হউক এবং অধ্যয়ন করিবার সুলভ উপায় করিতে চেষ্টিত হউন। তাহা হইলেই সঙ্গীতের যথার্থ পুরস্কার করা হইবে এবং অল্প কাল মধ্যেই ভারতের চির-উর্ব্বরা ভূমির সঙ্গীততরু পুনঃমঞ্জরিত হইবে ও পূর্ব্বশ্রী ধারণ করিতে থাকিবে। আর এই দেশবাসিদের উৎসাহ ও একাগ্রতা দেখিলে বিদ্যাপ্রতিপালক প্রজারঞ্জক ব্রিটিশরাজ বিশেষ সাহায্য প্রদানে উদ্যত হইবেন, এবং কালেতে যে রাজ-প্রতিষ্ঠিত সঙ্গীত বিদ্যালয় ভারতবর্ষের নগরে নগরে দৃষ্ট হইবে এমত ভরসা করা যাইতে পারিবে।

আহা! আমাদের মাতৃভূমি হিন্দুস্থানে কবে সেই শুভদিনের উদয় হইবে, যখন প্রধান প্রধান বিদ্যালয় মাত্রে সঙ্গীত বিদ্যা অধ্যয়ন করিবার উপায় হইবে, বিশুদ্ধ সঙ্গীত শিক্ষা করা সভ্যমাত্রের অবশ্যকর্ত্তব্য কর্ম্ম সকলের মধ্যে পরিগণিত হইয়া বালক বালিকারা পঠদ্দশায় সাহিত্য কাব্য জ্যোতিষ অঙ্কশাস্ত্র প্রভৃতির আলোচনা করিবার সঙ্গে সঙ্গেই সঙ্গীত শাস্ত্রের অধ্যয়ন করিতে থাকিবে।

আহা! যখন ভারতমাতার সঙ্গীত তরু পুনর্জীবিত হইয়া স্বর্গলোক-প্রিয় পারিজাত কুসুম নিচয়ে শোভিত হইবে, তাহাদের অপরিসীম সৌরভে যেদিন সমস্ত পৃথিবী আমোদিত করিবে, আর যেদিন সেই ত্রিভুবন মোহন সৌরভে মোহিত হইয়া ইটালি, ফ্রান্স, জার্মানি প্রভৃতি দেশবাসী

সঙ্গীত-অনুরাগী অলিকুল ভারত-সঙ্গীত-তরু মূলে আকর্ষিত হইবে, সেই শুভদিনে ভারতবাসীরা যে কি অপার আনন্দনীরে মগ্ন হইবেন, তাহা ব্যক্ত করিতে লেখনী অসমর্থ হইতেছে।

শ্রীগঙ্গাধর চট্টোপাধ্যায়

গুরু পাঠশালার উৎকর্ষ বিধান

এ দেশীয় গুরুমহাশয়েরা এক্ষণে যেরূপে শিক্ষা দিয়া থাকেন, কিরূপে তাহা উৎকর্ষ সাধন হইতে পারে তদ্বিষয়ক রচনা।

এক্ষণে দেশীয় গুরুমহাশয়েরা বালকদিগকে যেরূপে শিক্ষা দিতেছেন, তাহার উৎকর্ষ সাধন বিষয়ে নিম্নলিখিত উপায়গুলি প্রশস্ত। প্রথম, উপযুক্ত শিক্ষক নিয়োগ। দ্বিতীয়, বর্ত্তমান শিক্ষা প্রণালীর পরিবর্ত্তন। তৃতীয়, এক্ষণে যে ২ বিষয়ের শিক্ষা দেওয়া হইতেছে তাহার আবশ্যক মত পরিবর্ত্তন।

১ম। উপযুক্ত শিক্ষক নিয়োগ

অন্যান্য সকল কার্য্য অপেক্ষা শিক্ষকের কার্য্য অতি দুরূহ। কিঞ্চিৎ লেখাপড়া জানিলেই শিক্ষকতা করা যায় না। একজন উপযুক্ত ও সুবিজ্ঞ ব্যক্তি দ্বারা শিক্ষাকার্য্য সম্পন্ন হইয়া যেরূপ উপকার দর্শে, যে সে ব্যক্তি দ্বারা উহা সম্পাদন করিবার উপকার হওয়া দূরে থাকুক, তদপেক্ষা দশ গুণ অপকার সংঘটিত হয়। শিক্ষকের উপদেশ ও তাহার দৃষ্টান্তানুসারে বালকদিগকে কার্য্য করিতে হইলে শিক্ষকের উপদেশ ও তাঁহার ব্যবহারানুসারে বালকেরাও সৎ বা অসৎ হইয়া পড়ে।

এক্ষণে আমরা যেরূপ শিক্ষাকার্য্যের বিষয়ে এই প্রস্তাব লিখিতে প্রবৃত্ত হইতেছি, তাহা আরও গুরুতর। অধিকবয়স্ক শিক্ষিত বালকদিগের অপেক্ষা যে সকল সুকুমারমতি বালকগণ প্রথমে বিদ্যারম্ভ করে, তাহাদিগকে শিক্ষা দেওয়া অতি সুকঠিন কার্য্য। তাহাদের মনঃক্ষেত্র তৎকালে এরূপ আর্দ্র থাকে যে তখন তাহাতে যে কোন প্রকার বীজ বপন করা যায় তাহাই শীঘ্র অঙ্কুরিত হয়। এবং উহা ক্রমে ২ এত সুদৃঢ় হইতে থাকে যে পরে উহার মূলোৎপাটন করা অতিশয় কঠিন হইয়া পড়ে। সে সময়ে তাহাদের মন যেদিকে ফিরান যায় সেই দিগেই ফিরে। যাহা শিখান যায় তাহাই শিখে। বালকদিগের তৎকালীন শিক্ষাদির উপরেই উহাদের ভবিষ্যৎ সুখ দুঃখ নির্ভর করে। তখন যাহার যেরূপ স্বভাব হইয়া পড়ে বয়োবৃদ্ধি অনুসারে সেই স্বভাবেরই বৃদ্ধি হইতে থাকে। এবং সময়ে উহা অসীম দুঃখ বা অনির্ব্বচনীয় সুখের কারণ হইয়া উঠে। যে বালক বাল্যাবস্থা হইতে সৎ শিক্ষা ও সদুপদেশ পাইয়া আইসে, সে কখনই বড় হইয়া অসৎ বা দুশ্চরিত্র হয় না। আর যাহারা বাল্যকাল হইতে অসদুপদেশ প্রাপ্ত ও অসৎ দৃষ্টান্ত দর্শন করিয়া আইসে, বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে তাহারা কদাচ সচ্চরিত্র হয় না। অতএব যে সকল ব্যক্তি বালকদিগকে প্রথম বিদ্যারম্ভ কালে শিক্ষা প্রদানে নিযুক্ত হন, তাঁহারা অতি গুরতর ভার স্কন্ধে গ্রহণ করেন।

শিশুগণকে সর্ব্বদাই মাতার নিকটে থাকিতে হয়। তাহাদের অধিকাংশ সময় মাতৃ-সংসর্গে অতিবাহিত হয়। সুতরাং মাতা শিক্ষিতা হইলে বালকেরা প্রথম হইতেই সৎশিক্ষা ও সদুপদেশ প্রাপ্ত হইতে থাকে। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ আমাদিগের দেশে মাতা শিক্ষিত হওয়া দূরে থাকুক, অনেক পিতাকেও অভিধান খুলিয়া শিক্ষা শব্দের অর্থ দেখিতে হয়। এমন অবস্থায় গুরুমহাশয়ের পাঠশালাই আমাদের বালকদিগের একমাত্র শিক্ষাস্থল। এক্ষণে যে সকল গুরুমহাশয়দিগের উপরে আমরা বালকগণের ভবিষ্যৎ সুখ-দুঃখের ভার নিক্ষেপ করিতেছি, তাঁহারা কি প্রকার ধাতুর লোক এবং কি প্রকার শিক্ষা প্রদান করেন তাহা কাহারও অবিদিত নাই। যাঁহারা কোন কার্য্যেরই হইলেন না, তাঁহারা অবশেষে এক পাঠশালা খুলিয়া বসেন। কিন্তু তাঁহারা কি গুরুতর কার্য্যভার গ্রহণ করিলেন, তাহা একবারও বিবেচনা করেন না। বালকেরা প্রথম হইতেই তামাক, সুপারি, ও দুই একটা পয়সা পিতামাতাকে গোপন করিয়া আনিয়া দিয়া গুরু মহাশয়ের মন রক্ষা করিতে থাকে। সেই সময় হইতেই তাহারা চুরি ও মিথ্যা কথা শিখিতে আরম্ভ করে। গুরুমহাশয়ও নিজ শিক্ষানুসারে বালকগণকে শিক্ষা দিয়া, যে কোন প্রকারে কিঞ্চিৎ পয়সার পন্থা দেখিতে থাকেন। মধ্যে ২ বেত্র হস্তে যেরূপ শিক্ষা দেন, তাহা বালকেরা আজীবন বিস্মৃত হইতে পারে না। বনের ব্যাঘ্র ভল্লুক অপেক্ষাও বালকেরা গুরুমহাশয়কে অধিক ভয় করে। এমন কি পাঠশালার বালকগণকে ভয় দেখাইবার আবশ্যক হইলে "ঐ গুরুমহাশয় আসিতেছে" এই বলিলেই পর্য্যাপ্ত হয়। হাপা জুজুর আবশ্যক হয় না। এই ত বর্ত্তমান গুরুমহাশয়দিগের অবস্থা। এই সকল ব্যক্তিদ্বারা সুকুমারমতি বালকগণের যেরূপ শিক্ষা হইতে পারে তাহা বুদ্ধিমান ব্যক্তি মাত্রেই বুঝিতে পারেন।

এক্ষণে যে উপায় অবলম্বন করিলে এই সকল অনিষ্ট নিবারণ হইয়া বালকগণের যথার্থ শিক্ষা হয়, তদ্বিষয়ে বিবেচনা করা উচিত। সার্‌কেল পণ্ডিতদিগের যেরূপ পরীক্ষা দিয়া কার্য্য করিতে হয়, গুরুমহাশয়দিগের মধ্যেও সেই প্রকার একটী পরীক্ষা গ্রহণের নিয়ম করা উচিত। যাঁহারা পরীক্ষা দিতে সমর্থ হইবেন, তাঁহাদিগকেই গুরুমহাশয় মনোনীত করা যাইবে। যে-সে ব্যক্তি গুরুমহাশয় হইতে পারিবেন না। সার্‌কেল পণ্ডিতদিগের যেরূপ বেতনের নিয়ম আছে ইঁহাদিগেরও সেইরূপ একটী নিয়ম করিতে হইবে। বেতন অন্ততঃ ৮ টাকার ন্যূন হইলে ভাল লোক পাওয়া যাইবে না। এতদপেক্ষা বেতন ন্যূন হইলে বালকদিগের নিকট হইতে পয়সা ও সিধা প্রভৃতি লইবার যে রীতি আছে, তাহার লোপ হইবে না। এক্ষণে কথা হইতেছে বর্ত্তমান গুরুমহাশয়েরা এরূপ নিয়মে সম্মত হইবেন কি না? ইহার উত্তর স্থলে এই মাত্র বক্তব্য যে, উক্ত দলের মধ্যে যাঁহারা নিতান্ত 'গুরুমহাশয়' তাঁহারা প্রস্থান করুন্। যাঁহারা কিঞ্চিৎ লেখাপড়া জানেন, তাঁহারা পরীক্ষা দিতে অসম্মত হইবেন না। তবে যাঁহারা প্রাচীন, কিঞ্চিৎ লেখাপড়াও জানেন এবং অনেকদিন অবধি ঐ কার্য্য করিয়া আসিতেছেন, তাঁহাদিগকে পরীক্ষা দিতে হইলে তাঁহারা অসন্তুষ্ট ও আপনাদিগকে অপমানিত বোধ করিবেন। এরূপ অবস্থায় তাঁহারা উপযুক্ত ও প্রধান ব্যক্তিদিগের প্রশংসাপত্র প্রদর্শন করিতে পারিলে কর্ম্মপ্রাপ্ত হইবেন। বৎসরে অন্ততঃ দুইবার বালকদিগের উন্নতির হিসাব দিতে হইবে। তাহা হইলে কেহ ফাঁকি দিতে পারিবে না। কার্য্যের নিমিত্ত দায়ী হইতে হইলে কোন মূর্খ ব্যক্তি উহাতে হস্তক্ষেপ করিতে সাহসী হইবে না। বালকদিগের উন্নতি অনুসারে উহাদিগের পুরস্কারের নিয়ম করিতে হইবে। নতুবা উহাদের নিজের কোন উন্নতির আশা না থাকিলে,

বালকদিগের উন্নতি বিষয়ে উহাদের তত যত্ন থাকিবে না। উৎসাহদান ভিন্ন কোন উন্নতিরই আশা করা যায় না। সন্তুষ্ট চিত্তে কার্য্য করিলে উহা যে প্রকার সুচারুরূপে সম্পন্ন হইবার সম্ভাবনা, বাধ্য হইয়া অসন্তুষ্ট চিত্তে কার্য্য করিলে সেরূপ হইবার সম্ভাবনা নাই। প্রত্যুত তাহাতে অনিষ্টই হইয়া থাকে। যে গ্রামে পাঠশালা হইবে উহা, তত্রত্য বা তন্নিকটবর্ত্তী যে কোন বিদ্যালয় থাকিবে, তাহার অধীন করিতে হইবে। ঐ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের উপর উহার তত্ত্বাবধানের ভার ন্যস্ত হইবে। তিনি মধ্যে ২ উহার পরিদর্শন করিবেন। এইরূপ নিয়মে কার্য্য করিলে অনেকাংশে উদ্দেশ্য সাধন হইতে পারে। নতুবা বর্ত্তমান সময়ের গুরুমহাশয়দিগের দ্বারা প্রকৃত উদ্দেশ্য সাধন হইবে না।

২য়। বর্ত্তমান শিক্ষাপ্রণালীর পরিবর্ত্তন

বর্ত্তমান সময়ের গুরুমহাশয়েরা যে রূপে শিক্ষা দিয়া থাকেন তদ্দ্বারা যথার্থ্য কার্য্য হইতেছে না। বরং উহাদ্বারা অনিষ্টই হইতেছে। প্রথমেই তালপত্রে বর্ণ লিখাইবার রীতি আছে। কিন্তু উহার কোন্ প্রয়োজন দেখা যায় না। বর্ণ পরিচয়ের পূর্ব্বে লিখাইয়া বর্ণ শিক্ষা করাইলে তাহাতে অপেক্ষাকৃত অধিক সময় বৃথা নষ্ট হয় মাত্র। কিঞ্চিৎ জ্ঞান যোগ হইলে এবং ভালরূপ অক্ষর পরিচয় হইল পরে অক্ষর লিখিবার নিমিত্ত বড় ক্লেশ হয় না। বালকেরা আপনা আপনিই লিখিতে শিখে। যাহারা প্রথম হইতে ইংরাজি শিক্ষা করে, তাহাদিগকেও লিখাইয়া বর্ণ পরিচয় করাইতে হয় না। পরে কিঞ্চিৎ পড়া হইলে, এবং ভাল করিয়া বর্ণ পরিচয় হইলে, তাহারা কি অক্ষর লিখিতে অশক্ত হয়? তালপত্রের পরিবর্ত্তে সেলেটে এক একটী বর্ণের আকারাদি লিখাইয়া শিক্ষা দিয়াই উত্তম হইতে পারে। যে বর্ণের আকারাদি মনে দৃঢ় রূপে অঙ্কিত হয়, তাহা কাগজে বা সেলেটে অনায়াসে রাখা যাইতে পারে। এক্ষণে বর্ণ লিখাইয়া শিক্ষা করাইবার যে রীতি আছে, তদ্দ্বারা বৃথা পরিশ্রম ও বৃথা অধিক সময় নষ্ট হয় মাত্র। এমন স্থলে ইংরাজদিগের প্রথমে বর্ণ পরিচয়ের যে নিয়ম আছে তাহাই প্রশস্ত। সেই নিয়ম অবলম্বন, করিয়া কার্য্য করিলে অল্প সময়ে এবং অল্পায়াসে কার্য্য সাধন হইতে পারে। তালপত্রের পরিবর্ত্তে সেলেটের ব্যবহারই এক্ষণকার ন্যায় সভ্য ও উন্নত সময়ে উপযুক্ত। বর্ণ পরিচয় করাইবার জন্য কার্ডের নিয়ম করাই শ্রেয়। এক এক খণ্ড কাগজে এক একটী অক্ষর বড় করিয়া লেখা থাকিবে। উহার চতুষ্পার্শ্বে নানা প্রকার চিত্র-বিচিত্র বা এক একটী পশুপক্ষীর ছবি থাকিবে। উহা দর্শন করিতে বালকগণের আনন্দ জন্মিবে এবং তৎসঙ্গেই তম্মধ্যস্থ অক্ষরটিও শিক্ষা হইবে। এরূপ নিয়ম করিলে অল্পকালের মধ্যে ও অল্পায়াসে শিশুগণের বর্ণপরিচয় হইবে। বর্ণপরিচয় ১ম ভাগ সমাপ্ত হইলে যখন দ্বিতীয় ভাগ আরম্ভ করা যাইবে, সেই সময় ছোট এবং সরল শব্দগুলি শ্লেটে লিখিয়া বানান করাইতে হইবে। তখন ঐ সকল বর্ণ উহারা অনায়াসে লিখিতে পারিবে।

অধিকবয়স্ক বালকদিগের অপেক্ষা অল্পবয়স্ক শিশুগণকে শিক্ষা দেওয়া অত্যন্ত কঠিন। যাহাতে তাহাদের মনসর্ব্বদা প্রফুল্ল থাকে এরূপ করিতে হইবে। তাহাদিগকে সন্তুষ্ট রাখিয়া শিক্ষা দিতে হইবে। নতুবা যাহা কিছু শিখান যাইবে তদ্দ্বারা কোন কার্য্য হইবে না। শিক্ষক তাহাদের পক্ষে একটী ভয়ানক জিনিস হইয়া দাঁড়াইলে শিক্ষা কার্য্যের সম্পূর্ণ ব্যাঘাত হইয়া উঠিবে। শিক্ষা দিবার সময় মধ্যে ২ তাহাদিগকে বিশ্রাম দিতে হইবে। মধ্যে ২ তাহাদের সহিত উপদেশ-পূর্ণ অথচ

কৌতুকাবহ গল্পাদি করিতে হইবে। এমনকি প্রতি ঘণ্টায় অন্ততঃ ১০/১২ মিনিটকাল বিশ্রাম দিতে হইবে। তাহাদের নিকট অত্যন্ত গাম্ভীর্য্য প্রদর্শন করিলে হইবে না। কিন্তু কারণ উপস্থিত হইলে ভয় করে, এরূপ গাম্ভীর্য্য থাকা আবশ্যক। তাহাদের গায় হাত বুলাইয়া কার্য্য করিতে হইবে। অর্থাৎ যে কোন প্রকারেই হউক যাহাতে তাহাদের মন প্রফুল্ল থাকে এরূপ করিয়া কার্য্য করিতে হইবে। অন্যথা তদ্দ্বারা যথার্থ কার্য্য হইবে না। সর্ব্বদা সদুপদেশ দিতে হইবে। মধ্যে ২ তাহাদের গুণের পুরস্কার করিতে হইবে। কারণ, উৎসাহ-বারি ভিন্ন মনুষ্য হৃদয়ে কোন প্রকার উন্নতি সাধন হয় না। এই অবস্থা হইতে যত তাহাদের সুশিক্ষা ও সদুপদেশ দেওয়া যাইবে, ততই তাহারা পরে মনুষ্যজীবনের উদ্দেশ্য সাধনে সাহসী হইবে। এই অবস্থার শিক্ষার উপরে তাহাদের ভবিষ্যৎ সুখ দুঃখ নির্ভর করে। অতএব শৈশবাবস্থা হইতে বালকগণকে সৎপথাবলম্বী করা এবং সুশিক্ষা দেওয়া যে কতদূর কর্ত্তব্য, তাহা লেখনী দ্বারা ব্যক্ত করা যায় না। এই সময় হইতে তাহাদের মন যে পথে ধাবিত হয়, বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে বিষয়ান্তরে তাহাদের সেই মন ফিরান দুঃসাধ্য হইয়া উঠে। এ অবস্থায় অত্যন্ত সাবধানের সহিত তাহাদিগকে শিক্ষা দিতে হইবে। যিনি উপরোক্ত নিয়মানুসারে শিশুগণকে লওয়াইতে পারেন, তিনিই উপযুক্ত শিক্ষক এবং তাঁহার দ্বারাই যথার্থ উদ্দেশ্য সাধন হইতে পারে। নতুবা অধিক লেখাপড়া জানিলেই উত্তম শিক্ষক হওয়া যায় না। যাহারা উপরোক্ত নিয়মানুসারে শিক্ষা দিতে সক্ষম, তাহাদিগকে গুরুমহাশয় নির্ব্বাচিত করা উচিত। তাঁহারা শিশুগণকে শিখাইতে পারিবেন। নতুবা অজ্ঞ ব্যক্তি দ্বারা শিক্ষাকার্য্য সম্পন্ন করা, আর বালকদিগের পরিণাম নষ্ট করিয়া দেওয়া উভয়ই তুল্য। উপরে যেরূপ শিক্ষা-প্রণালীর নিয়মাদি বলা গেল তদনুসারে শিক্ষা দিলে বর্ত্তমান শিক্ষা-প্রণালীর অনেকাংশে উৎকর্ষসাধন হইতে পারে। নতুবা বর্ত্তমান প্রণালী অনুসারে কার্য্য হইলে কখনই ইহার উন্নতি হইবে না বরং ইহাদ্বারা ক্রমশঃই অনিষ্টোৎপাদিত হইতে থাকিবে।

৩য়। এক্ষণে যে ২ বিষয়ের শিক্ষা দেওয়া হইতেছে তাহার আবশ্যকমত পরিবর্ত্তন

বাল্যকাল অভ্যাসের একটি প্রশস্ত সময়। এ সময় যাহা অভ্যাস করা যাইবে, যাবজ্জীবন তাহা হৃদয়ে গ্রথিত থাকিবে। এক্ষণকার সময় অতি মহামূল্য। এ সময় কখনই বৃথা নষ্ট করা যায় না। কিন্তু আমাদিগের শিক্ষাপ্রণালীর গুণে উহাদিগের সেই বহুমূল্য সময় বৃথা নষ্ট হইয়া থাকে। ঐ সময় দ্বারা অন্যান্য অনেক কার্য্য করা যাইতে পারে। কতকগুলি অনাবশ্যক বিষয়ের শিক্ষা দিয়া অনেকসময় বৃথা নষ্ট করা হয়। ঐ সময় কোন ভাল বিষয়ের শিক্ষা দিলে যথেষ্ট উপকার হইতে পারে। নামতার ন্যায় যে সকল বিষয়ের শিক্ষা করাইবার প্রণালী এক্ষণে বর্ত্তমান আছে, নিম্নলিখিত মতে তাহা পরিবর্ত্ত করিলে অনেক সময়ের লাঘব হইতে পারিবে অথচ তাহাতে কার্য্যহানি হইবে না। নামতা এবং শতকিয়া বর্ত্তমান প্রণালী অনুসারে শিক্ষা করান উচিত। কারণ, এই সময় অভ্যাসের সময়। এক্ষণে উহা মুখস্থ করিয়া রাখিলে পরিণামে অনেক সুবিধা হইবে এবং উহা না জানিলে পরে অত্যন্ত কষ্ট হইবে। এগুলি না জানিলে অঙ্ক শিক্ষা করিবার সময় অত্যন্ত অসুবিধা হইবে। ইহা না জানিলে পরে অঙ্ক কষা যাইবে না। এবং সে সময় ইহা অভ্যাস করিয়া লওয়া অত্যন্ত

কঠিন হইয়া উঠিবে। এই সকল কারণে নামতা ও শতকিয়া প্রথম হইতেই শিক্ষা করান উচিত। এতদ্ভিন্ন আর ২ গুলির শিক্ষা বিষয়ে এইরূপ পরিবর্ত্তন করিতে হইবে। কড়ানিয়া ও গণ্ডাকিয়া প্রভৃতির নিম্নলিখিত মত একটী তালিকা করিলেই সুবিধা হইবে। যথা—

৪ কড়া	=	১ গণ্ডা	৫ গণ্ডা	=	১ পাই
২০ গণ্ডা	=	/০ পণ	৪ পাই	=	/০ আনা
১৬ পণে	=	১ কাহন	৪ আনা	=	।০ সিকি
			৪ সিকি	=	১ টাকা

এই তালিকা অনুসারে কার্য্য করিলে অল্প সময়ের মধ্যে ও অল্পায়াসে কার্য্য হইতে পারিবে। তদ্ভিন্ন শুভঙ্করের যে কাগ, ক্রান্তির নিয়ম আছে, তৎপরিবর্ত্তে ভগ্নাংশের নিয়ম করিলে অনেক সুবিধা হইবে। অঙ্ক সূক্ষ্ম করিবার নিমিত্ত শুভঙ্কর ঐ এক একটী কাল্পনিক শব্দের সৃষ্টি করিয়াছিলেন মাত্র। যাহা হউক ভগ্নাংশের নিয়ম প্রবর্ত্তিত করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। কড়ানিয়া ও গণ্ডাকিয়া প্রভৃতি তালপত্রে লিখাইয়া এবং পড়াইয়া শিক্ষা করাইবার যে রীতি আছে তাহাতে অনেক সময় বৃথা নষ্ট হয় মাত্র। এক্ষণে যেরূপ প্রণালীর কথা বলা গেল, তদ্দ্বারা সমান কার্য্য হইবে, অথচ অল্প সময়ের মধ্যে হইবে। বোধোদয় আরম্ভ করিবার সময় হইতেই তেরিজ ও জমাখরচ ক্রমে ২ শিক্ষা করাইতে হইবে। গুণন ও ভাগহার প্রভৃতি বর্ত্তমান পাটীগণিতের নিয়মানুসারে কসাইতে হইবে। শুভঙ্করের যে সমস্ত অঙ্কাদি আছে তাহার অধিকাংশই ত্রৈরাশিকের নিয়ম হইতে সংগৃহীত। বালকেরা ত্রৈরাশিক শিক্ষা করিলে শুভঙ্করের অঙ্কাদির নিয়ম অনায়াসে আপনা আপনিই বুঝিতে পারিবে। আমাদের সমাজ যেরূপ তাহাতে শুভঙ্করের নিয়মাদি না জানা থাকিলে সামান্য বিষয়ে অত্যন্ত অসুবিধা ঘটে। মনে কর ৫ টাকা করিয়া কোন্ দ্রব্যের মণ, বিক্রীত হইতেছে তাহার ।।০ সেরের মূল্য স্থির করিতে হইলে শুভঙ্করের নিয়ম যেরূপ সহজ বোধ হয়, ত্রৈরাশিক সেরূপ নহে। শুভঙ্করের মতানুসারে যত টাকা মণের মূল্য হইবে এক সেরের মূল্য প্রত্যেক টাকার ৮ গণ্ডা ধরিতে হইবে। ইহার তাৎপর্য্য এই,—১ টাকা = ৩২০ গণ্ডা, ১ মণ = ৪০ সের। তাহা হইলে এক সেরের মূল্য ৩২০-এর ৪০ ভাগ ৮ গণ্ডা হইবে। ত্রৈরাশিক জানিলে ইহার যুক্তি অনায়াসেই বুঝা যাইবে। তখন ঐ সকল নিয়ম শিক্ষা করিবার নিমিত্ত অধিক আয়াস পাইতে হইবে না। একবার মাত্র দেখিলেই শিখিতে পারিবে। শুভঙ্কর যে সময়ে ঐ সকল নিয়ম সংস্থাপন করিয়া গিয়াছেন তখন উহা শোভা পাইয়াছে। কিন্তু এখন সে কাল নাই। এক্ষণে সকল বিষয়েরই উন্নতি লক্ষিত হইতেছে। এবং সকল বিষয়েরই পরিবর্ত্তন আবশ্যক হইতেছে, এক্ষণকার সমাজে শুভঙ্কর আর প্রতিপত্তি লাভ করিতে পারেন না। এক্ষণে অনেকে বি.এ. পরীক্ষা দিয়া ২০/২৫ টাকার কর্ম্মের নিমিত্ত প্রার্থনা করিতে ক্রটি করিতেছেন না। বোধ হয় ১০ বৎসর পরে এল.এ ও বি.এ-রাও গুরুমহাশয়গিরি করিতে সঙ্কুচিত হইবেন না। যাহা হউক, যখন দেখা যাইবে যে উহারা গুরুমহাশয় হইতে আরম্ভ করিয়াছেন তখন জানা যাইবে যে আমাদিগের ভারতবর্ষের সৌভাগ্য সূর্য্য উদয় হইয়াছে। অলমিতিবিস্তরেণ।

২৮-এ মার্চ্চ
১৮৬৯ খৃঃ অব্দ

শ্রীউমেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী
রাজপুর ইংরাজী সংস্কৃত বিদ্যালয়

১৭৯০ শকের হিন্দুমেলার আয়-ব্যয় বিবরণ।

আয়

গত বৎসরের তহবিল মজুত			...	৮	১০
শ্রীযুক্ত	বাবু	সুরেন্দ্রনাথ মিত্র	...		৩
”	”	কুমারকৃষ্ণ মিত্র	...		২
”	”	নিমচাঁদ মৈত্র	...		২
”	”	আনন্দচন্দ্র দাস	...		২
”	”	রাজনারায়ণ বসু	...		২
”	”	মাধবচন্দ্র রুদ্র	...		৫
”	”	ব্রজবন্ধু মল্লিক	...		২৫
”	”	রাজেন্দ্র মল্লিক (রায়বাহাদুর)	...		৫০
”	”	বেণীমাধব বসু	...		১০
”	”	মুরারি গুপ্ত	...		২
”	”	কানাইলাল বন্দ্যোপাধ্যায়	...		১
”	”	দুর্গাচরণ লাহা	...		২৫
”	”	শ্রীনাথ দাস	...		৫
”	”	নীলকমল বন্দ্যোপাধ্যায়	...		১৫
”	”	যদুনাথ দে	...		২
”	”	পঞ্চানন মুখোপাধ্যায়	...		১০
”	”	সাগরলাল দত্ত	...		৫
”	”	মধুসূদন সরকার	...		১০
”	”	শ্রীনাথ রায়	...		১৫
”	”	তারিণীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়	...		১০
”	”	ব্রজলাল মিত্র	...		১
”	”	গিরিশ্চন্দ্র শর্ম্মা	...		১
				২১১	১০
শ্রীযুক্ত	বাবু	বিহারীলাল ভট্টাচার্য্য	...		৫
”	”	সারদাপ্রসাদ রায়	...		১
”	”	রমানাথ ঠাকুর	...		৫০
”	”	হরলাল রায়	...		১

”	”	গিরিশ্চন্দ্র দেব	...		২
”	”	সারদাপ্রসাদ সেন	...		১
”	”	যদুনাথ মুখোপাধ্যায়	...		১
”	”	অভয়াচরণ গুহ	...		২৫
”	”	প্রাণকৃষ্ণ শীল	...		১
”	”	মুরারিচরণ সেন	...		১
”	”	বিনোদীলাল বন্দ্যোপাধ্যায়	...		১
”	”	যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর	...		৫০
”	”	ত্রৈলোক্যনাথ মিত্র	...		২
”	”	ভোলানাথ দত্ত	...		২
”	”	প্রসাদদাস দত্ত	...		৫
”	”	খেলচ্চন্দ্র ঘোষ	...		২৫
”	”	হৃষীকেশ মল্লিক	...		২৫
”	”	নন্দলাল মল্লিক	...		২৫
”	”	শ্যামাচরণ বিশ্বাস	...		২
”	”	হীরালাল শীল	...		২৫
”	”	অনুকূলচন্দ্র মুখোপাধ্যায়	...		১০
”	”	নগেন্দ্রলাল বসু	...		২
”	”	গৌরদাস বসাক	...		৫
”	”	রমেশচন্দ্র মিত্র	...		৫
”	”	মহেশ্চন্দ্র চৌধুরী	...		৩
				৪৮৬	১০
শ্রীযুক্ত	বাবু	ভৈরবচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	...		২
”	”	বৃন্দাবন বসু	...		৮
”	”	দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর	...		১০০
”	”	আদ্যচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়	...		২
”	”	মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত	...		১
”	”	কাশীশ্বর মিত্র	...		২
”	”	শালগেরাম খাঁনা	...		১
”	”	কুঞ্জলাল মিত্র	...		১
”	”	বিপিনবিহারী বসু	...		২
”	”	অতীন্দ্রনন্দন ঠাকুর	...		১০
”	”	কিশোরীচরণ চক্রবর্ত্তী	...		১
”	”	গোপাললাল ঠাকুর	...		৫০

”	”	ঠাকুরদাস বসু	...		৫
”	”	রামচাঁদ ক্ষেত্রী	...		৫
”	”	হরিনাথ দত্ত	...		১
”	”	নন্দলাল জহুরী	...		১
”	”	শ্যামাচরণ সেনগুপ্ত	...		১
”	”	ভবানীচরণ দত্ত	...		১
”	”	শিবচন্দ্র দেব	...		১০
”	”	রামেশ্বর বসু	...		৫
”	”	অবিনাশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়	...		১
”	”	হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	...		৫
”	”	হরনাথ ঠাকুর	...		১
”	”	যদুমণি মিত্র	...		২
”	”	শিবচন্দ্র বসু	...		১
				৭০৫	১০
”	”	রাজা প্রসন্ননারায়ণ দেববাহাদুর	...		২৫
শ্রীযুক্ত	বাবু	বেণীমাধব ঘোষ	...		১
”	”	শম্ভুচন্দ্র কর	...		১
”	”	কৃষ্ণদয়াল রায়	...		২
”	”	বিনোদবিহারী মিত্র	...		১
”	”	বামাচরণ চট্টোপাধ্যায়	...		১
”	”	দ্বারকানাথ ঘোষ	...		৫
”	”	কালীপ্রসন্ন ঘোষ	...		৫০
”	”	রাজনারায়ণ মিত্র	...		৩
”	”	চন্দ্রকান্ত মুখোপাধ্যায়	...		১০
”	”	দীননাথ বসু	...		৫
”	”	অবিনাশচন্দ্র মল্লিক	...		১
”	”	মুরারিধর সেন	...		৮
”	”	রাজকুমার চক্রবর্ত্তী	...		১
”	”	বেণীমাধব ঘোষ	...		২
”	”	দ্বারকানাথ বিশ্বাস	...		২৫
”	”	নন্দলাল পাল	...		৫
”	”	গিরিশচন্দ্র ঘোষ	...		২
”	”	বলরাম দাসবর্ম্মণ	...		২৫
”	”	পৃথ্বীনাথ চট্টোপাধ্যায়	...		৫

”	”	বরদাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়	...		১
”	”	শ্রীনাথ মিত্র	...		১
”	”	গোপালচন্দ্র সেন	...		১
”	”	রামচন্দ্র মিত্র	...		৪
”	”	উপেন্দ্রনাথ বসু	...		১
				৮৯১	১০
শ্রীযুক্ত	বাবু	উমাচরণ ভদ্র	...		২
”	”	গোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায়	...		২
”	”	রাজকৃষ্ণ বসু	...		১
”	”	গিরিশ্চন্দ্র ঘোষ	...		৫
”	”	কাশীনাথ দত্ত	...		৪
”	”	তারণকৃষ্ণ দেব	...		১
”	”	কার্ত্তিকলাল মিত্র	...		১
”	”	ক্ষেত্রমোহন রায়চৌধুরী	...		১
”	”	সুরেশচন্দ্র মিত্র	...		১
”	”	হরপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়	...		১
”	”	উদ্ধবচন্দ্র মল্লিক	...		৫
”	”	দুর্গাদাস মুখোপাধ্যায়	...		১
”	”	আনন্দচন্দ্র বসু	...		১
”	”	দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর	...		১
”	”	রসিকলাল পাইন	...		২
”	”	অমৃতকৃষ্ণ বসু	...		৫
”	”	ব্রজেন্দ্রনাথ রায়	...		১
”	”	শশিপদ বন্দ্যোপাধ্যায়	...		১
”	”	যাদবচন্দ্র রায়	...		১
”	”	যোগেন্দ্রনাথ রায়	...		১
”	”	নীলমণি চট্টোপাধ্যায়	...		১
”	”	গোপালচন্দ্র ঘোষ	...		১
”	”	গোপালচন্দ্র চক্রবর্ত্তী	...		২
”	”	নীলমাধব মিত্র	...		২
”	”	প্রিয়নাথ দত্ত	...		৫
				৯৪০	১০
শ্রীযুক্ত	বাবু	জয়কৃষ্ণ দত্ত	...		১
”	”	শ্যামলাল পাল	...		৮

”	”	শ্যামচাঁদ মিত্র	...		৫
”	”	শ্যামাচরণ শ্রীমাণি	...		২
”	”	ত্রিগুণাচরণ বসু	...		১
”	”	দুর্গাদাস মুখোপাধ্যায়	...		১
”	”	উমানাথ চট্টোপাধ্যায়	...		১
”	”	এম. এন. মিত্র	...		১
”	”	রসিকলাল দত্ত	...		২
”	”	মহেন্দ্রনাথ বসু	...		১
”	”	হরমোহন চট্টোপাধ্যায়	...		২
”	”	বৈদ্যনাথ বসু	...		১
”	”	হেমচন্দ্র দত্ত	...		১০
”	”	ভোলানাথ পাল	...		১
”	”	যদুনাথ মল্লিক	...		১০
”	”	নবীনচন্দ্র দেব	...		৫
”	”	দীননাথ ঘোষ	...		৬
”	”	উপেন্দ্রনাথ সরকার	...		১
”	”	নীলমণি মিত্র	...		২
”	”	নীলমাধব মিত্র	...		৫
”	”	ভোলানাথ লাহিড়ী	...		২
”	”	প্রতাপচন্দ্র মল্লিক	...		২
”	”	বলাইচাঁদ সিংহ	...		১০
”	”	এক বন্ধু (হিন্দু স্কুল)	...		১
”	”	মণীন্দ্রমোহন ঘোষ	...		১০
				১০৩১	১০
শ্রীযুক্ত	বাবু	তারকচন্দ্র সরকার	...		১০
”	”	নন্দলাল মিত্র	...		৪
”	”	অভয়াচরণ বসু	...		২
”	”	রাখালচন্দ্র মিত্র	...		২
”	”	লক্ষ্মীনারায়ণ মিত্র	...		১
”	”	নীলমাধব মুখোপাধ্যায়	...		৫
”	”	প্রসন্নকুমার মিত্র	...		৮
”	”	যাদবচন্দ্র মুখোপাধ্যায়	...		১
”	”	তুলসীদাস মল্লিক	...		৫
”	”	ঘোষ পরিবার	...		২০

”	”	ক্ষেত্রমোহন মিত্র	...		৫
”	”	জয়গোপাল মিত্র	...		৫
”	”	ঈশ্বরচন্দ্র ঘোষাল	...		৫
”	”	হরীশচন্দ্র বসু	...		১
”	”	গুঃ মহেন্দ্রনাথ দত্ত, কয়েক ব্যক্তির দান	...		৭
”	”	আশুতোষ ধর	...		১
”	”	নবীনচন্দ্র বড়াল	...		২
”	”	দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর	...		২
”	”	যোগেশচন্দ্র মজুমদার	...		১
”	”	কালীকৃষ্ণ প্রামাণিক	...		২০
”	”	অম্বিকাচরণ ঘোষ	...		১
”	”	প্যারীচরণ সরকার	...		২০
”	”	দীননাথ চট্টোপাধ্যায়	...		১
”	”	গোকুলনাথ চট্টোপাধ্যায়	...		৫
”	”	হরিমোহন নন্দী	...		১
				১১৬৬	১০
শ্রীযুক্ত	বাবু	বেণীমাধব রুদ্র	...		৫
”	”	নীলকমল মিত্র	...		১০০
”	”	মাধবচন্দ্র সেন	...		২
”	”	শ্যামাচরণ বসু	...		২
”	”	নন্দলাল বসু	...		১
”	”	দিগম্বর মিত্র	...		২৫
”	”	তারকনাথ দত্ত	...		৫
”	”	জয়কৃষ্ণ বসু	...		২
”	”	শ্যামলাল মিত্র	...		২
”	”	দুর্গাদাস চট্টোপাধ্যায়	...		১
”	”	নবীনচন্দ্র দে	...		১
”	”	কেদারনাথ ঘোষ	...		১
”	”	দ্বারিকানাথ বসাক	...		১
”	”	বিশ্বম্ভর চট্টোপাধ্যায়	...		১
”	”	জগচ্চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	...		১
”	”	অমৃতলাল বন্দ্যোপাধ্যায়	...		১
”	”	নীলকমল দাস	...		৫
”	”	ক্ষেত্রমোহন ঘোষ	...		২

”	”	বিনায়কচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	...		২
”	”	রমানাথ পালিত	...		৫
”	”	কালিদাস শীল	...		২
”	”	তারিণীচরণ চট্টোপাধ্যায়	...		১
”	”	প্রসাদদাস মল্লিক	...		৫
”	”	গোপালচন্দ্র মল্লিক	...		১
”	”	জয়গোপাল সেন	...		১০
				১৩৫০	১০
শ্রীযুক্ত	বাবু	বেণীমাধব সেন	...		২৫
”	”	শম্ভুনাথ মল্লিক	...		৫
”	”	নীলমাধব হালদার	...		২
”	”	গুঃ নীলকমল মুখোপাধ্যায় বিরাহামপুরের ও সাহাজাদপুর দিগরের নানা ব্যক্তির দান	...		৬৪
”	”	পঞ্চানন মিত্র	...		২
”	”	বেণীমাধব মজুমদার	...		১০
”	”	চণ্ডীচরণ সিংহ	...		১০
”	”	প্রাণনাথ বসু	...		৫
”	”	ঈশানচন্দ্র দত্ত	...		৫
”	”	রাজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	...		৫
”	”	পূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়	...		২
”	”	শ্যামলাল দত্ত	...		৮
”	”	অক্ষয়কুমার মজুমদার	...		৫
”	”	তিনকড়ি গুপ্ত	...		১
”	”	অমরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়	...		১৬
”	”	যজ্ঞেশপ্রকাশ গঙ্গোপাধ্যায়	...		২০
”	”	গোপাললাল মিত্র	...		৫
”	”	গণেন্দ্রনাথ ঠাকুর	...		১০০
”	”	নীলকমল মুখোপাধ্যায়	...		২৫
”	”	যোগেশচন্দ্র চৌধুরী	...		৫
”	”	জানকীনাথ ঘোষাল	...		৫
”	”	কালীকিঙ্কর মিত্র	...		১
				১৬৭৬	১০
শ্রীযুক্ত	বাবু	জগচ্চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	...		৩

”	”	মহেন্দ্রলাল দে	...	৮
”	”	রমানাথ লাহা	...	৫
”	”	প্রসাদদাস মল্লিক	...	৩
”	”	কালীনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	...	২
”	”	আনন্দচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	...	১
”	”	ভোলানাথ রায়	...	২
”	”	ভূতনাথ রায়	...	২
”	”	নীলমণি ঘোষ	...	১
”	”	নীলরত্ন ঘোষাল	...	১
”	”	বিশ্বনাথ মজুমদার	...	১
”	”	বেচুলাল শুক্ল	...	১
”	”	উমাচরণ রায়	...	১
”	”	দুর্গাপ্রসাদ	...	১
”	”	কেদারনাথ	...	১
”	”	সিদ্ধেশ্বর বসাক	...	১
”	”	প্রসাদদাস দত্ত	...	৫
”	”	শ্রীপতি মুখোপাধ্যায়	...	১
”	”	নবগোপাল মিত্র	...	১২
”	”	তারাবল্লভ চট্টোপাধ্যায়	...	২
”	”	অখিলচন্দ্র মুখোপাধ্যায়	...	১
”	”	রাজা কমলকৃষ্ণ বাহাদুর	...	৫০
”	”	যোগেন্দ্রকৃষ্ণ দেব	...	৪
”	”	অনন্তকৃষ্ণ বসু	...	৪
”	”	বেণীমাধব ছত্রী	...	১
”	”	রাধারমণ রায়	...	৪
			১৭৯৪	১০
শ্রীযুক্ত	বাবু	দেবেন্দ্রচন্দ্র দেব দে	...	১
”	”	যোগেন্দ্রচন্দ্র মিত্র	...	১
”	”	আনন্দমোহন বসু	...	৩
”	”	তারকনাথ দত্ত	...	৫
”	”	মহেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	...	৮
”	”	সারদাপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায়	...	৪
”	”	কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য	...	৫
”	”	শ্রীনাথ দত্ত	...	১

”	”	যাদবচন্দ্র শীল	...	২
”	”	অন্নদাপ্রসাদ ঘোষ	...	২
”	”	উমাপ্রসাদ ঘোষ	...	২
”	”	বেণীমাধব কর	...	১
”	”	প্রসন্নকুমার বিশ্বাস	...	২
”	”	মহেন্দ্রনাথ সোম	...	২
”	”	রাজা কালীকুমার মল্লিক	...	৩
”	”	গিরীশচন্দ্র চৌধুরী	...	১
”	”	বৈদ্যনাথ মল্লিক	...	১
”	”	কার্ত্তিকচরণ মল্লিক	...	১
”	”	গঙ্গানারায়ণ মল্লিক	...	২
”	”	নীলমাধব মুখোপাধ্যায়	...	৪
”	”	তুলসীদাস আঢ্য	...	২
”	”	ক্ষেত্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়	...	১
			১৮৪৮	১০
শ্রীযুক্ত	বাবু	শিবচন্দ্র বসাক	...	১
”	”	অনন্তরাম ধর	...	১
”	”	গোপালচন্দ্র আঢ্য	...	১
”	”	মহেন্দ্রনাথ কর	...	১
”	”	ব্রজবন্ধু আঢ্য	...	১
”	”	হরিমোহন পাইন	...	১
”	”	পূর্ণচন্দ্র মিত্র	...	১
”	”	হারাধন বন্দ্যোপাধ্যায়	...	১
”	”	গোপাললাল আঢ্য	...	২
”	”	দীননাথ মুখোপাধ্যায়	...	১
”	”	চন্দ্রমোহন ধর	...	১
”	”	গোপালচন্দ্র বসাক	...	১
”	”	কানাইলাল পাইন	...	১
”	”	গোপালচন্দ্র দে	...	১
”	”	বেণীমাধব মুখোপাধ্যায়	...	১
”	”	গোপালচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	...	১
”	”	হরিশ্চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	...	১
”	”	ঈশ্বরচন্দ্র মুখোপাধ্যায়	...	১
”	”	কৃষ্ণদাস লাহা	...	২

”	”	দেবেন্দ্রনাথ মল্লিক	...		১
”	”	নীলমাধব সেট	...		১
”	”	গিরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়	...		১
”	”	দিগম্বর চট্টোপাধ্যায়	...		২
”	”	বাদলচন্দ্র দত্ত	...		৪
				১৮৭৮	১০
শ্রীযুক্ত	বাবু	ভূমেশচন্দ্র বসু	...		১
”	”	নবীনচন্দ্র মুখোপাধ্যায়	...		১
”	”	রাজেন্দ্রনাথ সেট	...		২
”	”	কেদারনাথ সেন	...		২
”	”	কার্ত্তিকচরণ সেন	...		১
”	”	মথুরানাথ মুখোপাধ্যায়	...		১
”	”	সুবলদাস সেন	...		২
”	”	রাধাগোবিন্দ বসাক	...		২
”	”	বদনচাঁদ সেট	...		১
”	”	কেদারনাথ দত্ত	...		২
”	”	কানাইলাল মল্লিক	...		১
”	”	কিশোরীলাল পাইন	...		২
”	”	জয়গোপাল সেট	...		২
”	”	গোপালদাস সেট	...		১
”	”	পূর্ণচন্দ্র বসাক	...		১
”	”	বৈষ্ণবদাস আঢ্য	...		২
”	”	সূর্য্যমোহন দত্ত	...		১
”	”	গোপালচন্দ্র বসাক	...		২
”	”	নকুড়দাস মল্লিক	...		২
”	”	শিবকৃষ্ণ দাঁ	...		৫
”	”	হরিমোহন বসু	...		১
”	”	নকুড়চন্দ্র বসু	...		১
”	”	দ্বারকানাথ বসু	...		৪
”	”	গিরিশ্চন্দ্র ঘোষ	...		৪
				১৯২২	১০
শ্রীযুক্ত	বাবু	রামদয়াল দে	...		১
”	”	বৈকুণ্ঠনাথ সেন	...		৫
”	”	দেবেন্দ্রনাথ দত্ত	...		৪

”	”	মহেন্দ্রলাল চন্দ্র	...	১
”	”	গঙ্গাধর লাহিড়ি	...	৫
”	”	দীননাথ সেট	...	১
”	”	ঠাকুরলাল মল্লিক	...	১
”	”	যদুনাথ ঘোষ	...	২
”	”	অক্ষয়কুমার শীল	...	৫
”	”	মোহনলাল ক্ষেত্রী	...	২
”	”	চন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়	...	২
”	”	রামকৃষ্ণ দালাল	...	২
”	”	কানাইলাল দে	...	১
”	”	মাধবকৃষ্ণ সেট	...	৫
”	”	রসিকলাল মল্লিক	...	১
”	”	যাদবচন্দ্র শীল	...	১
”	”	শরচ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায়	...	১
”	”	জগৎরাম চট্টোপাধ্যায়	...	৫
”	”	গিরিশচন্দ্র মিত্র	...	১
”	”	বলাইচাঁদ দত্ত ও		
”	”	রাজকৃষ্ণ মল্লিক	...	১০
”	”	প্যারীলাল মল্লিক	...	৮
”	”	দেবীচরণ পাল	...	২
”	”	কানাইলাল মল্লিক	...	১
			১৯৮৯	১০
শ্রীযুক্ত	বাবু	যুগোলকিশোর বিলাসীরাম	...	৫
”	”	শ্রীনাথ চন্দ্র	...	২
”	”	শ্যামলধন দত্ত	...	৩
”	”	ক্ষেত্রমোহন রায়	...	২
”	”	সিদ্ধেশ্বর মল্লিক	...	১
”	”	ব্রজনাথ পাইন	...	১
”	”	উমেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়	...	১
”	”	জগবন্ধু বন্দ্যোপাধ্যায়	...	১
”	”	রাখালরাজ বড়াল	...	১
”	”	গণেসু বাবু	...	১
”	”	ক খ গ	...	১
”	”	চৈশরূপ ছোটেলাল	...	১

”	”	যজ্ঞেশ্বর হালদার	...		২
”	”	ভৈরবচন্দ্র আঢ্য	...		৫
”	”	কানাইলাল মল্লিক	...		২
”	”	নারায়ণচাঁদ ধর	...		২
”	”	নীলমণি আঢ্য	...		১
”	”	রাসবিহারী আঢ্য	...		২
”	”	নিমাইচরণ মল্লিক	...		৫
”	”	দেবেন্দ্রনাথ দত্ত	...		১
”	”	শিবরতনপুরী গোঁসাই	...		৫
”	”	অপূর্ব্বকৃষ্ণ সেট	...		১
”	”	হরিদাস বসাক	...		১
				২০৩৬	১০
শ্রীযুক্ত	বাবু	হরিমোহন শীল ও কজিন	...		৪
”	”	নৃসিংহ দাস শীল	...		৪
”	”	কিশোরীমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়	...		২
”	”	ঠাকুরদাস সেন	...		১
”	”	মদনমোহন সেন	...		২
”	”	নবীনচন্দ্র বড়াল	...		৩
”	”	জহরলাল দত্ত	...		৩
”	”	জিতলাল দত্ত	...		১
”	”	কেশবলাল পাইন	...		১
”	”	বেণীমাধব দে	...		১
”	”	রমানাথ আঢ্য	...		১
”	”	হরিবল্লভ বসু	...		৫
”	”	গুঃ নবগোপাল মিত্র			
		নানা ব্যক্তির দান	...		৯
				২০৭৩	১০
চাঁদা আদায়				২০৬৫	
বাঁশ ও দরমা বিক্রয়				১৫	
পুস্তক বিক্রয়				৩	
গত বছরের মজুত				৮	১০
গচ্ছিত				১৬৮	১৫
				২২৬০	৫

কতকগুলিন দান অনাদায় প্রযুক্ত শ্রীযুক্তবাবু ব্রজনাথ দেবের হিসাব এ বৎসর প্রকাশ হইল না।

বাগান পরিষ্কার মেরামতি ও বাঁশ দরমা প্রভৃতি ক্রয়	২৬১	১০
কর্ম্মচারিদিগের বেতন ও টাকা আদায়ের কমিশন	১৯৪	০
বিবিধ খরচ	৭৪	৫
সমবেত বাদ্যকর, পণ্ডিতগণ, ব্যায়াম-প্রদর্শনকারিদিগের ও মেলার নানা প্রকার কার্য্যের জন্য গাড়ীভাড়া	১৪৫ ।।০	
তাম্বুর ভাড়া ও তাহার সমুদয় ব্যয়	১২২ ।।০	
বোট ভাড়া		২৬
ডাক মাসুল	১	১০
চৌকি ও টেবিলের ভাড়া		১৯
দ্রব্যাদি প্রদর্শনের মাচায় মুড়িবার জন্য থান কাপড়ের ভাড়া		৫৫
নহবতখানা গেট ও বাউয়ার তৈয়ারির জন্য ব্যয়		১১৫
ঠিকা দ্বারবান ও বেহারাদিগের বেতন ও খোরাকি	৪৩	৫
কাগজ ও বিবিধ দ্রব্যাদি ক্রয়	১৩	১০
১৭৮৯ শকের মেলার পুস্তক ছাপার ব্যয়	৫৫	১৫
বিজ্ঞাপন প্রভৃতি ছাপার ব্যয়	১০৫ ।।০	
বেঞ্চ, চৌকি প্রভৃতি দ্রব্যাদি বাগানে লইয়া যাইবার ও আনিবার ব্যয়	৮৪	০
	১৩১৬ ।।১৫	

জের	১৩১৬ ।।১৫
মেলা সম্বন্ধে প্রস্তাব-লেখকদিগের পুরস্কার	৩০৬
মহিলাদিগের পুরস্কার প্রভৃতি	২৯৭
লক্ষ্ণৌ বেণুওয়ালাদিগের পুরস্কার	৫০
গায়ক ও বাদ্যকরদিগের পুরস্কার	২৪
পাইকদিগের পুরস্কার	৩০
কুস্তিওয়ালাদিগের পুরস্কার	২০
শিল্পনৈপুণ্যের জন্য পুরস্কার	৬
ঐ জন্য কারপেটের পেটেন্ট	২৭
ঐ জন্য মেডেল তৈয়ারির হিসাবে ব্যয়	১৫
সুরপুরা বাদ্যযন্ত্র নির্ম্মাণের ব্যয়	৮
বাজিওলাদিগের পুরস্কার	৮
ইলেক্‌ট্রীক্‌ জন্য পুরস্কার	৮
পুলিশ প্রহরীদিগের পুরস্কার	৩৮

বেণীসংহার নাটকের অভিনয়		
জন্য নানাপ্রকার ব্যয়		৬৩
কেমিকেল্ এক্‌সপেরিমেন্টের জন্য ব্যয়		৪০
ফোয়ারার জন্য ব্যয়		৩ ৷৷০
	২২৬০	১৫
আয়	২২৬০	৫
ব্যয়	২২৬০	১৫
মজুত		১০

শ্রীনবগোপাল মিত্র।
সহকারি সম্পাদক।

চতুর্থ অধিবেশন

চতুর্থ বর্ষের কার্যবিবরণটি অপেক্ষাকৃত সংক্ষিপ্ত। এই কার্যবিবরণের বিশেষ উল্লেখযোগ্য হইল সম্পাদক দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের ভাষণ।

ইহা ভিন্ন যে-সকল প্রবন্ধ পঠিত ও গান গীত হইয়াছিল বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে, তাহা কার্যবিবরণে মুদ্রিত করা হয় নাই।

কার্যবিবরণের শেষে ১৭৯১ শকের হিন্দু মেলার আয় ব্যয় বিবরণ মুদ্রিত হয়।

চতুর্থ বর্ষের কার্যবিবরণ এ যাবৎ আমাদের দৃষ্টির অন্তরালে ছিল। সম্প্রতি কলিকাতার জাতীয় গ্রন্থাগারে রক্ষিত একত্রে বাঁধানো কয়েকটি পুস্তিকা সংকলন হইতে উদ্ধার করিয়া এখানে পুনর্মুদ্রণ করা গেল। প্রাপ্ত কার্যবিবরণটি স্থানে স্থানে কীটদষ্ট। সকল স্থানে পাঠোদ্ধার করা সম্ভব হয় নাই। হিন্দু মেলার কার্যবিবরণটির পৃষ্ঠাসংখ্যা ৭। ডিমাই সাইজ। ইহার টাইটেল পৃষ্ঠাটি নাই।

চতুর্থ বর্ষের কার্যবিবরণ

হিন্দুমেলা

১৭৯১ শক

বর্ত্তমান বর্ষের মেলার ঘটনা দৃষ্টে নিশ্চয়ই বোধ হইতেছে যে ইহার দ্বারা অস্মদ্দেশের একটী স্থায়ী ও ভবিষ্যৎ উন্নতির পথ হইবে, ইহার উৎসাহীদিগের বিনা যত্ন ২রা ফাল্গুন শনিবার বালকদিগের দর্শনার্থ সমস্ত গভর্ণমেন্ট ও অন্যান্য বিদ্যালয় বন্ধ হইয়াছিল, বালকদিগের পক্ষে ইহা এক উৎসাহের বিষয় বলিতে হইবে। এবং মেলাও তদ্দ্বারা বহুজনাকীর্ণ হওয়াতে উৎসাহীদিগের মনে ইহার ভাবী উন্নতির আশাও ক্রমশঃ বলবত্তর হইতেছে।

এবৎসর মেলাটী অন্যান্য বৎসর অপেক্ষা পূর্ব্বে কিছু স্থাপিত করিবার মানসে পূর্ব্ব হইতেই দ্রব্যাদির আয়োজন হইয়াছিল। আমরা মনে করিয়াছিলাম এ বৎসর বহুবিধ দ্রব্যাদির আয়োজন হইবে কিন্তু আশানুরূপ ফল প্রাপ্ত হইতে পারি নাই। যে সকল দ্রব্য আসিয়াছিল তাহা পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক বলিতে হইবে, তদ্দৃষ্টে দর্শকগণের মনেও ইহার ক্রমশঃ উন্নতির আশা সঞ্চা[র] [কা]রিত ১লা ফাল্গুন শুক্রবার সমস্ত দ্রব্যাদি যথাস্থানে নিয়োজিত হইয়াছিল এবং প্রায় ২০০ প্রদর্শক ব্যক্তি সে স্থানে উপস্থিত ছিলেন।

শনিবার প্রাতঃকাল হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত প্রায় তিন সহস্র দর্শক উপস্থিত ছিলেন। অপরাহ্ন সার্দ্ধ চারি ঘটিকার সময়, মেলার কার্য্য আরম্ভ হইয়াছিল। প্রথমতঃ শ্রীযুক্ত রাজা কমলকৃষ্ণ বাহাদুর এই বিষয়ে নিম্নলিখিত উৎকৃষ্ট বাঙ্গালা বক্তৃতা পাঠ করিলেন।

কতকগুলি লোকের উৎসাহে ও যত্নে এই মেলার ক্রমোন্নতি হইতেছে। অদ্যকার আয়োজন দেখিয়া যেমন মনে অভূতপূর্ব্ব আনন্দ উপস্থিত হইতেছে তেমনি দুঃখেরও উদ্রেক হইতেছে, বাবু গণেন্দ্রনাথ ঠাকুরের অকাল মৃত্যুই এই দুঃখের কারণ। যতদিন এই মেলা থাকিবে তাবৎকাল তাঁহার যত্ন ও পরিশ্রমের ফল লোকের মনে জাগরূক থাকিবে সন্দেহ নাই। যাহাই হউক ভাগ্যই বলবান। এই বিষয়ে মনুষ্যের হস্ত নাই যাহা ঈশ্বরের কার্য্য তাহাতে শোক করা বৃথা। এক্ষণে ঈশ্বর স্মরণ করিয়া কার্য্যারম্ভ করা আবশ্যক। কার্য্যারম্ভের পূর্ব্বে বর্ত্তমান সম্পাদকদিগকে ধন্যবাদ প্রদান করিলাম। তাঁহারা স্বহস্তে যে বৃক্ষ রোপণ করিয়াছেন, তাহাতে উৎসাহ বারি সিঞ্চন করা সকলের কর্ত্তব্য। তাহা হইলেই ইহার প্রকৃত ফল উপলব্ধ হইবে। এক্ষণে ঈশ্বর সহায়। তাঁহার সাহায্য ও অনুগ্রহ ভিন্ন কোন কার্য্যই লব্ধ হয় নাই।

তদনন্তর সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত বাবু নবগোপাল মিত্র সম্বৎসরের কার্য্যবিবরণ এবং মেলার উদ্দেশ্য বিষয়ক একটী প্রস্তাব পাঠ করিলেন। অবশেষে সম্পাদক শ্রীযুক্ত বাবু দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, অভ্যাগত ব্যক্তিগণের আহ্বানার্থ এক উৎকৃষ্ট সুশ্রাব্য প্রস্তাব পাঠ করিলেন। তাহা নিম্নে প্রকটিত হইল।—

অদ্যকার এই যে অপূর্ব্ব সমারোহ ইহা এত দিন পরে ইহার প্রকৃত নাম ধারণ করিয়াছে, ইহা হিন্দু মেলা নামে আপনাকে লোক সমক্ষে পরিচয় দিতেছে। বিহঙ্গ-শাবক যেমন অল্পে অল্পে আপনার বল পরীক্ষা পূর্ব্বক ক্রমে উচ্চতর নভোমণ্ডলে উড্ডীন হইতে সাহসী হয়, সেই রূপ প্রথমে জাতীয় মেলা চৈত্র মেলা এইরূপ অস্ফুট শব্দ আমাদের শ্রবণে আনন্দ বর্ষণ করিয়াছিল, এক্ষণে "হিন্দুমেলা" এই সুস্পষ্ট নাম দ্বারা মেলার প্রকৃত মূর্ত্তি প্রকাশ পাইতেছে, এমন কি ইহার উদ্দেশ্য ইহার নামেতে[ই] প্রকাশ পাইতেছে, সুতরাং তাহা কাহারো নিকটে আর গোপন থাকিতে পারে না। জগদীশ্বর ধন্য, তিনিই কেবল আমারদের হৃদয়ের আশাকে ব্যর্থ হইতে দিতেছেন না, তাঁহার মৃত সঞ্জীবনী শক্তি আমাদের এই মুমূর্ষু অবস্থাতে প্রাণ দান করিয়া আমারদিগকে সজীব ও উন্নত রাখিতেছে। নতুবা এ দুর্দ্দিনের সময় আমারদের আর আশা কি? যিনি মেঘের মধ্য হইতে বিদ্যুৎ আকর্ষণ করিয়া দিক্ দিগন্ত উজ্জ্বল করেন তিনিই বঙ্গদেশের মুখশ্রীকে অদ্যকার এই প্রীতিপূর্ণ নবোৎসাহে, উজ্জ্বলিত করিতেছেন, অতএব তাঁহাকে শত শত নমস্কার।

মেলার কি উদ্দেশ্য এবং তাহা কতদূর ফলদায়ক এবং বাঞ্ছিতফল লাভে তাহা কতদূর কৃতকার্য্য হইয়াছে, এ সকল প্রশ্নের উত্তর মুখে ব্যক্ত করিবার কিছুমাত্র আবশ্যকতা দেখিতেছি না। এক্ষণে এরূপ সময় উপস্থিত হইয়াছে, যে [এই] বিস্তীর্ণ মেলারূপ সাগরে; নানা নদী নানা রত্ন লইয়া তাহার সেবার্থ সমাগত হইতেছে; কেহ তাহাদিগকে আহ্বান করে নাই, তাহারা আপনাদের হৃদয়ের স্বাধীন প্রীতি দ্বারা নিমন্ত্রিত হইয়া স্বহস্তে বিরচিত অলঙ্কার দ্বারা মেলার সুসজ্জিত করিতেছে। বিজ্ঞান, শিল্প, কৃষি, হস্তের কারিকরি, বাহুর বল, মনের উৎসাহ, ধনবানের বিত্ত, দরিদ্রের কায়িক পরিশ্রম, বন্ধুগণের সাহায্য, পণ্ডিতগণের মস্তিষ্ক, গায়কগণের কণ্ঠ নিঃসৃত অমৃত ধারা, সকলই এই মেলার বিশাল বক্ষে স্থান পাইয়া, পরস্পর পরস্পরের শোভাজনন হইয়া দীপ্তি পাইতেছে। দেশীয়গণের ঐক্যবন্ধন এতদিন কেবল মুখে মুখে বিচরণ করিয়া কাতর হইতেছিল, এক্ষণে তাহা কার্য্যে স্ফূর্ত্তি পাইতেছে। কত লোকের যে কত যত্ন কত চেষ্টা ও কত পরিশ্রম ইহাতে প্রয়োজন হইয়াছে, আমার বলা বৃথা। সভ্য মহাশয়েরা যাঁহারা অদ্য এখানে উপস্থিত আছেন, সকলেই তাহা আপনা আপনাতেই অনুভব করিয়া অবগত হইতে পারিতেছেন, বিশেষতঃ যাঁহার প্রাণপণ যত্ন ও উৎসাহে গুরুতর কার্য্য সকল বাল্যক্রীড়ার ন্যায় অনায়াস-সাধ্যরূপে প্রতীয়মান হইতেছে, দেশের উন্নতি মেলার লীলাতে হাস্য করিতেছে; (ইহা এক প্রকার অসাধ্য সাধন বলিতে হইবে)—অদ্ভুত ব্যাপার স্বচ্ছন্দে অকাতরে নির্ব্বাহ হইতেছে, তিনি কি তাহা অবগত নহেন? কিন্তু কেবল কার্য্যের প্রতি তাঁহার দৃষ্টি থাকাতে এবং উৎসাহে ও আনন্দে তাঁহার মন মগ্ন থাকাতে সে বিষয়ে তাঁহার লক্ষ্য হইতেছে না। ইঁহাদের সকলকে ধন্যবাদ দিবার আমার সাধ্য নাই : নিশীথের তারকা সকল ধ্বনি উচ্চারণ না করিয়াও যেমন সঙ্গীত করে, সেইরূপ আমাদের দেশীয় ব্যক্তিমাত্রেরই হৃদয় একতান হইয়া যে ধন্যবাদ প্রদান করিতেছে এবং চিরকাল করিতে থাকিবে, তাহা মুখে ব্যক্ত করিলে তাহার গৌরবের লাঘব করা হয় মাত্র আর কিছুই হয় না। সর্ব্বশেষে আর এক ভাব সহসা মনে আসিয়া উদিত হইতেছে, কিন্তু তাহা উল্লেখ করা মেলার এই উৎসবের সময় কতদূর সঙ্গত তাহা জানি না, কিন্তু সেই প্রশান্ত মূর্ত্তি মনে হইলে—সেই অমায়িক বিক্ষুব্ধ ধীর প্রকৃতি মনে হইলে কোন্ পাষাণ হৃদয়ে অশ্রুর সঞ্চার না হইবে। বিশেষতঃ সেই এই স্থলে দণ্ডায়মান হইয়া এই

হৃদয়ের অধীরতাকে কে নিবারণ করিতে পারে? যদি আক্ষেপ মূর্ত্তিমান হয়, তবে এ স্থান তাহাকেই সাজে; এই পর্য্যন্ত ক্ষান্ত হইলাম।

এইরূপে কার্য্য আরম্ভ হইলে, কোন স্থানে সুবিখ্যাত কথক কথকতার দ্বারা শ্রোতৃগণের মনোরঞ্জন করিতে লাগিলেন, কোন স্থানে কোন ব্যক্তি তাড়িতের কৌশল সমস্ত দেখাইতে লাগিলেন, এবং বহির্দ্দেশে মল্লগণ তাহাদিগের অস্ত্র শিক্ষার নৈপুণ্য প্রকাশ করিতে লাগিল। দর্শকগণ সমস্ত দিবস ইতস্ততঃ দর্শন করিয়া সূর্য্যাস্তের সময় প্রস্থান করিলেন।

রবিবার প্রাতেই দর্শনীয় বস্তু সমস্ত যথা স্থানে নিয়োজিত হইল। পরীক্ষকগণ দশম ঘটিকার সময় উপস্থিত হইলেন এবং বিশেষরূপে পরীক্ষা করিয়া সমস্ত দ্রব্যের মূল্য নির্ণয় করিলেন।

শ্রীযুক্ত বাবু উমেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, ভীষ্মদেবের জীবনচরিত প্রস্তুত করিয়া বহুজন সমক্ষে পাঠ করিলেন। সেই স্থানে বাবু (?) তান লয় সংযুক্ত গায়কেরা কতকগুলি বিশুদ্ধ সুশ্রাব্য সঙ্গীত গাইয়াছিলেন। এবং মধ্যে মধ্যে সুশ্রাব্য একতান বাদন হইয়াছিল।

গৃহাভ্যন্তরে একটী কথক আপনার কথকতার নৈপুণ্য প্রকাশ করিতেছিলেন। মধ্যে মধ্যে বংশীধ্বনি প্রভৃতি নানা প্রকার সুশ্রাব্য সঙ্গীত শাস্ত্রালাপ হইতেছিল। পার্শ্ব গৃহে বাবু মহেন্দ্রলাল ভট্টাচার্য্য রসায়ন বিদ্যার সুকৌশল সমস্ত প্রকাশ করিতেছিলেন। অপর গৃহে পশ্চিমাঞ্চলীয় নানা প্রকার ভোজবাজী হইতেছিল।

বালকেরা সিমলা, শাঁখারীটোলা, হরিনাভি এবং বারুইপুর হইতে আসিয়া ''জিম্‌নেস্‌টিক'' খেলা দেখাইতেছে এবং দর্শকমণ্ডলী হইতে অনবরত প্রশংসা ধ্বনি উত্থিত হইতেছে। কোন স্থানে মল্লযুদ্ধ; কোন স্থানে অস্ত্র শিক্ষার কৌশল, কোন স্থানে পাইকদিগের নানাপ্রকার বল, বিক্রম প্রকাশ, কোন স্থানে ভেড়ার যুদ্ধ, কোন স্থানে ভাল্লুক নাচ, কোন স্থানে মণিপুরের লোকদিগের ও দেশীয় বাবুদিগের ঘোড় দৌড়, বাহিরে জলাশয়ে সন্তরণ এবং নৌকা চালান ইত্যাদি নানা স্থানে নানা প্রকার ক্রীড়া হইতেছে; দর্শকগণ আগ্রহ সহকারে দেখিয়া বেড়াইতেছেন।

দর্শনীয় বস্তু সমস্ত নানা প্রকার ও অত্যন্ত মনোহারী হইয়াছিল এবং এত অধিক পরিমাণে আয়োজিত হইয়াছিল, যে তাহাদিগের নাম যথা ক্রমে প্রকাশ করা সুকঠিন। তন্মধ্যে অত্যুৎকৃষ্ট দ্রব্যাদির নাম প্রকাশ করা আবশ্যক। শ্রমজাত দ্রব্যাদি ভিতরে সজ্জিত রাখা হইয়াছিল। ইহার মধ্যে কৃষি-জাত দ্রব্য, অন্যান্য গৃহ ব্যবহৃত ও রন্ধনের যন্ত্রাদি এবং বঙ্গদেশীয় রন্ধনের দ্রব্যাদি আয়োজিত ছিল। কৃত্রিম ফল সমস্ত স্বাভাবিক বর্ণে এবং আকারে প্রস্তুত হইয়াছিল। ঢাকা এবং অন্যান্য প্রদেশীয় সূতা-নির্ম্মিত বস্ত্র প্রদর্শিত হইয়া সূচের কার্য্য এবং নানা দেশীয় শিল্প কার্য্য সমস্ত স[হ] স্থাপিত উৎকৃষ্ট গজদন্ত নির্ম্মিত খেলানা দেশীয় সঙ্গীত যন্ত্র, সুতা এবং বা[দ্য] প্রস্তুত করিবার যন্ত্র; নানা প্রকার লৌহ নির্ম্মিত দ্রব্যাদি, একটী ক্ষুদ্র মৃণ্ময় জমিদারী কাছারী নীল কুঠি ও ঠাকুর দালান এবং কয়েদীদিগের শ্রমজাত সামগ্রী ইত্যাদি বহুবিধ দ্রব্যাদির আয়োজন হইয়াছিল। এবং বাঙ্গালা, পুস্তক, কতকগুলি বিক্রয়ের নিমিত্ত ও কতকগুলি দর্শনের নিমিত্ত স্থাপিত ছিল।

বহুবিধ জীবিত পক্ষী, এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চৌবাচ্ছায় নানা প্রকার জীবিত মৎস্য ও আর আর নানা প্রকার সুদৃশ্য পশু, পক্ষী, মৎস্য প্রভৃতি জীবজন্তুগণ যথাস্থানে সংরক্ষিত হইয়াছিল। গৃহের

সম্মুখ এবং ভিতরে নানা প্রকার চিত্রিত ও সুদৃশ্য পশম নির্ম্মিত এবং নানা প্রকার মৃত্তিকা ও প্রস্তর নির্ম্মিত প্রতিমূর্ত্তি সকল স্থাপিত হইয়াছিল। তন্মধ্যে দুইটী মূর্ত্তি অতিশয় দীর্ঘাকার।

পূর্ব্বাপেক্ষা, ফল, পুষ্প ও অন্যান্য উদ্ভিজ্য দ্রব্যাদির ক্রমশঃ উন্নতি দেখা যাইতেছে। এবং নানা প্রকার উৎকৃষ্ট এবং দুষ্প্রাপ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বৃক্ষ পুষ্প সকল সংগৃহীত হইয়াছিল।

দর্শনীয় বস্তুর মধ্যে, শ্রীযুক্ত বাবু প্রিয়নাথ দত্ত ও ব্রজনাথ দেবের অন্তঃপুর হইতে যে সমস্ত পশম নির্ম্মিত প্রতিমূর্ত্তিগুলি আসিয়াছিল তাহাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট।—উহার মধ্যে একটী যুবতী একটী রকে বসিয়াছে, তাহার উরুতে একটী সন্তান এবং পার্শ্বদেশে একটী কুকুর রহিয়াছে; একটী প্রশস্ত মাঠের উপর নীলবর্ণের আকাশ, তাহার উপর তরল মেঘ সমস্ত যেন ভিন্ন ভিন্ন দিক হইতে উত্থিত হইয়া এক স্থানে মিলিত হইয়াছে। হঠাৎ দেখিলেই স্বাভাবিক বলিয়া বোধ হয়। দর্শকগণ সমস্ত বস্তু দেখিয়া প্রশংসা করিবেন, ইহাই আমাদিগের উদ্দেশ্য, সে উদ্দেশ্যটী সম্পূর্ণরূপে সার্থক হইয়াছে। ইহার মধ্যে একটী হীরক খচিত হুঁকা, এবং একটী বৃহদাকার তানপুরা দর্শকমণ্ডলীর মনকে আকর্ষণ করিয়াছিল।

এই বৎসর বালক, বৃদ্ধ, যুবা এবং ভিন্ন জাতিতে প্রায় বিংশতি সহস্র হাজার লোক একত্র হইয়াছে। বাগানের মধ্য দেশ হইতে গৃহের পশ্চিম দিক পর্য্যন্ত অনেকগুলি তাঁবু সংস্থাপিত হইয়াছিল। দর্শকগণের সূর্য্য উত্তাপ হইতে বিশ্রামের নিমিত্ত প্রত্যেক তাঁবুতে বেঞ্চও দেওয়া হইয়াছিল। কতকগুলি লেম্পেনেড, সোডা ওয়াটার, বরফ ইত্যাদি, কতকগুলিতে [ ] বাজারের দ্রব্যাদি বিক্রয় হইতেছিল, এবং অন্যান্যগুলি ফটোগ্রাফ [ ]-কারদিগের চিত্রালয় হইয়াছিল। নানা স্থানে নানা প্রকার মিষ্ট দ্রব্য, নারিকেল, আপেল, ইক্ষু, সোডা ওয়াটার ও লেমনেড প্রভৃতি দ্রব্যের দোকান স্থাপিত হইয়াছিল। বাগানের প্রধান পথের দুই পার্শ্বে নিশান দেওয়া হইয়াছিল, ও পার্শ্বভূমি এবং দমদমার রাস্তা সমাগত রথীদিগের গাড়িতে পরিপূর্ণ হইয়াছিল। এই সমস্ত দেখিয়া ইহার উৎসাহীদিগের মনে যে কত আনন্দ হইয়াছে তাহা সহজেই সকলে অনুভব করিতে পারেন।

এই মেলা স্বদেশীয়দিগের উৎসাহ, যত্ন এবং চেষ্টায় স্থাপিত সুতরাং সর্ব্ব সাধারণের মানসিক ও শারীরিক উন্নতি সাধন হয় ইহাই আমাদিগের লক্ষ্য, ইহার দ্বারা পরিশ্রমের বৃদ্ধি ও তদ্দ্বারা উন্নতির আশাও ক্রমশঃ [ফল]বতী হইতেছে। ইহার দ্বারা সাধারণ জনগণের মনকে ক্রমশঃ উন্নতির পথে আনাই আমাদিগের প্রধান উদ্দেশ্য।

১৭৯১ শকের হিন্দুমেলার আয় ব্যয় বিবরণ

১৭৯০ শকের চাঁদা আদায়	১৩০ ৵ ০
১৭৯১ শকের চাঁদা আদায়	১৬১৮
১৭৯২ শকের অগ্রিম চাঁদা আদায়	৩০০
হাওলাত জমা	৫৮৮॥৵০
১৭৯০ শকের মেলার পুস্তকাদি বিক্রয়	২৮৵০
গত বৎসরের স্থিত	...
	২৬৬৬ ...

ব্যয়

গত বৎসরের নানা প্রকার ছাপা প্রভৃতি ব্যয়ের হাওলাত শোধ	১১৬ ॥ ০
মালীদিগের পুরস্কার	১২৯
প্রস্তাব লিখিবার পুরস্কার	২৭১
মণিপুরের ঘোড় দৌড় জন্য	১০০
পণ্ডিতদিগের বিদায় ও গাড়ি ভাড়া	১২৫ দ ০
নানাপ্রকার কার্য্যের জন্য গাড়ি ভাড়া	১১১ ৵ ০
তাম্বুর ভাড়া	৩৫২
বোট ভাড়া	২৭
ব্যায়ামাদির ব্যয়	৪৪ ॥০
বিবিধ বাজে খরচ	৫৪ ।০
ব্যয় নিসান তৈয়ারির	৫৩
বাগানের পরিষ্কার প্রভৃতি নানাবিধ ব্যয়	২৪৫ ৵ ০
১৭৯০ শকের মেলার বিবরণ ছাপার ব্যয়	১৫২
বিজ্ঞাপন প্রভৃতি ছাপার ব্যয়	২১১
কর্ম্মচারিদিগের বেতন ও টাকা আদায়ের কমিশন	১৮৫
নহবত খানা ও গেট তৈয়ারির ব্যয়	৬০
গায়ক ও বাদ্যকরদিগের পুরস্কার ১৭৯০ ও ৯১ শকের	১২৫
মেডেল তৈয়ারি ব্যয়	২৯৮
মজুত	৪
	২৬৬৬...